উপন্যাস—ইতিহাস নয়

কিরণশশী দে

পরিবেশক

দে বুক স্টোর

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রকাশ মাঘ ১৩৭১

প্রাপ্তিস্থান

॥ এস্ চন্দ্র এণ্ড কোং ॥ ৪, ওয়েলেস্লি স্ট্রীট্। কলিকাতা-১৩
॥ জিজ্ঞাসা ॥ ১৩৩-এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-২৯
॥ নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্। কলিকাতা-১২
॥ সান্যাল এণ্ড কোং ॥ ১, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট্। কলিকাতা-১২
॥ ওরিয়েন্ট্যাল্ বুক কোম্পানী ॥ ৫৬, সূর্যসেন স্ট্রীট্। কলিকাতা-৯
॥ সঙ্গীত প্রতিভা ॥ ৭৬, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড। গড়িয়া। ২৭-পরগনা
॥ গান্ধর্বী ॥ ১২, লেক অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-২৬

Published by Sm. K. Dey, 16-B. Jhil Road Cal-32, and Printed by Sm. M. Roy at Purbasha Printers, 124/1A. Maniktala St. Calcutta 6.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই লেখাটি তৈরী হয়েছিল অনেক কাল আগে ১৯৬১ কি ৬২ সালে। পাণ্ডুলিপিটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ আমার প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন কতিপয় রসিকজনের উৎসাহে এটিকে ছাপাতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আমার মনের ভাব ও ভাষা প্রকাশভঙ্গীর উপর একাধিক পূর্বসূরী লেখকের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে নানা জায়গায় নানা ভাবে—সেটার একমাত্র কারণ, উপন্যাস লেখার কাজে আমার ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতা ও অনভ্যস্ততা—একথা বিনম্রচিত্তে স্বীকার করেই সাহিত্য জগতের জীবিত কিংবা মৃত সকল পূর্বসূরীদের প্রতি আমার এমনতর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ঋণের জন্য সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তাছাড়া, বিশেষ করে বই ছাপাবার সময় সর্বশ্রী নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কামনা দে, শিশিরকুমার আচার্য্য, মৃদুলা রায়, দীনেশচন্দ্র সাহা, শুভেন্দু দত্ত এঁদের সাহায্য পেয়েছি আমি নানা প্রকারের এবং বই-এর কাভার্-ডিজাইন্‌টি দিয়েছেন শিল্পী শক্তি চক্রবর্তী—এঁরা প্রত্যেকে আমার ধন্যবাদার্হ।

কিরণশশী দে

উপন্যাস—ইতিহাস নয়

॥ ১ ॥

সামান্য জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে রাত্রে চিটাগাং মেলে শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে নামল অমিত।…প্ল্যাট্‌ফর্মের বাইরে চওড়া চওড়া সব ক'টা রাস্তাই তখন প্রায় জনশূন্য। খান কয়েক ঘোড়ারগাড়ি আর আন্‌সাররা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আশে-পাশে একটি ট্যাক্সিও দেখা যাচ্ছে না! কী করা যায়! অমিত একটু দাঁড়াল। নাঃ ট্রামেই যাওয়া যাক্—এই ভেবে রাস্তায় পা বাডাতেই একটা সাদারঙের মোটর এসে থামল তার সামনে। আর তার ভিতর থেকে ক্লান্তভাবে বেরিয়ে এল সুপ্রিয়া।

"বড় দেরী করে ফেললাম,—অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হল কি না! কলকাতার রাস্তায় এখনও এখানে-সেখানে ছুরি মারামারি চলছে, আর রাত্রে ত কথাই নেই। প্রায় সব জায়গায় কারফিউ জারি করা।" —এই জরুরী সংবাদটুকু দিতে দিতে সুপ্রিয়া চট্‌পট্ প্রণামটি সেরে নিয়ে অমিতকে সঙ্গে করে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

এ হল ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাস। ভারতবর্ষে তখন ভীষণ দুর্যোগ। কল্‌কাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা আগে তেমন ঘটেনি; তবে সেবারই বড় আকারে শুরু হয়ে কিছুটা থেমেছিল হঠাৎ।

কিন্তু তারও বহু আগে …

সারা ভারত জুড়ে চলছে 'সিভিল্ ডিস্‌ওবিডিয়্যান্স্' আন্দোলন। লবণ আইন ভাঙতে যাচ্ছে সবাই। অমিতও তাই বেরিয়ে পড়েছিল দলের পিছন পিছন মহিষাদল না কোথায়। ফেরার পথে ট্রেনে বসে গান গাইল সে একটার পর একটা: ডি-এল্-রয়, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল এঁদের সব জাতীয়-সঙ্গীত,—জমিয়ে রাখল যাত্রীদের। সেই ট্রেনের কামরার এক কোণে চুপ করে বসেছিল দুর্গাপ্রসাদ রক্ষিত। বিরাট শক্তিশালী দেহ তার। ধীরে ধীরে উঠে এল, পাশে বসে জিজ্ঞেস করলে: আপনার নাম?

—অমিত লাহিড়ী।

ক্রমশ যখন জানা গেল এরা একই কলেজের ছাত্র, একই হোষ্টেলে থাকে, পড়েও একই সঙ্গে; তখন এদের কথাবার্তা আপনি থেকে তুমি-তে নেমে এল অতি সহজে।

—এতো সুন্দর গান করতে পার! আর তুমি এখানে—এই দলের মধ্যে? কণ্ঠে বিস্ময় আর দরদ মিশিয়ে প্রশ্ন তুলল দুর্গাপ্রসাদ।

অমিত মুখ টিপে হাসে, বলে: আগে আমাদের দেশটা স্বাধীন হোক্—তবে তো গান, শিল্পচর্চা এসব!

কথাটা অনেকখানি বাস্তব ঘেঁষা হলেও বক্তা সম্বন্ধে যেন সন্দেহ থেকে যায়, কিছুটা কৌতূহলও জাগে। তাই দুর্গাপ্রসাদ নীরবে অমিতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ভাবল একটু, বলল শেষে: না হে না, তোমার ধারণা ভুল। আগে অন্ধকার একদম কেটে যাক, তারপর পৃথিবীকে আলো দেব এমন কথা আকাশের সূর্যদেবও কখনও বলতে পারেন নি।

গাড়ি সবেগে ছুটে চলেছে। ···এরই মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ জানালার বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে বলে যাচ্ছিল: "ঘরবাড়ি তৈরির জন্যে আমরা টিকসই শক্ত মেটিরিয়্যালস্ যতই খুঁজি না কেন—সে বাড়িকে সুন্দর প্রাণময় করতে হলে ক্ষণস্থায়ী অকঠিন ফুলের সহযোগও যে দরকার,—তা কি তুমি জান না!" বলতে বলতে সহাস্যে মুখ ফেরায় অমিতের দিকে: "তোমরা জাতশিল্পী। তুমি গাইতে পার, এই গানের মধ্যেই থাকবে তোমার দেশের জন্যে তোমার বড় কনট্রিবিউশান। এভাবে 'লবণ আইন' ভেঙ্গে দেশ স্বাধীন করার ব্রত ত তোমার নয় বন্ধু।" —এমনতর সুস্পষ্ট, সবল, সতেজ কথাগুলির যথার্থতা অনুভব করেই অমিত সেদিন সানন্দে দুর্গাপ্রসাদের হাতে হাত মিলিয়েছিল। এবং তখন থেকেই দুজনে বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় হল যে, হোষ্টেলে এসে একই রুমে থাকার ব্যবস্থা করে নিল এরা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বলে কয়ে। বি-এ পর্যন্ত কাটাল এক সঙ্গে।

এর পর বহুদিনের ছাড়াছাড়ি। তবে দুর্গাপ্রসাদের দিদির একটিমাত্র কন্যা সুপ্রিয়া—অমিতের পরম ভক্ত। সে অমিতের খবরাখবর রাখে।

আজ ঢাকা থেকে মহীশূর যাবার পথে অমিত শিয়ালদহ নেমেছিল।

সংবাদ পেয়ে,সুপ্রিয়া তাকে সমাদর করে নিয়ে তুললে দক্ষিণ কলকাতায় বালিগঞ্জ সানিপার্কে, তার বাবার নূতন বাড়িতে।

মোটর থেকে নামতেই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ নবকুমার, বললেন: "যাক্‌গে নিশ্চিন্ত হলুম। আমাদের কী ফাঁকি দিয়েই না পালাচ্ছিলেন অমিতবাবু।

আমি শুধু বসে বসে টাইম্ দেখছি,—আপনি আবার লিখেছিলেন কিনা স্টেশনে কাউকে না পেলে সোজা হাওড়া চলে যাবেন।" একটা হাঁফ ছাড়লেন তিনি: "তাতে-ও কি আর ভাবনা ঘুচত! দেখছেন ত এখানকার অবস্থা!"

নমস্কার বিনিময়ের পর সোফায় বসতে বসতে অমিত সায় দিয়ে বলে: "হাঁ। আসবার পথে তাই ত দেখলুম।" সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনাও শুরু করে সে—একটু নির্বিকার ভঙ্গিতে। কেননা, এ সব যে ঢাকায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, দীর্ঘকালযাবৎ চলে আসছে,—কলকাতাবাসী নবকুমারবাবুর কাছে চমকপ্রদ বৈকি। এমনি কথাবার্তার মাঝখানে সুপ্রিয়ার মা এসে অমিতকে নিয়ে গেলেন বাড়ির ভিতর।

সুপ্রিয়ার বাবা নবকুমার বসু পুরুষপরম্পরায় আর্থিককৌলীন্যের অধিকারী, উত্তর কলকাতার কোন এক কলেজের প্রবীন অধ্যাপক। তাঁর পৈতৃক বনেদী গৃহসম্পদও সেই অঞ্চলে। তরুণ বয়সে য়ুরোপ ঘুরে এসে সেকালে একদা ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবসায় নেমেছিলেন তিনি, এবং ঐ কাজে তাঁর উন্নতি খ্যাতি উভয়ই হয়েছিল খুব। কিন্তু পরে কলেজ অধ্যাপনায় যোগ দেবার সুযোগ পেয়ে ঐ ব্যবসা স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করে দেন ভাই-আত্মীয়জনকে। এখন নবকুমারবাবুর বয়স আশির উর্ধ্বে; অবসর জীবন কাটাচ্ছেন নির্ঝঞ্ঝাট ভাবে—বালিগঞ্জ অঞ্চলে বিশেষ এক খোলা নির্জন জায়গায় পৃথক বাড়িতে এসে।

এমনি আসাযাওয়ার পথে নবকুমারবাবুর আদি বাড়িতে অমিত এসেছে আরো অনেকবার সুপ্রিয়ারই অনুরোধে, তখন পুরো এক হপ্তাও কেউ তাকে ওখানে আটকে রাখতে পারে নি।

এবার কিন্তু একমাস কাটল।

কলকাতায় সাম্প্রদায়িক গোলমালটা যে থামছে না কিছুতেই। এই অবস্থায় সুপ্রিয়ার মা বাবাই বা ওকে ছাড়েন কী করে! এর মধ্যে আবার এক সন্ধ্যায় সুপ্রিয়া বসালো ছোটখাটো এক গানের আসর। পরিচিত সব বন্ধুবান্ধবদের ঐ উপলক্ষ্যে ডেকে এনে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে অমিতের।

আসর ভাঙলে পর একটা বিশেষ সম্ভ্রম নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন মাঝবয়েসী অত্যন্ত ডিগ্‌নিফায়েড্ সুন্দর এক ভদ্রমহিলা, বললেন: "খুব ভাল লাগল কিন্তু আপনার গান।"

অমিত ওঁকে দেখেই চিনতে পারল, শুধালো সবিস্ময়ে: "আরে আপনি!" অমিতকে ত মহিলা আগেই চিনেছিলেন।

সেই জাপানী বম্বিং-এর সময়, বছর দু-তিন আগে যখন কলকাতাকে প্রায় খালি করে সবাই ভয়ে নানা দিকে পালাল তখন লখনৌ শহরের একই হোটেলে সামনাসামনি ফ্ল্যাটে পূরো একটি মাস থেকেও কোনো আলাপ-পরিচয় ঘটেনি দুজনে। অথচ যেদিন আলাপের সুযোগ এল দৈবাৎ, সেদিনই রাত্রে অন্য এক কাজে অমিতকে আবার লখনৌ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তাই শিবানীর সঙ্গে কথাবার্তা আর জমল না তেমন। যাবার বেলায় অমিত তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে গিয়েছিল: আপনি আমার যা উপকার করলেন মিসেস্ মুখার্জি,—আমি তা ভুলব না কক্খনো।

"সেটা এমন কী-ই বা!" শিবানীও পাল্টা সৌজন্য প্রকাশ করে জানতে চেয়েছিল: "আপাতত আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

"আহমেদাবাদ, তারপর সম্ভবত বোম্বাই। সেখানেও ত ঐ কলকাতারই মত অবস্থা, যুদ্ধাতংকে সারা শহর ব্ল্যাক্-আউটে আচ্ছন্ন সেদিনও দেখে এসেছি,—লোকজন তেমন নেই। তাই এযাত্রা বোম্বাই গিয়ে যে বেশি দিন সুখশান্তিতে থাকতে পারব সে ভরসা রাখি নে।"

শিবানী খুব মনযোগ সহকারে অমিতের কথাগুলি শুনছিল, আর ইচ্ছা হচ্ছিল তার আরো অনেক কিছু জানবার। কিন্তু মোটেই সময় ছিল না;—তাই তাড়াতাড়ির মধ্যে নিজের ঠিকানা দিয়ে অমিতকে জিজ্ঞেস করেছিল: "আসবেন ত কলকাতায় গেলে পর আমাদের ওখানে?"

অমিত সে কথার কোন স্পষ্ট জবাব না দিয়ে একটু হেঁয়ালি মিশিয়ে বলেছিল শুধু: "ভবঘুরে জীবন—দেখা ত হবেই, কোথাও না কোথাও!"

"আপনি বড়ো মজার কথা বলেন অমিতবাবু"—শিবানী তার হাস্যময় সুন্দর চোখ দুটো অমিতের চোখের ওপর মেলে নিজের বক্তব্যের টীকা কেটেছিল সংক্ষেপে: "ভবঘুরে জীবন আপনার? ভবঘুরেরা কি সুখশান্তি নিয়ে মাথা ঘামায় কখনও!"

অমিত এর প্রতিবাদ করেনি। তাতে শিবানীর মনে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল জেগেছিল আরো। সে টের পেয়েছিল এবং আগে থেকেই লক্ষ্য করেছিল, লোকটা আপন মর্জিমত ঘুরে বেড়ালেও তার চলনের মধ্যে আছে একটা কঠোর শান্ত পরিমিত রূপ—এ স্বভাব ত মোটেই ভবঘুরের স্বভাব নয়,—তার সান্নিধ্য যে অন্যকেও দূর থেকে সংযত করে তোলে! শিবানীর এই অনুভূতির সমর্থনও সে পরে যথেষ্ট পেয়েছিল লখনৌ থাকতে থাকতেই ডাঃ ভিয়াসের কাছে। কিন্তু অমিত তখন তার নাগালের বাইরে। আর সেজন্যই বোধ্‌করি অমিতের

প্রতি একটা মৃদু মধুর আকর্ষণ অনুভব করে আসছিল শিবানী—তার অজান্তে।

আজ সেদিনেরই মতন অনেকটা দৈবাৎ সুপ্রিয়ার বাড়িতে অমিতের সাক্ষাৎ পেয়ে শিবানী খুশি হল খুব। অমিতকে সহাসে অভিনন্দন জানায়ঃ "নমস্কার। চিনতে পেরেছেন তাহলে।" —এ পরিচয় যে একেবারে সাম্নাসাম্নি, এর ভিতরে ত মধ্যস্থ হবার প্রয়োজন নেই অন্য কারুর—বন্ধু সুপ্রিয়াকে তা বোঝাতে গিয়ে শিবানীর মুখ উজ্জ্বল হল মিষ্টি হাসিতে। অমিতকে সে সরাসরি অনুরোধ করে বসলঃ "এবার আমার বাড়িতে দয়া করে একদিন পায়ের ধূলো দিন।"

"ছিঃ ছিঃ এ কী বলছেন!" অমিত কথায় বাধা দিয়ে নিজেই যাবার আগ্রহ দেখায়, বলেঃ "নিশ্চয়ই যাব আপনার বাড়ি।"

"কবে আসছেন বলুন।" জবাবটা সাথ-সাথ নিয়ে যেতে চাইল শিবানী।

অমিতও বললেঃ "বেশ তো, কালই যাব'খন সুপ্রিয়াকে নিয়ে।"

আলিপুর বড় রাস্তার উপর বিশিষ্ট অভিজাত পাড়ায় একটা দোতলা বাড়ি। তার সামনে নির্ধারিত সময়ে সুপ্রিয়ার গাড়ি এসে থামল পরের দিন। গেটের একপাশে অমিত দেখতে পেল, শ্বেতপাথরের ওপর গৃহকর্ত্রীর পরিচয় মোটা করে ইংরেজী হরফে খোদাঃ মিসেস্ শিবানী মুখার্জি, এম. এ. বি. টি.।

মোটরের হর্ণ শুনে স্বামী দিবাকর মুখার্জিকে সঙ্গে করে গেট অবধি দ্রুত এগিয়ে গেল শিবানী। নিজ হাতে দরজা খুলে দিয়ে আহ্বান করলেঃ "আসুন"

গাড়ি থেকে নেমে গেট পেরিয়ে আসতে আসতে অমিত লক্ষ্য করল, সমস্ত বাড়িখানাই নিটোল এক আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ ফ্যাসানে সাজানো—গৃহকর্ত্রীর রুচিটাও এর মধ্যে ধরা পড়েছে অনেকখানি। বাইরের প্রশস্ত বারান্দা, তারপর হাই ফার্নিশড্ ওয়েটিং রুম ডিঙ্গিয়ে অমিত এল একটি হলের ভিতর, পিছনে সুপ্রিয়া। এই হলঘরের মেঝেতে একখানি দামী ফরাস বিছানো, এর এক কোণে রাখা হয়েছে হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা এ-সব। ঐ দিকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন দিবাকর। সমাদরের ত্রুটি নেই কোথাও। ঘরময় ধূপের সুমিষ্ট গন্ধ।

অমিত বসল এসে তার নির্দিষ্ট আসনে।

শিবানী বাইরে থেকে শ্রোতা ডেকে এনে কোনো অনাবশ্যক ভিড় জমায় নি। একাকী গান শোনার অভিলাষ নিয়ে অমিতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এটা, সহজেই বোঝা যায়। এই ব্যবস্থাটা মুগ্ধ করেছে অমিতকে। তার গানের সঙ্গে তবলায়

সঙ্গত করলেন দিবাকরবাবু। গান জমল খুব। ঐ সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে রবাহুত অবস্থায় পাড়ার বিজ্ঞ বয়স্ক বিদ্যোৎসাহী শ্রোতারাও এলেন কেউ কেউ। তাঁদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে অমিত গান গাইল অনেক রাত অবধি। শিবানী খুশিতে উল্লসিত।

এইভাবে প্রায় রোজই এ-বাড়ি সে-বাড়ি গানের আসর বসে অমিতের। আদর আপ্যায়নেরও বিস্তর ছড়াছড়ি। শিবানী কোনো আসরই বাদ দেয় না, সবখানেই সংবাদ পেলে সময়মত গিয়ে হাজির হয়। অমিতের গান তার ভাল লেগেছে খুব, বোধহয় অমিতকেও। একটা বিশেষ সার্কেলে এসব কথার জানাজানির বাকী নেই,—সে নাকি অমিত লাহিড়ীর একজন বড়দরের অ্যাড্‌-মায়ারার্। মাঝে মাঝে সে খোঁজ নেয় সুপ্রিয়ার কাছে—কলকাতায় অমিতবাবু ক'দিন থাকবেন আর!

আবার দিন কয়েক বাদেই অমিত নিমন্ত্রণ পেল, সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়াও।

অমিত জেনেছিল শিবানী একটা বড় হাই স্কুলের হেডমিসট্রেস। তাই দেখল এবার বিরাট আয়োজন। শুধু তার স্কুলের মেয়েদেরই নয়, ওদের গার্ডিয়ানদেরও অমিতের গান শোনাবে—এই উদ্দেশ্য নিয়ে সব রকমের বন্দোবস্ত করেছে শিবানী। তার স্বামী দিবাকরবাবুও দু-চারজন সমঝদার বন্ধু-বান্ধবদের ডাকলেন সেদিন।

শিবানী ত আগেও দেখেছে অমিতকে। লখনৌ থাকতে প্রতিদিন দেখেছে—অবশ্যি দূর থেকে। তখন আলাপ পরিচয় ছিলনা দুজনের। এবার নির্বিবাদে মিশছে তার সঙ্গে, দেখছে নানাদিক থেকে: যেমন দীর্ঘ সুঠাম দেহ—তেমনি কী শান্তোজ্জ্বল পুরুষোচিত গম্ভীর চেহারা অমিতের, অথচ অন্তরটি মনে হয় নিতান্ত শিশুসুলভ নিষ্পাপ। বয়স আর কত? শিবানীরই সমবয়সী যেন, কিংবা ছোটও হতে পারে। ভারী সুসংযত আচার-ব্যবহার অমিতের। অমিতকে শ্রদ্ধার পাত্র ভাবতে শিবানীর মনে কোনো দ্বিধা নেই।

কিন্তু, লোকটাকে কলকাতায় কী করে আটকাবে সে?

ভাবতে গিয়ে শিবানী আরো এগিয়ে চলে কিছুটা: এই ত সেদিন, সুপ্রিয়াদের বাড়িতেই ডাক্তার দেবানন্দ চাটুজ্যের মেয়েরা আর প্রফেসার প্রজেশ সেনের স্ত্রী, কলেজের কয়েকটি গাইয়ে ছেলেকে সঙ্গে করে এলেন গান শিখতে। যেন হাস্যালাপের মধ্যেই কোনো বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে ওদের দিব্যি গান শিখিয়ে দিলে অমিত। শেখাবার ধরণটা কত সুন্দর আর সহজ,

সংগীতে রীতিমত পণ্ডিত একজন; —কিন্তু সেজন্য কোনো গোঁড়ামী নেই তার। অমিত বলে: দুনিয়ার সবাই সুকণ্ঠ হতে পারে না—তাবলে গান গাবার শখ কার বা নেই! গান গাবার চেষ্টা নিজেদের ক্ষমতা মত সকলেরই ত করা উচিত, অন্তত ঝগড়াঝাটি আর বাজে কথায় কণ্ঠস্বরের অপচয় না করে। রূপহীণ অঙ্গেতে রূপ প্রয়োগের প্রচেষ্টা থাকে সকলেরই কিছু-না-কিছু—যার ফলে নিজেকে অসুন্দর কুরূপ ভাবেন না কেউ-ই। তেমনি কণ্ঠস্বরের যত্ন নিলে, তারও একটা সুফল মিলে বৈকি। যথার্থ সুকণ্ঠ বলে অন্যের কাছে আখ্যা না পেলেও নিজের কাছে নিজের কণ্ঠ ভাল লাগবেই লাগবে—যদি তা কখনও অনাদরে অবহেলিত না হয়। —এই সব কথা শিবানী মুগ্ধ চিত্তে শুনছিল আর ইচ্ছা হচ্ছিল তার,—সে নিজেও সুযোগ পেলে শিখে নেয়। গান শেখাবার সময় অমিতের নিষ্ঠা আর একাগ্রতা লক্ষ্য করছিল শিবানী, গভীর ভাবে করছিল: শিক্ষার্থীদের সত্যসত্যই প্রিয় করে নেবার আর্ট জানে অমিত—যেন ওদের মধ্যে নিজেকে একেবারে ঢেলে দেয়। আহা, শিক্ষক ত একেই বলে।

এবার শিবানী সহসা আরো একটু আলোর দিশা পেল এই ভেবে যে, অমিত আর কতটুকু চিনে নিজেকে! আর সত্যি বলতে কি, নিজেকে কেউই পারে না চিনতে। শিবানীর মনে পড়ে যায়, সেই লখনৌ-এ ডাঃ ভিয়াস্ অমিতের সুখ্যাতি করতে গিয়ে বলেছিলেন—সে যেমন প্রিয়দর্শন তেমনি ভারী সদালাপী ইত্যাদি। বস্তুতঃ তিনি অতিশয়োক্তি করেননি। তবু এর বেশি আরো কিছু আবিষ্কার করেছে শিবানী নিজে, অমিতের মধ্যে: অতি সাধারণ বাঙ্গালীদের মত কোঁচা দেওয়া ধুতি তার, পায়ে মোটা ভারী মরাঠী চপ্পল আর গায়ে হাতকাটা ধূসর খাঁকি খদ্দরের হাফশার্ট—এই ত! কখন বা ধুতির বদলে সে একটা লম্বা প্যাণ্ট পরে নেয় বাইরে চলাফেরার সুবিধার জন্য। এ পোষাক দেখে অমিত যে একজন শিল্পী কে বলবে! সর্বোপরি, যথার্থ গুণী হয়েও নিজের গুণ প্রকাশে সর্বদা সে সংকুচিত এমন কি অতিরিক্ত রকমের সচেতন। এ সমস্ত কিঞ্চিৎ হেঁয়ালি ঠেকলেও শিবানী স্থির সিদ্ধান্তে এলো: হ্যাঁ, এইটেই অমিতের যথার্থ পরিচয়। এক শ্রেণীর লোক আছে, তারা ছদ্মবেশের অন্তরালে নিজেদের সযত্নে গুটিয়ে রাখতে ভালবাসে, জাহির করতে চায় না কখনও। অথচ, বুদ্ধি থাকলে এঁদের কাছ থেকে যে-কেউ যখন-তখন খাঁটি কাজ উশুল করে নিতে পারে,—নেয়ও স্বচ্ছন্দে।

শিবানী মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, নাঃ এতটা জেনে শুনে আর কাছে পেয়ে অমিতকে সহজে ছেড়ে দেওয়া তার ঠিক হবেনা কিছুতেই। তাকে একটা সামাজিক উপকারে লাগাতেই হবে।

আজ তাই কথায় বার্তায় একটু সুযোগ বোঝে শিবানী এক ফাঁকে অমিতকে বলল: "এখন ত কি বিছ্‌ছিরী গোলমাল চলছে সারা দেশ জুড়ে। আর আপনিও যখন কলকাতায় আছেন আমাকে একটু সাহায্য করুন না।"

বাঃ চমৎকার সুন্দর প্রস্তাব। অমিত শিবানীকে সাহায্য করবে সে খুব ভাল কথা। অমিত আগ্রহ দেখালো: "বলুন, কি করতে পারি আপনার?"

"আমার স্কুলটা একদিন দেখুন এসে।"

"বেশ ত।"

॥ ২ ॥

ঢং ঢং করে স্কুল ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠতেই শিবানী তার অফিসে ডেকে পাঠাল টিচার দীননাথবাবু আর সুললিতাকে। তারপর দুজনকেই নিয়ে গেল তার বাড়িতে, বললে: "আমাদের স্কুলে একটা স্থায়ী গানের ক্লাস দরকার। তাহলে হয়ত ছাত্র আমরা আরোও পেতে পারি—কী বলেন দীননাথবাবু?"

দীননাথ ঘাড় কাঁৎ করে প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন।

কিন্তু সুললিতা টগবগিয়ে উঠল: "কেন? একজন টিচার ত দেখেছি মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসতেন মিউজিক শেখাতে—"

"সে তো অনেক আগে"—সজোরে বাধা দিল শিবানী: "ও-সবে আর চলবে না। একটা স্থায়ী ক্লাস চাই। আজকাল গানবাজনা আমাদের মেয়েদের অপরিহার্য।"

সুললিতা ও দীননাথ উভয়েই নীরব।

কিছুক্ষণ পরে দীননাথ বলেন: "সত্যিই ত, এ পাড়ায় গান শেখবার তেমন আর ব্যবস্থা কোথায়! মেয়েরা ত দেখছি, এখান থেকে ট্রামে বাসে করে সেই ভবানীপুর নয়ত বালিগঞ্জ—এমনকি সেণ্ট্রাল কোল্‌কাতা অবধি যাচ্ছে, নাচ গান বাজনা এসব শিখতে।" তারপর আস্তে আস্তে একটা নিগূঢ় মন্তব্য পেশ করলেন তিনি: "আমার যেন মনে হয়, ভাল একটা গানের ক্লাস খুলতে পারলে আমাদের স্কুলেরও ডিগ্‌নিটি বাড়বে বৈকি! অবশ্যি আদর্শ একটা ঠিক রাখতে হবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতন।" —বলতে বলতে চশমার পুরু কাচের ভিতর দিয়ে দীননাথের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শিবানী মনে মনে খুশি হল খুব,—গর্বিত হল তার স্কুলের টিচার এদিকেও চিন্তা করতে পারেন দেখে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ গান, নাচ দুইই দরকার শিবানীদি।" এবার উল্লাস জাগল সুললিতার কণ্ঠে।

"ঠিক আছে।" মৃদু হাসল শিবানী, বললে: "আমি আসছি এক্ষুনি।" উঠে গিয়ে পাশের ঘরে টেলিফোন ধরলে।

অপর পিঠ থেকে জবাব এল: "না, আপনার ডিস্‌ক্রেশনারি ফাণ্ড্ থেকে খরচ করতে হবে না এক পয়সাও। আপনি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে দিন শুধু।"

শিবানী আবার বললে: "ওঁকে ত আর সাধারণ পড়াবার টিচারের মতন মাইনে দিলে চলবে না, বেশ একটুখানি বেশি দিতে হবে যে! তাছাড়া আমাদের পেট্রন্ নবকুমারবাবুর বিশেষ পরিচিত উনি।"

"সে খেয়াল আমার আছে মিসেস্ মুখার্জি।" টেলিফোনের অপর প্রান্তে হেসে উঠলেন প্রেসিডেণ্ট যজ্ঞেশ্বর। বললেন: "আমি নিজেই স্কুলের ফাণ্ড্টা দেখব 'খন। কেমন, হল তো?"

জবাবে একটু হাসির কলধ্বনি ছড়িয়ে শিবানী মনে করিয়ে দেয়: "আবার ছোটখাটো আইন-কানুন আছে বেশ কিছু—সে-সবও বাঁচিয়ে চলতে হবে। আমি তা আপনার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম কিন্তু।"

এরপর কথার বিনিময় চলল আরো খানিকক্ষণ—সে সব অপ্রাসঙ্গিক।

"আর দেখুন"—রিসিভারটা রাখতে গিয়ে আরেকটা সংবাদ দিল শিবানী: "স্কুলে যে নতুন ক্লার্ক এসেছেন তাঁকে 'কোয়ালিফায়েড্' বলছে বটে সবাই, কিন্তু আমাদের কাজকর্ম কিচ্ছু বোঝেন না তিনি। রমাকান্তকে কি পাওয়া যেতে পারে কিছুদিনের জন্যে?"

"নিশ্চয়ই পাবেন। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে।"

এই রমাকান্তরই দূর সম্পর্কের মামাশ্বশুর যজ্ঞেশ্বরবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় শিবানীর বর্তমান স্কুল। লোকমুখে যজ্ঞেশ্বরের খুব নাম ডাক। এম্, এল্, এ হয়ে দেশ এবং দশের বহু উপকার করেছেন তিনি,—তারউপর, দানদক্ষিণা ত অহোরাত্র লেগেই আছে তাঁর বাড়িতে। বাড়ি করেছেন যজ্ঞেশ্বর, আলিপুর অ্যারিস্টো-ক্রেটদের পাড়ায়। তাঁর বসত বাড়িরই নীচের তলায় প্রথম স্কুল খোলা হয়েছিল ১৯২৮ সালে। সে সময়েরই কিছু আগে-পরে দক্ষিণ কলকাতায় রাসবিহারী এভিন্যু-এ নূতন ট্রাম চলা শুরু হয়েছে। ঐ ট্রামে করেই বালিগঞ্জ থেকে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন এ স্কুলের হেডমিস্ট্রেস মিস্ সুনন্দা গুহ,—এক নাগাড়ে আট বছর কাজ করেছিলেন স্কুলে। তিনি চলে গেলেন,—তার পর থেকেই ত

শিবানীর হাতে সব। …শিবানী কলকাতায় একটা সবিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূ,—আর তার নিজের প্রতিটি অঙ্গে যে কঠোর ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্ব—একজন স্কুল হেডমিস্ট্রেসের পক্ষে এ-সমস্ত গুণাবলী যজ্ঞেশ্বর কেন, কেউই উপেক্ষা করতে পারেন নি সেদিন। বুদ্ধি করে শিবানী স্কুলটাকে অবিলম্বে তুলে নিয়ে এল একটু দূরে যজ্ঞেশ্বরের এক বড় বাগানবাড়ির ফাঁকা জায়গায়। কেননা, অভিজাত ঘরের মেয়েরা আগে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়িতে গিয়ে পড়তে নানা কারণে ইতস্ততঃ, এমনকি আপত্তিও করত,—এবার নিঃসংকোচে এসে ভর্তি হল ওরা, দলে দলে আসল সবাই। ওই ত দেখতে না দেখতে দাঁড়িয়ে গেল প্রকাণ্ড এক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। …বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্কুলটিকে সাদরে অনুমোদন করে আসছেন। শুধু তাই নয়, ইতোমধ্যে একটা প্রস্তাব এসেছিল: প্রধানাশিক্ষয়িত্রী শিবানী মুখোপাধ্যায়ের নামেই স্কুলটা হোক—ছাত্রীদের অভিভাবক অভিভাবিকার অর্থাৎ, জনসাধারণ সকলের এই মত। কিন্তু আপত্তি তুললো শিবানী, কিছুতেই তা করতে দিলে না। স্কুলের নাম 'দি গার্লস ওউন্ একাডেমি' আগে যা-ছিল তা-ই রয়ে গেল। …এতদিন শিবানীর রূপ সবার চোখকে ধাঁদাতো, এবার তার গুণ আচ্ছন্ন করল ওদের মনকেও। বিমুগ্ধ হলেন সবাই, সহানুভূতিতে মন্তব্য কাটলেন: কোনো লোভ নেই, কোনো স্বার্থ নেই,—এমনকি নাম পাবার মোহটি পর্যন্ত নেই, অথচ সকলের ভালর জন্য খেটে মরচে—এমন মেয়ে ত সচরাচর দেখা যায় না বড় একটা! আর তাই, আদর্শ শিক্ষয়িত্রী হিসাবে শিবানীর সুখ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। অপ্রতিহতভাবে দি আলিপুর গার্লস ওউন একাডেমির প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর আসন স্থায়িভাবে উজ্জ্বল করে বসল সে।

এ সব ভাবতে বসলে শিবানীর বুক ভরে ওঠে পরমতৃপ্তিতে। আজ কত সম্ভ্রম কত প্রতিপত্তি তার! কোন স্কুলে, কোন হেডমিস্ট্রেসের এই ভাবের ডিস্ক্রেশনারি ফাণ্ড আছে শুনি! অথচ এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ঐ যজ্ঞেশ্বরবাবু। মর্যাদাবোধ আছে ভদ্রলোকের। শুধু হেডমিস্ট্রেস হলে চলবে না, তাকে সেক্রেটারির পদেও অভিষিক্ত করেছেন তিনি। স্কুলে একটা কমিটি আছে বটে; কিন্তু এর গড়াভাঙার ব্যাপারে শিবানী কখনো কারোর অপেক্ষা রাখে না। শুধু মাঝে-সাঝে একটুখানি জানিয়ে দেয় যজ্ঞেশ্বরবাবুকে এই যা।

আজও টেলিফোনে অমিতের কথাই বলছিল।

অমিতকে সে যে-করে হোক আনবেই—স্থির করেছে। কলকাতার কোনো স্কুলকে আর ডিঙিয়ে যেতে দেব না শিবানী। এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায়

তার চোখদুটো আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল। আর বাস্তবিকপক্ষে, তার যোগ্যতার উপর কার না অগাধ বিশ্বাস! সবাই জানে যে, দি আলিপুর গার্লস ওউন একাডেমি তার হেডমিস্ট্রেস শিবানী মুখার্জির তত্বাবধানে সব দিক থেকে সব রকমেই সুরক্ষিত। বিশেষ, আর্থিক সচ্ছলতার জন্য তাঁর স্কুলের সুনাম এত বেশি যে গার্লস ওউন একাডেমির সকল কর্মীরাই অন্যান্য স্কুলের কর্মীদের নিকট অত্যন্ত ঈর্ষার পাত্র। এখান-সেখান থেকে নিয়মমত অনেকগুলো aid-ও পাচ্ছে এই স্কুল। তবু ডোনার্স সংগ্রহের চেষ্টায় শিবানীর বিরাম নেই। স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই তার একমাত্র লক্ষ্য কাম্য।

পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে শিবানী চায়ের টেবিলে বসল দীননাথবাবু আর সুললিতাকে নিয়ে। চা খেতে খেতে দীননাথ জিজ্ঞেস করেন: "কী প্রেসিডেণ্টের সাথে কথা হল কিছু?" —দীননাথ বৃদ্ধ, উচ্চশিক্ষিত এবং স্কুল কমিটিতে টিচার্স-রিপ্রেজেণ্ট্যাটিভ্। তাঁর বিবেচনা-বোধের ওপর শিবানীর আস্থা যথেষ্ট।

শিবানী জবাব দেয়: "হাঁ কিছুটা হয়েছে। তিনি বললেন নাচ, গান দুটো ক্লাসই চলতে পারে আমাদের স্কুলে। কিন্তু আমি বলি, আপাতত শুধু গানেরই একটা হোক,—কেমন? কি মনে হয় আপনার?"

"বেশ ভালই ত। তবে পরিকল্পনার মধ্যে যেন নূতনত্ব থাকে।"

দীননাথের প্রস্তাব শিবানী নীরবে অনুমোদন করল।

"নাচের ব্যবস্থাও শিগগির করে ফেলুন।" সোল্লাসে গায়ে একটা ঝিলিক দিয়ে উঠে সুললিতা: "তাহলে কিন্তু খুব ভাল হয় শিবানীদি। আমরা তখন নিজেরাই সময় সময় ফাংশন করে স্কুলের জন্য টাকা তুলতে পারব দেখবেন।"

"অস্থির হয়ো না,"—সস্নেহে সুললিতার কাঁধে শিবানী তার একখানা হাত রেখে বোঝালে: "হবে, ধীরে ধীরে সবই হবে।"

॥ ৩ ॥

স্বয়ংপূর্ণ একখানা বড় ঘর নিয়ে অমিত থাকে ভবানীপুর একটা মেসে,—আর আলিপুর গার্লস ওউন একাডেমির মেয়েদের গান শেখায়।

শিবানীর গাড়ি সময়মত এসে তাকে নিয়ে যায়, আবার পৌঁছে দেয়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কী করে যে কাটে সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই অমিতের। শিবানীর সঙ্গে যা মৌখিক চুক্তি হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের-ঢের বেশি দিন কাটিয়ে দিল সে এই কলকাতা শহরেই।

শিবানী এ-নিয়ে ঘুনাক্ষরেও কিছু বলে না। কারণ সে ত মনে মনে চায়, অমিত স্থায়িভাবে তাঁর এখানেই থাকুক।

কিন্তু,—হঠাৎ মাদ্রাজ থেকে এক তামিলবন্ধু চিঠি লিখল অমিতকে: তুমি কি চিরকাল বাঙালীদের মধ্যে থাকাই স্থির করলে নাকি? ডীয়ার ফ্রেণ্ড্ আমাদের যে তাহলে শেষ পর্যন্ত ভুলে যাবে দেখছি!

অমিত যেন কেমন হয়ে গেল। মনে পড়ল তার:

সেই যেদিন শিবানী তাকে প্রথম স্কুল দেখার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিল। ঈশ্! দেখেই মনে মনে উজিয়ে উঠেছিল অমিত। কত বড় স্কুল! ছাত্রী সংখ্যাও অফুরন্ত, ওদের শৃঙ্খলাবোধ প্রশংসনীয়।

"তাহলে এই মুষ্টিমেয় কয়টি মেয়েকে দিয়ে গান করাচ্ছেন কেন মিসেস্ মুখার্জি?" অমিতের মুখে এই প্রশ্ন শুনে শিবানী বিস্ময়ে চোখ মেলেছিল শুধু।

অমিতই বলেছিল আবার: "দেখুন মিসেস্ মুখার্জি, যদি আপনার এখানে গান শেখানোর কাজে হাত দিই তাহলে আমি কারুকে 'হরিজন' করে রাখতে পারব না আমার ক্লাসে। আপনি প্রীজ স্কুলের সব মেয়েদের গান শেখার ব্যবস্থা করুন—আমি শেখাব।"

এ কথা শুনে মনের আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠেছিল শিবানী—এই ত সত্যিকার শিক্ষক! ভিতরের বিদ্যা অকৃপণ ভাবে উজাড় করে দিতে চায়। তবু সংশয় নিয়ে জানতে চেয়েছিল: "তা কি করে হয়? যারা গানে ইন্টারেস্‌টেড্ শুধু তাদের নিয়ে ক্লাস করলে সুবিধা নয় কি? —সহজও ত বটে।"

"হ্যাঁ কথাটা ঠিকই বলেছেন, প্রোফেশানেল্ মিউজিশিয়ান্‌দের ধারণাও তাই। তবে কি না।" —বলতে বলতে একটু থেমে অমিত শান্ত গলায় বুঝিয়ে দিয়েছিল: "দেখেছেন নিশ্চয়, একতারা বাজানো কত সহজ—কোনো অসুবিধা নেই তাতে। যে কেউ আঙ্গুল বুলোতে পারে ঐযন্ত্রের একটি তারের ওপর—তাতেই কাজ কুলিয়ে যায়। কিন্তু বীণা যন্ত্রটি বাজাতে না জানলে তা থেকে বিকট শব্দ বেরোয়। আবার বীণাকে আয়ত্তে আনতে পারলে দেখবেন, বহুর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় তা একতারার একঘেয়েমি থেকে ঢের-ঢের বেশি উপভোগ্য। বীণার মধ্যে শুধু একটা তার নয়, অনেকগুলি তার—সে তো সবাই জানে। তেমনি এ বিরাট বিশ্বসংসারে অনেক লোক—কারো সঙ্গে করো সুর আপনা থেকে বড় মেলে না। অথচ তা মেলাবার প্রয়োজন আছে—এ কাজ মোটেই সহজ নয়। এখানে সুবিধা কিংবা সহজের পথ—যা আপনি বলছেন, মিসেস্ মুখার্জি, তা খুঁজলে কি চলে—বলুন!"

গান শিক্ষা নিয়ে এত সুন্দর উপমাসমৃদ্ধ আলোচনা শিবানী আগে কখনও কোথাও শোনেনি। কাজেই অমিতের কথায় সে বিমুগ্ধ নির্বাক। এ বিষয়ে আর কোনো তর্ক বাড়ায়নি সে। তবে, একটা কথা আবার না বলে স্বস্তি পাচ্ছিল না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত বলেছিল খোলাখুলি ভাবে: "আপনাকে স্কুল থেকে সামান্য একটা অনরেরিয়াম্ দেবার ব্যবস্থা করব আমরা—তা কিন্তু দয়া করে আপনাকে নিতেই হবে।"

"বা রেঃ! আমি ত আর—"

"হ্যা হ্যা জানি, চিরদিন এখানে থাকতে চান না এই ত? বেশ, রাইয়ট অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামাটা থামুক—তখন না হয় চলে যাবেন। কেউ আপনাকে আটকাবে না আর।"

এ সব সেই প্রথম দিনের কথা।

তামিল বন্ধুর চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে বসে ভাবল অমিত। যা বলেছিল মুখে, কাজেও তা সে সবই করেছে—অবশ্যি শিবানীও তাকে সাহায্য করেছে প্রচুর। কিন্তু এই হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা থেমে গেলে পর তার ত এখানে থাকার কথা ছিল না আর। তা হলে? ···ভাবতে ভাবতে তার মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠল। তারপর একসময় সত্য সত্যই স্থির করে ফেললে,—সে আর কিছুতেই কলকাতায় থাকবে না। তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনায় সে অভ্যস্ত নয়—বোধহয় তা পছন্দও করে না। মেসের দেনা-পাওনা সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে নিজের জিনিষপত্র গুটাতে আরম্ভ করল এবার।

এই খবর পেয়ে বড়ো ভাবনায় পড়ল শিবানী।

অমিত এসেছিল বলেই ত তার স্কুলটা আজ আশাতীত উন্নতিতে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রীদের ভিড় কমছে না কিছুতেই। কাগজেপত্রেও আপনা থেকেই এর খ্যাতি ছড়িয়েছে প্রচুর। তাই মফঃস্বল থেকে ছাত্রীভর্তির আবেদন-সংখ্যা দিনে দিনে এত বেশি এসে জমছে, যে শিগগিরই হয়ত মেয়েদের জন্য একটা হোষ্টেলই তৈরি করাতে হবে। কিন্তু অমিত এখন হঠাৎ চলে গেলে—উপায়? ভাবলে, সুপ্রিয়াকে একবার ফোনে খবর দেওয়া যাক, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, থাকগে। নিজেই কি আর একটা ম্যানেজ করে নিতে পারবে না এর!

গাড়ি নিয়ে ছুটল শিবানী। আকাশে তখন চৈত্র মাসের ভরা রোদ্দুর।

"কী! ব্যাপার কি অমিতবাবু?" শিবানীর কণ্ঠস্বরে অমিত চমকে গেল। সামলে নিয়ে বললে: "আজ যাচ্ছি—"

"বেশ, যেতে চান—বাধা দেব না। কিন্তু যাব বললেই কি সব সময় যাওয়া হয়—বলুন ত?"

গান সম্পর্কে অমিত কত বড় বড় বক্তৃতা দিতে পারে, শিবানীর তাক লেগে যায় তা শুনে। কিন্তু এখন আশ্চর্য, শিবানীর এ সামান্য প্রশ্নের জবাবটি সে সহজে খোঁজে পাচ্ছে না! শিবানীকে বসবার কথাটুকু বলতে পর্যন্ত ভুলে গেল অমিত।

শিবানী মুহূর্তের ভিতর সমস্ত ঘরটার ওপর তার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে: "বাঃ, বেশ লোক ত আপনি! বিছানা একেবারে বেঁধে ফেলছেন দেখছি।" আর অপেক্ষা করল না সে অমিতের জবাবের। এগিয়ে গেল, নিজের হাতেই খুলে ফেলবে হোল্ড্অলটা।

"আমিই খুলছি শিবানীদি।" অপ্রস্তুত কণ্ঠে অমিত বললে: "এ ভারী নোংরা—হাত দেবেন না আপনি।" বলে শিবানীর হাত দুটো চেপে ধরলো।

শিবানী সে বাধা ভ্রূক্ষেপই করল না। নিজেই হোল্ডঅলের বাঁধন খুলতে খুলতে বললে: "আচ্ছা অমিতবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কি?"

"আমি যদি আপনার সত্যি দিদি হতুম"—শিবানীর কণ্ঠ যেন অভিমানে বাষ্পরুদ্ধ: "তাহলে কি আপনি আজ এমনি করে না বলে চলে যাবার বন্দোবস্ত করতে পারতেন—কখনও?"

পেছনে কোন বন্ধন কোন মায়াময় আকর্ষণ নেই বলেই অমিত অনায়াসে তা করতে পারে, কারুর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় না তার। এভাবেই ত চলে আসছে বরাবর। কিন্তু আজ শিবানীর অতি সামান্য ছোট-ছোট প্রশ্নগুলোও যে তাকে একেবারে বিমূঢ় করে দেয়।

অমিত তাই বোবা-দৃষ্টিতে এক পাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

শিবানী এই অবকাশে আরো চিনল অমিতকে। হাসি পেল তার। বললে: "এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। যান, দেখুন, এখানে কোথাও এক পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা। উঃ আমি যে এখন আপনার গেস্ট—তাও কি আবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার!"

অমিত লজ্জা পেয়ে বেরিয়ে এল।

খানিকবাদে ফিরে এসে দেখে, ইত্যবসরে তার বিছানাটি খুলে দিব্যি চৌকির উপর সুন্দর ভাবে পেতে রেখেছে শিবানী। দেয়াল থেকে ছবি ক'খানা নামিয়ে রেখেছিল অমিত—সেগুলোও যথাস্থানে সাজানো হয়ে গেছে। এখন কোমরে আঁচল জড়িয়ে শিবানী টেবিলের ওপর ইতস্তত

ছড়ানো কাগজপত্রগুলো সাজাচ্ছে গোছাচ্ছে। শিবানীর কপালে আর নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

এ-সব দেখে অমিত ঈষৎ বিব্রত হল; কিন্তু ভালও লাগল তার। এমন স্নেহ যত্নের স্পর্শকে কেই বা উপেক্ষা করতে পারে? তবু বাধা দিয়ে বলতে যাচ্ছিল অমিত: এসব থাক, আমি ঠিক করে নেব 'খন।

কিন্তু তার আগেই শিবানী বললে: "না এখন আর পালাতে পারবেন না কিছুতেই। সব গুছিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আমি।"

অমিত আর কাহাতক হাত পা গুটিয়ে থাকে।

ভেস্তে গেল তার চলে যাবার পরিকল্পনা।

চা খেতে খেতে শিবানী সকৌতুকে প্রশ্ন তুলল: "কেন, আপনার কী অসুবিধাটা হচ্ছে এখানে শুনি ত?"

অমিত নীরব,—এ ধরণের প্রশ্ন তার কাছে অপ্রত্যাশিত।

শিবানীই আবার বললে: "আপনার উপর ভরসা করেই ত আমরা অনেক কিছু করছিলাম।" বলতে বলতে গম্ভীর হল সে ক্রমশঃ। সম্প্রতি ইঞ্জিনীয়ারের আঁকা একখানা নক্‌সা তার ব্যাগ থেকে খুলে অমিতকে দেখাল: "এই দেখুন, স্কুলের পিছনে যে প্রায় দুই বিঘারও বেশি খোলা মাঠটা পড়ে আছে সেখানে এ সব নূতন নূতন বিল্ডিং উঠছে আমাদের। কমিটির বিশেষ পরিকল্পনা, স্কুলের সংগীত-বিভাগ থাকবে ঐ দিকে, আর এর সম্পূর্ণ ভার আপনার উপর আমরা ছেড়ে দেব। ···কিন্তু আপনি এখন চলে গেলে?"

এই প্রশ্ন অমিতকে বড় ভাবিয়ে তুলল।

জীবনযাত্রার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই ত তার ছিল না,—শুধু একমাত্র বেরিয়ে পড়া ছাড়া। ভারতের বাইরে যেতে হলে তার প্রস্তুতি চাই; —কিন্তু তা তো এক্ষুনি সম্ভব নয়। হয়ত মহীশূরেই যেত। কারণ, সেখানে আরো ক'জন আর্টিষ্ট মিলে একটা নর্থ ইণ্ডিয়ান্ মিউজিক সেণ্টার খোলার কথা ছিল তার। নতুবা ঘুরে ফিরে যেত বোম্বাই কিংবা আহমেদাবাদ। সে সব জায়গায় শিল্পীর সমাদর আছে অর্থের ছড়াছড়ি বলেই—তাছাড়া আর কি! অবশ্য ঐ সব সেই বৃটিশ আমলের কথা। তখনই ত বেরিয়েছিল সে মহীশূর যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু আজকাল যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, জাতের দৃষ্টিভঙ্গী কি আর বদলাবে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকতার গোঁড়ামিও বাড়বে বৈকি,—সবার মধ্যেই বাড়বে। এই অবস্থায় কী করবে অমিত? [illegible] কোনো বিশেষ

জায়গার উপর কোনো মোহ কিংবা আকর্ষণ তেমন কী-ই বা আছে তার! পরন্তু শিবানী এখন যা বললে এই দায়িত্ব নিতে সে আদৌ অসমর্থ নয়। এ ধরনের কাজই ত তার প্রিয়। সর্বোপরি এই মাত্র শিবানী আভাস দিয়েছে, প্ল্যান অনুযায়ী স্কুলের বাড়ি ঘর কমপ্লিট হয়ে গেলে একে আবাসিক শিক্ষায়তনে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা তার; যেমন আছে বেনারসে, ওয়ার্ধা-আশ্রমে এবং রবীন্দ্রনাথের বোলপুরে—তেমনি। এই প্রস্তাবটা কিন্তু অমিতের ভাল লেগেছে খুব। যদি তাই হয়ে যায় তাহলে তো সত্যসত্যই সে আরো অনেক কিছু করতে পারবে এখানে নিজের খুশি মত—এই শিবানীরই সহযোগিতায়।

অমিত এ সবই ভাবছিল অত্যন্ত গভীর ভাবে।

শিবানীর চা খাওয়া হয়ে গেছে।

"শুনুন"—অমিতকে আর বেশী ভাবতে দিল না সে। নিজের পরিধেয় সুসংবৃত করতে করতে মৃদু হাসলে: "দেখুন দিকিন, স্কুলের সব কাজকর্ম ফেলে এই অসময়ে ছুটে এলাম। জানলে, ওরা সবাই কী ভাববে! এখন যদি ফের পাগলামী করেন আমি বড় দুঃখ পাব।"

অমিত এবার বেজায় অপ্রতিভ।

"আচ্ছা, আমি এখন চলি। অনেক কাজ পড়ে আছে"—বলে শিবানী দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে—একটু ফিরে দাঁড়াল: "হ্যাঁ ভাল কথা, আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানেই খাবেন কিন্তু—বুঝলেন।"

রাত্রে খাবার টেবিলে বসে শিবানী কথা প্রসঙ্গে অমিতের সুদূর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেল অনেকটা। বুঝতে পারল, অমিতের চঞ্চলতার কারণ। যেমন তার কর্মক্ষমতা তেমনি পর্যাপ্ত কাজ পেলে এই চাঞ্চল্য কমে আসার সম্ভাবনা। শিবানী তাই নিজেই মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠল, অমিতকে কী করে প্রচুর স্কোপ দেওয়া যায়! কলকাতায়ই তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চায় শিবানী। বললে: "আপনি আর দিল্লী বোম্বাই মহীশূর ঘোরাফিরা না করে এখানেই বরাবরের মতন থাকার চেষ্টা করেন না কেন? যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"

শিবানীর এই অযাচিত সৌজন্যে অমিত খুশী হল, মনের মধ্যে একটা ছোট্ট তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল নিজের অজান্তে। এই চিন্তাই যে তার মাথায় ঘুরছিল সেই দুপুর থেকে। শিবানী যেন তাকে এই সূত্রে আরও বেশি আকর্ষণ করলে।

খাওয়া দাওয়া সেরে বসল এসে ড্রয়িংরুমে।

"মেসে থাকা-খাওয়া আপনার পক্ষে খুব অসুবিধা, কেমন না মাষ্টারমশাই ?" প্রশ্নটা তুলে শিবানী অন্তরঙ্গ হতে চাইল।

অমিত কিছু বলল না।

"ভাবছিলাম একটা অনুরোধ করি"—দ্বিধা নিয়ে শিবানী ফের জিজ্ঞেস করে : "আপনি কি তা রাখবেন ?"

"বলুন।"

"চলে আসুন না আমাদের বাড়িতে। এখানে শুধু মিহির আর অদিতি—আমার এই দুটি ছেলে মেয়ে, আর আমরা মাত্র দু-জন। তাছাড়া সমস্ত বাড়িটাই ত একদম ফাঁকা পড়ে থাকে সব সময়।"

"ভেবে দেখব।" অমিত অলসভাবে বললে।

"না, না, আসছে মাস থেকে আমার এখানে চলে আসুন আপনি। আমি আর কিচ্ছুটি শুনতে চাইনে। যদি আমার বাড়িতে থাকা অসুবিধা মনে হয় তাহলে স্কুলের পাশেই একটা বাড়ির উপরতলায় ছোট্ট দুইখানা ঘর খালি আছে, বেশ নিরিবিলি। সেখানে থাকতে পারেন আপনি ইচ্ছা করলে। ভাড়া, এখন মেসে যা দিচ্ছেন তা দিলেই হয়ত চলবে। যদি বলেন, আমি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা কয়ে দেখতে পারি।"

"বেশ ত, ঐটেই নেওয়া যাবে" উৎসাহ—দেখাল অমিত।

"কিন্তু খাবার ব্যবস্থা আমার এখানেই হবে আপনার।"

অমিত এ কথার কোনো উত্তর দিল না। তবে কথায়-কথায় শিবানী যখন বললে যে,—প্ল্যান অনুযায়ী স্কুলের সব নূতন বিল্ডিং ওঠবার আগে টিচার্স কোয়র্টারের কাজ আরম্ভ হবে শিগগিরই—তখন অমিতের মুখ থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে এল : "ইশ্! এসব সুন্দর বিল্ডিঙে কি আর আমি থাকতে পাব !"

অমিত ভেবে-চিন্তে বলেনি কিছু ; কিন্তু শিবানী এর উপর গুরুত্ব দিয়ে বললে : "আপনি যদি স্থায়িভাবে আমার স্কুলে কাজ করতে প্রস্তুত থাকেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার জন্যে একটা কোয়র্টার্ তৈরী করিয়ে দেব।"

"কিন্তু শাস্ত্রীয়ব্যাকরণ মতে আমি যে বিশুদ্ধ একক"—চোখ বিস্ফারিত করে অমিত মৃদুকণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দেয় : "এ কথাটা ভুলে যান নি ত ?"

শিবানী হি-হি করে হেসে উঠল এবার।

"হাসবেন না শিবানীদি"—অমিত একটু গম্ভীর বিনত কণ্ঠে বললে : "আমি ঠিক কথাই বলেছি। ভেবে দেখুন, আমি একে ত পুরুষমানুষ—এর উপর অবিবাহিত —এই অবস্থায় মেয়েদের স্কুলে কাজ করা হয়ত চলে যেতে পারে কোনরকম ;

কিন্তু যতদিন না তা আবাসিক বিদ্যালয় বলে পরিগণিত হচ্ছে তার আগে স্থায়িভাবে স্কুল-কমপাউণ্ডের মধ্যে কোয়ার্টারে এসে বসবাস করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? আর, আপনার এই প্রস্তাব কি সর্বসম্মতিক্রমে স্কুল-কমিটি গ্রহণ করবেন!"

থেমে গেল শিবানীর হাসি।

আত্মমর্যাদায় আঘাত পেয়েছে সে। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটখানা চেপে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল শিবানী, তারপর জিদ ধরে বললে: "বেশ, আপনি শুধু বলুন একটিবার যে, আপনি এখানে স্থায়ী ভাবে থাকতে রাজি আছেন,—তারপর দেখুন, আমি সব ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।" অসম্ভব রকমের দৃঢ়তা ভেসে উঠল তার চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে।

অমিত এ ব্যাপার নিয়ে এতদিন কিছুমাত্র কৌতুহলী ছিল না। কিন্তু আজ সহসা শিবানীর চেহারার ভিতর কঠোর ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষ্য করলে। সমস্ত কিছু নির্ভর করার জায়গা পেয়ে একটা পরম স্বস্তিও অনুভব করল সে।

মনে পড়ল, আজই ত মধ্যাহ্নে ভবানীপুর-মেসে গিয়েছিল শিবানী, সেখানে তার কাছে বসে তাকে সস্নেহে নানা কথা দিয়ে বুঝিয়েছে: কী হবে এইভাবে ছুটাছুটি করে,—আর মেসে হোটেলে দিন কাটিয়ে? কলকাতায়ই অনেক কিছু করবার আছে আপনার, স্থির হয়ে বসুন একজায়গায়। ...তাছাড়া আমরাও ত আপনাকে অন্যান্য সব টিচারদের মত দেখি না,—তাহলে কেন আপনি চলে যেতে চান? যাবেন না।

॥ ৪ ॥

দিবাকরবাবুর ছোটভাই প্রভাকরের বিয়ে,—যশো'রের বনেদী কুলীন গাঙ্গুলী বংশের মেয়ের সঙ্গে।

এই কাজে হরিতকীবাগানের মুখার্জি বাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্রবধু শিবানীর আজ মোটেই বিরাম নেই। ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি—বিয়েবাড়ির দেখাশোনা ইত্যাদি সমস্ত ভার একা তাঁর উপর। গৃহকর্ত্রী ব্রহ্মময়ী আছেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নির্বিকার। নির্জনে বসে আছেন ঠাকুরঘরে, সামনে তাঁর খোলা —গীতার সেই পৃষ্ঠা: ...মন্মনাভব মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাম্ নমস্কুরু...

সুরে সুর মেলাতে পারছেন না কিছুতেই। চিত্ত বিকল হয়ে উঠছে। মনে পড়ছে বারবার: মৃত্যুর দিন কয়েক আগে রঘুনাথবাবু তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, দেখ, কিছু পেলে কি পেলে না এই নিয়ে বিচার করতে যেও না কখনও।

এ দুনিয়ায় কিছুই তোমার নয়, আমারও নয়—এইটুকুনই মনকে বোঝাতে শেখাও। —বলে প্রসন্নহাসিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। …ব্রহ্মময়ীর চোখদুটো তখন কান্নায় যেন গলে পড়ছে। সেই চোখ নিজের রুগ্নহস্তে সযত্নে মুছিয়ে দিতে-দিতে রঘুনাথ আবার বলেছিলেন, সারাজীবনে এইটুকুন জেনেছি সবকিছু চলছে ঐ উপরওয়ালার ইঙ্গিতে,—তুমি আমি এখানে নিমিত্তমাত্র। যা তাঁর করার ইচ্ছা, সে ভালহোক মন্দহোক, তিনি তা আমাদের দিয়ে দিন-দুই আগে নয়ত পরে একবার করাবেনই করাবেন। এ নিয়ে দুঃখ কিংবা সুখ করার কোনো মানেই হয় না। তাই বলি, নিজের হাতে সংসারের হাল ধরতে যেয়ো না আর কোনদিন,—ছেড়ে দাও সব তাঁর ওপর,—নিশ্চিন্ত হয়ে বস। দেখবে, ঠিক ঠিক জায়গায় তিনি আমাদের পৌঁছে দেবেনই একদিন।

সেই অবধি ব্রহ্মময়ী আর সংসারের কাজকর্মে কোনো হাত দিতেন না।

রঘুনাথবাবুই বা কেন এসব কথা বলতে গেলেন!

এক বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যা।…

বেশ মনে পড়ে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন ব্রহ্মময়ী।

ঠিক তার আগের দিন মধ্যাহ্নে—

সহসা কলকাতার আকাশ ভেঙে তুমুল বর্ষা নামল। দিবাকরের গাড়িখানা বাড়িমুখো দ্রুত ছুটছে তখন,—চৌরঙ্গী থেকে বেরিয়ে ধর্মতলার মোড় ঘুরে ওয়েলিংটনষ্ট্রীট তারপর কলেজষ্ট্রীটে এসেছেন তিনি। কিন্তু এ কী! রিমঝিম অবিরাম বর্ষণ—ওরই তালে তাল মিলিয়ে সিমেণ্টের ফুটপাথ এড়িয়ে পিস্‌ঢালা বড় রাস্তা ধরেই পরমানন্দে ভিজতে-ভিজতে হেঁটে চলেছে—এ কে? গাড়ির গতিটা কমল দিবাকরের। রাস্তার বাঁপাশ ঘেঁষে বোধহয় একটু অন্যমনস্কতায় ব্রেক চাপলেন তিনি।…একে মেয়েই বলা চলে, কেননা, বয়সটা খুব বেশি হলে ষোল-সতের হবে। চাঁপাফুলের মত গায়ের রং। তার সুকোমল দেহে ফিকে হলদেরঙের ব্লাউজটা ভিজে গিয়ে অপূর্ব এক গ্রীকভাস্কর্যের মায়ায় জড়িয়েছে। এ সমস্তই দেখা যাচ্ছিল তাঁর গাড়ির ভিতর থেকে। নিশ্চিন্ত আরামে মাথাটা হেঁট করে এতক্ষণ চলছিল সে। এবার গাড়ি থামার শব্দে পিছন ফিরে চাইতেই দিবাকর অবাক হলেন! চোখে মুখে তার হাসি উছলে পড়ছে—যেন একান্ত পরিচিত। আবার গাড়ির কাছেই যে এগিয়ে এল। নেই সংকোচ, নেই জড়তা, আশেপাশে দৃষ্টির ভেতরে আর কেউই নেই। দিবাকর তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে বিশেষতৎপরতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন: "কিছু বলছেন আপনি?"

"কৈ, না-ত!" সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব গম্ভীর হল মেয়েটি।

দু-জনেই ভুল বুঝলেন দু-জনকে।

ক্ষণিকের মধ্যে তরুণ দিবাকরের অন্তর জুড়ে বিদ্যুৎতরঙ্গের মত একটা অজানা শিহরণ জাগল। …বর্ষাপ্লুত কলকাতার জনশূন্য রাজপথে দাঁড়িয়ে একাকিনী সিক্তবসনারূপসীতরুণী—তাকে উপেক্ষা দেখিয়ে কী করেই বা তিনি চলে যান! ভারী মুশকিলে পড়লেন দিবাকর।

"এ ভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন?" আবেষ্টনীর নির্জনতার সুযোগ নিয়ে দিবাকর অনেকটা নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন: "চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি আমি।"

"মেনি থ্যাঙ্কস্"—এবার সত্যই ঝিলমিল করে উঠল মেয়েটি। আর দ্বিতীয় অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে দিব্যি আপনজনের মত গাড়ির ভিতর ঢুকে নিঃসংকোচে গিয়ে বসল দিবাকরের পাশে।

দিবাকর স্বভাবত কিঞ্চিৎ বিহবল হলেন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে যেমন বিস্ময়-এর তেমনি আনন্দেরও বটে। তবে এতোখানি আশা করেননি তিনি, কেননা বয়সটা তাঁরই বা কত? হবে দু-চার বছরের এদিক-সেদিক।

…ভেজা চুলের রাশটা দুহাতে নিংড়াতে-নিংড়াতে মেয়েটি হেসে ফেলল, বললে: "আজ:ক গাড়ি চাপা পড়েছিলুম আর কি!"

এমনতর বৃষ্টির দিনেও যে বুকের ভিতর বসন্তের হাওয়া খেলা করে সে সংবাদ দিবাকরের জানা ছিল না। তিনি আপন বিহ্বলতায় অনুযোগটা যেন শুনেও শুনলেন না। বিমূঢ়ের মত অবাকনেত্রে দেখছিলেন শুধু: মসৃন, কপালের কাছে ভেজা ঘন কালো চুল লেপ্‌টে আছে তার,—ফর্সাগালে, নাকে, চোখের পাতায় অজস্র বৃষ্টির জল—তা মেয়েটির উন্মুক্তগ্রীবা বেয়ে যদৃচ্ছগতিতে নিম্নগামী—কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

"কৈ, গাড়ি ছাড়ছেন না যে? কী দেখছেন অমন করে?"—নীরব হাসিতে মেয়েটি সুধোয়: "খুব বেশি রকমের চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে—না?"

দিবাকর অপরাধীর মত দৃষ্টিটা তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নিয়ে গাড়ি ছাড়লেন আস্তে আস্তে—যতটুকু আস্তে সম্ভব।

'ব্যাস্ সোজা চালিয়ে যান।" মেয়েটি রীতিমত এক দক্ষ পরিচালিকার অভিনয় সুরু করল যেন। অস্ফুটে বললে, আঃ আগে জানা থাকলে এবার এ গাড়িতে করে ঠাকুর দেখতে গেলে হত কিন্তু!

দিবাকর শুনতে পেলেন সব,—বললেন না কিছু—মুখটিপে মাত্র হাসলেন একটু। এবার স্মৃতিতে তাঁর স্পষ্ট ভেসে উঠল :

এইত লাস্ট ক্রিস্‌মাস্‌-এ য়ুনিভার্সিটিইনষ্টিটিয়ুট্‌ হলে রবিবাবুর 'নটীরপূজা' প্লে করল মেয়েরা—সেখানে এই মেয়েটিই যে সেজেছিল 'শ্রীমতী'! বাব্‌-বাঃ, চারদিক থেকে সেদিন কত প্রশংসা কত উপহারের ঠেলাঠেলি ওর উপর।… দর্শকদের সামনের সারিতে বসেছিলেন দিবাকর। নিজের চোখেই ত দেখলেন সব। আর, আজ কিনা দৈবাৎ—সেই দুর্লভ হিরোইন্‌-ই একেবারে তাঁর কাছে বসা। অনেক কথা বলবার ইচ্ছা হচ্ছিল দিবাকরের; কিন্তু তেমন অভ্যাস কোথায়! তাছাড়া, ওর সঙ্গে তাল রেখে কথা বলা কি সহজ কাজ!

'ঈশ! কাপড় চোপড় একদম ভিজে গেছে দেখুন দিকিন।' দিবাকরের চিন্তাস্রোতে বাধা দিল মেয়েটি, নিজেকে সহজ করে নেবার অছিলায় আরো ঘনিষ্ট হয়ে বলতে থাকে : 'আজ বাড়ি গেলে পর আমার কপালে নির্ঘাৎ বকুনি আছে,—কি বলেন।' একটু গা মোড়া দিয়ে আবার বললে : 'আর এই দেখুন আপনার গাড়ির এতো দামি সুন্দর সিট্‌খানাও নষ্ট করে দিলুম ত!'

উঃ কী অনর্গলই না কথা কইতে পারে সে! অথচ তারি কাছে বোবার মত বসে গাড়ি চালাচ্ছেন দিবাকর, বলতে যাচ্ছিলেন, যদি গাড়ির সিটের প্রতি এত মমতা হয় তবে এই যে আমার 'রেইন্‌কোট্‌'টা আছে—পেতে বসুন না। নাঃ তাহলে কী ভাববে আবার, ছিঃ। তার চেয়ে বরং—গাড়ির সিট নষ্ট হবে না, আপনি ভাল করে হাত পা গুটিয়ে বসুন ত। এই জবাবই হবে ঠিক জুৎসই। এইভাবে একটু বেশি বলবার তালিম দিচ্ছিলেন মনে-মনে, কিন্তু তার আগেই সে যে নিজ থেকে তাড়াতাড়ি নড়ে-চড়ে আরো গাঁট হয়ে বসল দিবাকরের গা ঘেঁষে। দিবাকরের গায়ে সামান্য একটুখানি হাতের ছোঁওয়া লাগতেই বাঁকা চোখে হেসে উঠল : 'আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে না!'

'না না না'—দ্রুতলয়ে প্রতিবাদ করলেন দিবাকর, আর ঐ সঙ্গে নিজেকে খুব সসংকোচে গুটিয়ে নিলেন কিছুটা। যেন অপরাধটা তাঁর নিজেরই।

এরপর…পূর্ণ নিস্তব্ধতা। বাইরে শুধু জল পড়ার শব্দ।

খুব মন্থর গতিতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরে সোজা উত্তর দিকে এবার গাড়িখানা এগোচ্ছে দিবাকরের।

'জানেন',—বোধহয় দিবাকরকে চমকে দেবার মৎলবেই হঠাৎ মেয়েটি কথা তুললো : 'কোথায় থাকি আমি? আপনার বাড়ির কাছেই কিন্তু।' বলতে বলতে কোমলাঙ্গে সুন্দর এক আড়মোড়া দিয়ে ঠোঁট চেপে হাসল একটু।

'কোন দিকে?' ছোট্ট প্রশ্ন করে দিবাকর আর পারলেন না বলতে : এই রকমের একটা কিছু ভেবেছিলুম আমিও। তাহলে যদি আবার মন্তব্য করে বসে, অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছেন বুঝি! যা মেয়ে—অসম্ভব নয় কিছু।

ঠিকানা বলল মেয়েটি : 'ঐখানেই আমায় নামিয়ে দেবেন প্লিজ।' এরপর আপন মনে বলে বলে শোনালো : কতটুকুই বা পথ! হেঁটেই যেতে পারতাম, অযথা একটি ভদ্রলোককে জ্বালাতন!

'কী বলছেন?' দিবাকরের এবার লোভ হল মন্তব্য করবার, তাই ছোট্ট করে বললেন : 'আপনার বুঝি বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভাল লাগে? এমনি করে সব মেয়েরা ভিজে দেখেছি।'

'তাই নাকি!' আড়চোখে তাকিয়ে ঠোঁটে হাসি চেপে খক্‌খক্ করে মেয়েটি হঠাৎ কপট কাশির শব্দ করে উঠল : 'উঃ গেলুম, ইস্—এখন নিমোনিয়া না হলেই বাঁচি।'—নিজের বুকের উপর সুন্দর দুখানি হাত চেপে ধরে চোখ বুঁজে নাটকীয় ভঙ্গী করল ওস্তাদ অভিনেত্রীর মতন।

হেসে ফেললেন দিবাকর।

কিন্তু লঘু পাল্টা জবাব আর কিছু তাঁর জিবে এল না। তিনি হরিতকী বাগানের জমিদার পুত্র, বিশিষ্ট রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। সেদিনে অচেনা বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমনি করে অবাধ মেলামেশার রেওয়াজটা ওঁদের মধ্যে তেমন সচল ছিল না। তাই বোধকরি মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তায় নিজের তৎপরতার পরিচয় দিতে না পেরে তিনি বারবার পিছিয়ে পড়ছিলেন, আর ক্রমশই যেন কানের ডগাটা তাঁর লাল হয়ে উঠছিল।

'দাঁড়ান,—থামুন থামুন, এই যে আমাদের বাড়ি।'—মেয়েটি সহসা চেঁচিয়ে উঠল প্রায়।

দিবাকর থামলেন।

'ধন্যবাদ আপনাকে'—গাড়ির দরজা খুলতে-খুলতে সকৃতজ্ঞ ভঙ্গীতে মেয়েটি বলল আরো : 'কাল কিন্তু যাচ্ছি মাসীমাকে প্রণাম করতে জানিয়ে রাখবেন।' তারপর রাস্তায় নেমে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে পালাল সে।

তখনও জল পড়ছিল অবিরাম।

পরদিন…

মেয়েটি কিন্তু এল সত্যি সত্যিই। ফটকে ঢুকতে-না-ঢুকতে সন্ধ্যার আলো সব জ্বলে উঠল বাড়ির চারদিকে।

তখনই—

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন ব্রহ্মময়ী। দূর থেকে দেখতে পেলেন, নূতন কে যেন আসছে– চোখ ফেরাতে পারলেন না—থামলেন একটু। …বুদ্ধি আছে বটে মেয়েটির। ইনিই যে দিবাকরের মা ব্রহ্মময়ী—অনায়াসে চিনলে সে। নির্দ্বিধায় কাছে এগিয়ে এল,—তারপর আপনজনের মত হেঁট হয়ে প্রণাম করল তাঁর পায়ে।

'আমার নাম শিবানী ঘোষ।' প্রণাম করে ঘরের মধ্যে এসে মেয়েটি বসল ব্রহ্মময়ীর কাছে, বললে, নিকটেই থাকে ওরা—এই গোয়াবাগানে।

তার স্বভাবজাত রূপলাবণ্য আর সুমার্জিত ভদ্র নম্র আচরণ ব্রহ্মময়ীর মন ও চোখকে প্রথম থেকেই প্রলুব্ধ করে তুলছিল,—তার প্রতি তেমনি সৌজন্যও দেখাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু, যখন জানলেন যে শিবানী বিন্দুবালা ঘোষের কন্যা তখন ব্রহ্মময়ীকে ভাবতে হল অনেক কিছু।

বিন্দুবালা দীর্ঘকাল যাবৎ এ পাড়াতে আছেন। তিনি বিধবা, অথচ তাঁর চালচলন বড় বিস্ময়কর। তিনি ঠোঁটে লাল রং মাখেন, চোখে কাজল দেন, গায়ের রংটা উজ্জ্বল গৌর হলেও কৃত্রিম প্রসাধনের উপর তাঁর একটা অস্বাভাবিক ঝোঁক বরাবরেরই। নিজের একখানা টমটম গাড়ি আছে—একাই তাতে করে সকাল-বিকাল ঘুরে বেড়ান। বিধবা হবার আগে রীতিমত পর্দানশীন ছিলেন বিন্দুবালা—একথা শোনা যায়। কিন্তু এখন কেন যে এমনতর বিলাসীতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি তাঁর গোটা সধবার জীবনটাকেই নিষ্প্রভ করে তুলেছেন এর কারণ কেউ খোঁজে পান না। আর, পাবেনই বা কী করে? বিন্দুবালা যে পাকা ইংরেজীতে কথা বলেন, খৃশ্চানদের কোন এক বইয়ের দোকানে চাকরিও করেন যেন। পুরুষবন্ধু তাঁর অনেক। মোটকথা, বিন্দুবালা পুরাদস্তুর আধুনিকা। হলেনই বা বাঙালী মেয়ে, তা-বলে তাঁর কি একটা স্বতন্ত্র আভিজাত্য থাকতে নেই! প্রায়ই দেখা যেত তাঁর বাড়ির দুয়ারে কলকাতার অনেক মানীলোকদের গাড়ী এসে থামছে। অথচ, কোনোরকমের উচ্ছৃঙ্খলা কিংবা অসংযমের বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই তাতে। এইটাই চরম বিস্ময়! সেই বিস্ময় ভেঙ্গে ভালমন্দ কোনো মন্তব্য রটাবার মনোবল ছিল না কারুরই। আর সেইজন্যেই বিন্দুবালা যে কোন সমাজের লোক তা বলা সত্যই দুঃসাধ্য। কেবলমাত্র যেদিন বছর চারেকের শিবানী এবং দেড় বছরের কল্যাণী এই দুটি মেয়েকে নিয়ে তিনি নূতন উঠে এসেছিলেন এ-পাড়ায় সেদিনই আশে-পাশে প্রবীণাদের মধ্যে একটা অতি ক্ষীণ আলোচনার ধ্বনি উঠে সঙ্গেসঙ্গেই থেমে গিয়েছিল: আহা মরি মরি! সর্বাঙ্গে কী অপরূপ দীপ্তি এ

বিধবাটির! সাধে কি আর শুধু শুধু রূপে আকৃষ্ট হয়ে বিলেতফেরৎ ডাক্তার প্রিয়ব্রত ঘোষের ছোটভাই পুণ্যব্রত তাঁর মা-বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওঁদের সকল সংশ্রব ছেড়ে দিয়েই বিয়ে করেছিলেন এই 'বিন্দুবালাকে! ব্যস্ এই পর্যন্তই। তাছাড়া বিয়ের সংবাদটা তখনকারদিনের কাগজেও ছাপা হয়েছিল বেশ ফালাও করে। আর, তাই না স্বভাবতঃ ওঁকে দেখবার কৌতূহল হয়েছিল অনেকের। দরজা জানলা ফাঁক করে দল বেঁধে দেখেওছিলেন ওঁরা—আজও দেখছেন। সেই প্রবীণাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বিদেয় নিয়েছেন ধরাধাম থেকে, নতুন যারা আছেন তারা কেউ কাছ ঘেঁষতে পারেন না বিন্দুবালার। আর বিন্দুবালাই বা ওদের সঙ্গে মিশতে যাবেন কেন! তাঁর যে ব্যক্তিত্ব আছে, আছে বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ —এ তো তিনি হারাতে পারেন না। তিনি নিজে একজন নারীজাগরণ ও সামাজিক আন্দোলনের উদ্যোক্তা;—বলেন, সমাজ নেতারা নাকি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মৎলবে বিধবাদের চিরকাল পঙ্গু সাজিয়ে রেখেছেন। আসলে, এ দেশের বিধবাদের ব্রতপার্বণ, কৃচ্ছ্রসাধন—এ সমস্ত বিন্দুবালার কাছে একটা নিছক প্রহসনের ব্যাপার। আত্মসংযম নাকি আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর মাত্র—এমনিতর সব অভিমত জোর গলায় প্রচার করেন তিনি—আর তাই শোনে-শোনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে ওঠে। এ-সব কারণে, বিন্দুবালার স্তাবকসংখ্যা আগে যেমন ছিল আজও তেমনটি আছে। এবং দুঃসাহসী গোপন অনুকরণকারিণীর দলও আর কম নয় তাঁর—এ পাড়ায়।

এই সমস্ত বাইরের সংবাদ জমিদার রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত অট্টালিকায় সরাসরি ঢোকবার কোনো ছিদ্রপথও ছিল না।

আজ সেই বিন্দুবালারই কন্যাকে নিজের ঘরের ভিতর পেয়ে জমিদার পত্নী ব্রহ্মময়ীর কৌতূহল অদম্য হল। সর্বোপরি শিবানী যখন কথাপ্রসঙ্গে বিশেষকরে জানাল যে, সে ডাঃ প্রিয়ব্রত ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রী, তখন আর ব্রহ্মময়ী তাকে উপেক্ষা করেন কি করে! ডাঃ প্রিয়ব্রত তো আর যা তা লোক নন। কলকাতা শহরে একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়—দিবাকরের মা এ-কথা ভাল করেই জানতেন। কাজেই, শিবানীকে ভিতরে ডেকে নিয়ে খুব সমাদর করলেন তিনি এবং পিতৃহীনা কন্যা বলে সেও দেখতে-দেখতে দিবাকর-জননীর বিশেষ স্নেহভাজন, আর সেই বাড়ির সকলের আপনজন হয়ে উঠল।

রঘুনাথের বড় ছেলে দিবাকর মুখোপাধ্যায় স্কটিশচার্চকলেজের ছাত্র, বি-এ সেকেণ্ড-ইয়ার চলছে তাঁর।

আর, শিবানী পড়ে বেথুনে—বি-এ ফার্স্ট ইয়ার।

সুতরাং এর পর থেকে শিবানীর সহজ আসাযাওয়া এবং মেলামেশার মাত্রা মুখার্জি বাড়ির ভেতর দিন-দিনে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে আর বাধা রইল না কিছু।

একদিন শিবানী ছুটতে-ছুটতে দিবাকরের মা'র কাছে এসে অনুযোগ করল: 'দেখুন ত মাসিমা, আপনার ছেলের জন্য এত কষ্ট করে একখানা টিকিট যোগাড় করলুম,—তা উনি এবার যেতে চাইছেন না কিছুতেই।'

'কিসের টিকিট?' উৎসুক হলেন ব্রহ্মময়ী।

'আমাদের কলেজে একটা ফাংশন হবে—তারই।'

'তা দিবাকর কি বলে?'

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দিবাকর: 'মা'র কাছে বুঝি আবার নালিশ করা হচ্ছে?'—তারপর অসহিষ্ণুর মত দ্রুত মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন: 'না, মেয়েদের কলেজে গিয়ে গান শোনার আমার এত সময় নেই।'

দিবাকরের মা মুখ টিপে হাসলেন, বললেন: 'তোর সব টাতেই বাড়াবাড়ি। যা না, দেখে আয় ওদের ফাংশনটা বাড়ির কাছেই ত। এত সাধাসাধি করছে বেচারা তোকে নেবার জন্যে।'

দিবাকর অগত্যা যেতে সম্মত হলেন এবং পরমুহূর্তেই শিবানী যখন আড়ালে গিয়ে স্নিগ্ধহাসির অন্তরঙ্গতায় তাঁকে ফিস্‌ফিস্ করে বললে: 'তুমি জানো না কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এসেছেন তাঁর শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে! তাঁর নূতন লেখা 'তপতী' নাটকটি আজ রাত্তিরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দেখানো হবে, আমি সেখানে যাবারও ব্যবস্থা করেছি।' তখন দিবাকর আনন্দে-খুশিতে উজিয়ে উঠলেন, বললেন: 'আরে সে-কথা ত আগে বলতে হয়। তা না বলে বলছ তোমাদের কলেজের ফাংশান—কী যে সব কাণ্ড!!' কিন্তু শিবানী এই উৎসাহে একটু বাধা দিয়ে বলল: 'অবশ্যি কলেজে আমার নাচের আইটেম্ আছে—সেটা সেরে যেতে হবে আগে। তা আমি ফাংশনের শুরুতে ৫টার মধ্যেই শেষ করে নেব।' 'ঠিক আছে—চল না'—এবার যেন যাবার আগ্রহটা দিবাকরেরই বেশি। শিবানী তা টের পেয়ে শান্তগলায় আধিপত্য ছড়াল: তাহলে তুমি শিগগির তৈরি হয়ে নাও গে, আমি এই এলাম বলে।

বি-এ পাশের পর শিবানীকে উৎসাহ দিলেন দিবাকর: 'বেশ, এবার এম-এ টাও পড়ে নাও। আমি সাহায্য করব খন।'

কথাটা শিবানীর খুব মনঃপূত হল এবং তা জানালো সে বিন্দুবালাকে।

বিন্দুবালা মনে মনে বিজ্ঞের হাসি হাসলেন, বুঝলেন সবই। বললেন : 'এম-এ পড়তে পার ত ভালই। আচ্ছা, আমিই দেখছি।'

পুণ্যব্রতের মেয়ে কল্যাণীকে মাদ্রাজ নিয়ে গিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা। সেখানেই এক ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে তিনি এই সংবাদ কলকাতায় বিন্দুবালাকে জানাতেই বিন্দুবালা সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু বিয়েতে নিজে যাননি।

'ভালই হয়েছে ওঁর না এসে।'—একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে অন্নপূর্ণাকে বলেছিল কল্যাণী : 'উনি এলে তোমাকে হয়ত বিব্রত করে তুলতেন শুধু শুধু।'

'কেন রে ?'

'কী জানি।' বলেই কল্যাণী চুপ করে রইল।

অন্নপূর্ণা তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন : 'কেন রে পাগলি, মায়ের উপর খুব অভিমান হয়েছে বুঝি !'

'তুমি বোঝ না পিসি'—বলতে গিয়ে জল আসে কল্যাণীর চোখে : 'দেখ তো, আজ পাঁচ-ছয় বছর আছি এখানে তোমার সঙ্গে। কৈ একটা খবরও তো পেয়নি আমার। আমি বেঁচে আছি কি নেই ! শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত,—মা'কে আমার যেন কী রকম কী রকম মনে হয়। আর তোমার মুখেই ত শুনেছি, বাবাও সুখ পান নি ওঁর ব্যবহারে।' তারপর একটু থেমে : "বাবা মারা যাবার পর অনেক কিছু, আমি নিজের চোখেই কি আর দেখিনি, ছোট ছিলাম বটে ; তবু বেশ মনে আছে. ঐ যে কোথাকার এক জোয়ার্দার না কে আসত সেখানে আরেকটা লোক সঙ্গে নিয়ে—দুজনেই মদখোর, মাতলামো করত সব সময়, অথচ মায়ের কাছে ওদের কী খাতির ! আমার কিন্তু ভাল লাগত না ও-সব।" এক নিঃশ্বাসে এতটা কথা বলে ফেলে দারুণ দুঃখভরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কল্যাণী।

তার এই অসহায়ত্ব অন্নপূর্ণা মর্মে মর্মে অনুভব করেন, প্রতিবাদেরও কোনো ভাষা খোঁজে পান না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কল্যাণী আরো বলছিল : 'তাছাড়া, দিদিও যেন—'

অন্নপূর্ণা তাকে আর কথা বলতে না দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন দুহাতে। দুঃখ তাঁরও ত কম হয়নি, সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন নিরুপায়ের মত : 'ছিঃ গুরুজনদের নিয়ে এভাবে কথা বলতে নেই, কল্যাণী।'

এ সব পুরনো ঘটনা।

কল্যাণীর বিয়ে হয়ে গেছে—সে অনেক দিন, বড়বোন শিবানীর আগেই হয়েছে পিসির যত্নে ও চেষ্টায়।

এবার শিবানীর বিয়েরজন্যে কোমরবেঁধে নামলেন মাতা বিন্দুবালা নিজে।

'আমাদের অবস্থা ত তুমি দেখতেই পাচ্ছ'—একদিন শিবানীর অসাক্ষাতে দিবাকরকে একা পেয়ে বিন্দুবালা বললেন: 'টাকার অভাবে শিবানীকে এম-এ পড়াতে পারলুম না, আর এই অল্প বয়সে তাকে সেজন্যে চাকরিও করতে হচ্ছে, একটা স্কুল-মাষ্টারি।'

'তা ত আমি জানি মাসীমা।' চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে-দিতে দিবাকর সহানুভূতি দেখান: 'শিবানীর মুখে শুনেছি সব। কিন্তু, আমি কি করতে পারি আপনাদের বলুন তো?'

দিবাকর জানতেন, বিন্দুবালা ওঁদের বাড়িতে যান—মায়ের সঙ্গে খুব ভাব ওঁর। এটা ওটা বিনা দ্বিধায় দিবাকরকে মধ্যস্থ মেনে সাহায্য নেন যখন-তখন। এবারও বোধ হয় সে রকম একটা কিছু বলবেন—দিবাকরের এই ধারণা।

কিন্তু যেই বললেন বিন্দুবালা: 'তোমরা বড়লোকের ছেলে, বলতে সাহস পাইনে। তবু মাঝে-মাঝে ভাবি'—একটু থামলেন: 'শিবানীর এখন বয়স হয়েছে। তোমাদের সাথে তার এত মেলামেশা ঠিক খাপ খায় কি না!' অমনি সহসা দিবাকরের চা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

এমনতর একটা বিশ্রী সমস্যা যে দেখা দিতে পারে দিবাকর কি আর ভেবেছিলেন আগে! তঁ'র মনের ভিতর প্রচণ্ড আলোড়ন এসে পড়ল।

বিন্দুবালা আড়চোখে নীরবে পরখ করলেন সব। তারপর শান্তভাবে বলতে থাকলেন: 'শিবানী তোমায় যথেষ্ট সম্মান করে, ভালবাসে—তা আমি জানি। তোমরাও তাকে অনাদর কর না। কিন্তু আমার যে বাবা কঠিন না হয়ে উপায় নেই! বল, তোমায়ই পরামর্শ চাইছি আমি।'—বিন্দুবালা বড় অসহায়ের মত এগিয়ে এলেন দিবাকরের কাছে: 'আমি শিবানীর অভিভাবক হিসেবে খোলাখুলি-ভাবেই জিজ্ঞেস করছি,—তোমরা বামুন, আমরা কায়েত—এই দুয়ের মধ্যে কি ক্রিয়াকর্ম চলতে পারে স্বচ্ছন্দে?'

দিবাকর নিরুত্তর।

তবু, বিন্দুবালা বলেন: 'আমার কোনো আপত্তি নেই। তুমি যদি বল, তোমার মা'র কাছে আমিই না-হয় কথাটা তুলি। কি বল?' তারপর হঠাৎ দিবাকরের চায়ের বাটির দিকে চেয়ে: 'কৈ, তুমি চা খেলে না যে! ও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বুঝি! বসো, আরেক পেয়ালা এনে দিচ্ছি যেয়ো না।' বলতে বলতে টি-পট্‌টা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বিন্দুবালা।

দিবাকরই নির্জনে তাঁর মায়ের কাছে কথাটা পাড়লেন একদিন।

দিবাকরের মা কুলীন-ব্রাহ্মণ-তনয়া,—পুত্রের কথায় অগ্নিশিখার মত দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, বললেন : 'এই ধিঙ্গি পেতনীর পেটে পেটে এত কুমৎলব! আমি জানিনে বাবা, তোমাদের যা মন চায় তাই করগে যাও। আমাকে ওসব জিজ্ঞেস করতে এসো না। জাত নেই, গোত্র নেই, ধর্ম নেই—কোথাকার এক মেয়েকে এই পরিবারে এনে আমি পরিবারের মুখে চুণকালি মাখাতে পারব না। তাছাড়া মা গো মা, কী সর্বনাশা রূপ নিয়ে যে মেয়েটা ধেঁই ধেঁই করে ঘুরে বেড়ায়—উঃ, যেন একেবারে জ্বলন্ত আগুনের উল্কা! না-না না আমি ওর বিষয় কিচ্ছু পারব না বলতে।'

ব্রহ্মময়ী হাজার হোক, মেয়ে মানুষ। কথাটা গোপন রাখতে পারলেন না,—স্বামীর কানে ঘটনাটা সঙ্গে-সঙ্গেই রং চং মিশিয়ে পরিবেশন করলেন।

এ সব শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে নিস্পৃহের মত সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন শুধু : 'কি বললে?'

'ওমা!' গালে হাত দিলেন ব্রহ্মময়ী : 'এতক্ষণ যে এত বক্‌বক্ করলুম, তা তুমি কিছুই শোননি তাহলে!' একটু থেমে কথাবার্তাটা বাড়াতে চাইলেন যেন : 'আমাদের দিবাকরের বিয়ের কথা বলছিলুম।'

'হুঁম্ তা তো বলছিলে শুনলাম। আমি তার কী করব! ছেলে তোমার লায়েক হয়েছে—বিয়ে করতে চায় করুক গে। আমায় ঘাটাচ্ছ কেন?'

'আহা, কী যে বল! যত বয়স বাড়ছে ভীমরতিতে পাচ্ছে দেখছি। যেখানে-সেখানে তোমার ছেলে বিয়ে করবে? ঘোষ বংশের মেয়ে, কায়েতের মেয়ে—সেখানে কী করে সে—'

'ব্যস্ ব্যস্'—আর বেশি কথা না বলতে দিয়ে রঘুনাথ উঠে বসলেন এবার, বললেন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে : 'তাহলে এ নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছো কেন শুনি?'

'বা রে বাঃ! মাথা থাকলেই মাথা ঘামাতে হয়। একটা নামকরা ডাক্তারের ভাইঝি যে, তাছাড়া কত বিদ্যাবুদ্ধি! আর কী সুন্দর দেখতে!'

'বাহবা বাঃ বেশ! তুমি ত দেখছি জলেও আছ ডাঙ্গায়ও আছ।' বলতে গিয়ে কৃত্রিম হাসি হাসলেন রঘুনাথ। তারপর সহসা গম্ভীর হয়ে একটু রূঢ় ভাবেই বললেন : 'শোন, এসব ছেলেমানুষি ছাড। দিবাকে জানিয়ে দাও, ব্রাহ্মণ কুলে যে ওর জন্ম একথা যেন সে ভুলে না যায়। আর,—ওরা যে-স্পিডে পা ফেলে চলেছে আমাদের সেখানে খাপ খায় না—এ কথাটা ওকে ভালকরে বুঝিয়ে বল। আশাকরি দিবাকর তা বুঝবে।'

'হ্যাঁ তা ঠিক বলেছ।' কথার মাঝখানে ব্রহ্মময়ী ফোড়ন দিলেন: 'ওর গায়ে আমার বাপের বাড়ির রক্ত আছে ত নিশ্চয়ই বুঝবে, বুঝবে না কেন? কিন্তু'—টেনে টেনে বলতে থাকেন ব্রহ্মময়ী: 'ঐ ধিঙ্গি মেয়েটাই বা কী অসম্ভব রকমের ডাইনী—দেখ দিকিন।'

মেয়ের নাম শুনে মনটা ঈষৎ ভিজে উঠল রঘুনাথের, নরম গলায় বোঝালেন: 'হ্যাঁ পার ত শিবানীকে বারণ করে দিও—এ বাড়িতে ঘন ঘন আসতে।'

দিবাকর সব শুনলেন।

পায়ের তলা থেকে যেন মাটিটা সরে গেল তাঁর। ভবিষ্যতে শিবানীর বিচ্ছেদ কল্পনায় অসহ্য মনে হল। বিন্দুবালার ইচ্ছাটাকেই শিবানীর নিজস্ব অভিমত বলে সরল ভাবে গ্রহণ করেছিলেন সেজন্য অন্তর্জ্বালা বৃদ্ধি পেল আরো। কারুকে কিছু না জানিয়ে কোন একফাঁকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন তিনি। যৌবনের প্রথম আবেগ—এ যে কত নির্ভেজাল, নিষ্কলুষচিত্ত বিনে তা বোঝে সাধ্য কার? দ্বিপ্রহর অতীত হল, অপরাহ্ণ গেল—তবু বাড়ি ফিরলেন না।

পরদিন সকালেও যখন দিবাকরের সাক্ষাৎ মিলল না তখন রীতিমত একটা বিষাদের ছায়া পড়ে গেছে মুখার্জি বাড়িতে। ছোট ভাইরা সম্ভবপর জায়গায় খবর আনতে গিয়ে মুখ কাল করে ফিরে-ফিরে আসছে। দারুণ উদ্বিগ্ন ভাবে কাটালেন সবাই দু-তিনটা দিন। তারপর কী সূত্রে যেন জানা গেল, দিবাকর নাকি রেঙ্গুন চলে গেছেন আর চিঠি রেখে গেছেন একখানা।

এবার ব্রহ্মময়ী শয্যা নিলেন। চিঠিখানা পড়ে কাঁদতে-কাঁদতে স্বামীকে বললেন: 'আমার এমন উপযুক্ত বড় ছেলেটা না-খেয়ে না-বলে বাড়ি ছেড়ে রাগ করে চলে যায়, তুমি ওর বিয়েতে মত দাওনি বলেই ত।'

স্ত্রীলোকের এমন মিথ্যা অনুযোগের বিরুদ্ধে তর্ক করে কোনো সুবিধা হবে না রঘুনাথ তা জানতেন। কাজেই ব্রহ্মময়ীর কথার কোন উত্তরই দিলেন না তিনি। শুধু ভাবলেন, দিবাকরকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়েছি—সে সুবিবেচক; সৎ, ভাল ছেলে বলে সবার মুখেই তার উচ্ছসিত প্রশংসা। কৈ, মা বাপের ত অবাধ্য হয়নি দিবাকর কোনোদিনই—তাহলে কেন, কেন এমন কাজ করল সে! এই কেন-র জবাব, নিয়তিকে এড়িয়ে পাবেন কোথায় তিনি! সংসারের কেউই ত পায় নি। অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন রঘুনাথ। ক্রমশ চিন্তাস্রোত প্রশান্ত হল: যাকৃগে, মেয়েকে ত আর বিয়ে দিচ্ছিনে যে কুল, মান, বংশ দেখে দেব। ছেলের বিয়ে, হোকগে না কায়েতের মেয়ের সাথে তাতে আর কি? রাজা শান্তনুও বিয়ে করেছিলেন এক জেলের মেয়েকে। তাছাড়া এ-মেয়েটি ত কলকাতা শহরের

সেরা ডাক্তার প্রিয়ব্রত ঘোষের ভাইঝি। এমনিতর বিচিত্র যুক্তিতে নিজেকে প্রবোধ দিতে গিয়ে যেই তাঁর মনে পড়ল যে, দিবাকর জ্ঞান হবার পর ত কখনও কিছু চায়নি, তাহলে পূর্ণ হোকই না তার এই একটা নূতন অভিলাষ,—তাছাড়া কে জানে, রাগে দুঃখে যদি বা সে আবার সেই মুলুকেই একটি বার্মিজ মেয়ে বিয়ে করে বসে—তাহলে? কারণ এই ধরনের ব্যাপার ত হামেশাই শোনা যায়। এটা মনে হতেই এক প্রচণ্ড দুর্বলতা সজোরে আঁকড়ে ধরলো রঘুনাথকে। তিনি আর কোনো যুক্তিরই ধার ধারলেন না, কারুকে কিচ্ছুটি জিজ্ঞেস করলেন না; তৎক্ষণাৎ স্নেহান্ধ পিতাদের মত কাজ করতে প্রবৃত্ত হলেন, অর্থাৎ দিবাকরের অভিলাষানুযায়ী বিন্দুবালাঘোষের কন্যা শিবানীকে পুত্রবধূ করা হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেঙ্গুনে দিবাকরের ঠিকানা সংগ্রহ করে একখানা তার অবিলম্বে পাঠিয়ে দিলেন এবং পরে, আসতে যদি অহেতুক দেরি ঘটে যায় সেই আশংকায় যথোচিত পথ খরচও ঐ সঙ্গে দিয়ে দিতে রঘুনাথ ভুললেন না।

পরিতৃপ্ত হল, শান্ত হল বিন্দুবালার মন।

তাঁর ভিতরে এক অদম্য আক্রোশ ছিল। তিনি ভুলতে পারতেন না কিছুতেই,—বাপ ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন পুণ্যব্রতকে কিসের জোরে! কোন যুক্তিই বা ছিল সেখানে? তারপর, স্ত্রী বিন্দুবালা হলেন অনাদৃত, উপেক্ষিতা। রূপ গুণের কি অভাব ছিল তাঁর? ছাই চাপা আগুনের মত জ্বলে উঠত সে সব কথা। উঃ, মানুষ হয়ে মানুষকে এত অপমান এত ঘৃণা—কেন? কেন এই জাত বৈষম্য! কারাই বা এর স্রষ্টা? এই বুঝি হিন্দুসমাজের বন্ধন, এরই নাম শৃঙ্খলা? তাহলে বিয়েব নামে একটা প্রহসন করবার তাঁর কীই বা প্রয়োজন ছিল? অদৃশ্য আগুন জ্বলত তাঁর বুকের ভিতর, জ্বলত ঐ জাত্যভিমানীদের বিরুদ্ধে। ...হ্যাঁ শিবানির প্রতি দিবাকরের আসক্তিতে তিনি খুশি হয়ে উঠেছিলেন খুবই। কেননা, হিন্দুদের শ্রেষ্ঠবর্ণ নাকি ব্রাহ্মণ—এই ব্রাহ্মণের ছেলেকেই যে রকম করে হোক টেনে এনে মিশিয়ে দিতে হবে তাঁর এক পংক্তিতে —তবে যদি তাঁর গায়ের জ্বালা মেটে—এই ছিল তাঁর সংকল্প। ...তাই হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই মেয়েকে যন্ত্র সাজিয়েছিলেন তিনি। ...শিবানী প্রথমে কিছুটা ইতস্ততঃ করলেও পরে অনেক বুঝে-সুঝে কোন আপত্তি করল না।

বিন্দুবালারই উদ্যোগে সে বিয়ে করল দিবাকরকে।

বিয়ের পর শিবানীকে আর স্কুলে গিয়ে চাকরি করতে দিলেন না রঘুনাথ।

এতদিন তালতলা জগদ্ধাত্রী বিদ্যাপীঠের শিক্ষয়িত্রী ছিল সে।

শিবানী বিদুষী পুত্রবধূ।

এই মুখার্জি বাড়িতে মেয়েরা কেউ বি-এ পাশ ত দূরের কথা—স্কুল কলেজেই পড়েননি। কাজেই শিবানীর মধ্যে কি আর স্যুপিরিয়রিটি কন্‌প্লেক্‌স্ ছিল না কিছুটা! বিশেষত শ্বশুরমশাই তার যতই বয়োজ্যেষ্ঠ হোন না কেন, তিনি যে এমন একটা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বসলেন যার পেছনে কোনো জোরালো যুক্তি নেই—এটাই বা শিবানীর লেখা-পড়া জানা গর্বিত মন বরদাস্ত করে কি করে! ...বাইরে কিছু প্রতিবাদ করল না বটে, কিন্তু এই মুখার্জি বাড়ির বিরুদ্ধে মনের ভিতর একটা নৈতিক বিপ্লবের অদৃশ্য বীজাঙ্কুর সযত্নে অঙ্কুরিত হয়ে রইল তার।

চুপ করল শিবানী। নিস্পৃহের মত সে দিন কাটায়।

দিবাকরের কাছে তা যেন কেমন-কেমন ঠেকে। তিনি তাই জিজ্ঞেস করেন: "কি হয়েছে তোমার?"

'কৈ? কিছু না ত!' শিবানী ধরা দেয় না, কিন্তু তার মুখের কৃত্রিম হাসিটা দিবাকর টের পান। এ যে আরো অস্বস্তিকর। ...স্ত্রীকে যত্ন করে মোটর ড্রাইভিং শেখালেন তিনি। ছোট্ট গাড়ি কিনলেন একটা শিবানীর জন্যে।

শিবানীর মুখে হাসি ফুটল। দিবাকরও সন্তুষ্ট।

এবার গাড়ি চালাবার লাইসেন্স নিয়ে শিবানী অবাধ পরিভ্রমণ শুরু করলে যত্র তত্র। প্রথমে শাশুড়ীকে নিয়ে ঘুরিয়ে আনলে গড়েরমাঠ, চৌরঙ্গী, গঙ্গার পাড়—সেই দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। ...তিনি খুশির আতিশয্যে রঘুনাথের নিকট গল্প করলেন: দেখ, লেখাপড়া জানা মেয়েদের ধাচই আলাদা। হুঁম্, তুমি না আবার মেয়েদের স্বাধীনতা পছন্দ কর না!

মুখটিপে একটু হাসলেন রঘুনাথ। তারপর সহসা একেবারে গম্ভীর, —আর কিছু বললেন না। তাঁর বুকের ভিতর এক অজানা আশংকার ঝড় বইতে লাগল।

কারণ,...

শিবানী সেদিন যখন প্রতিবাদ না-করেই তালতলা জগদ্ধাত্রী-বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষের নিকট একখানা ইস্তাফাপত্র পাঠিয়ে দিয়ে শ্বশুর রঘুনাথের কাছে এসে বলেছিল: বাবা স্কুলে রিজিগনেশন্‌লেটার পাঠিয়ে দিলুম, —তখন রঘুনাথ আনন্দে এত বিহ্বল হয়েছিলেন যে ক্ষণকাল তাঁর মুখে কোনো কথা জুটেনি। অবশেষে শিবানীর চিবুক ধরে স্নেহমধুর হাস্যে বলেছিলেন: বেশ

করেছ মা, বেশ করেছ। আমি জানতেম, তুমি তাই করবে।

রঘুনাথের বিশ্বাস আর সরল অভিমত পেয়ে শিবানী ত অপ্রস্তুত।

কী আশ্চর্য! এ কী হল তার!

মন্ত্রাহতের মত মাথা নীচু করে আছে। মুখে কোন কথা নেই যে!

এদিকে আবার তার পানে চেয়ে চেয়ে দুচোখের পলক পড়ে না রঘুনাথ মুখার্জির—যেন নূতন করে দেখছেন তাঁর স্নেহের পুত্রবধুকে! কোনদিন ত আর ভাল করে তাকাননি। …এতো রূপও কি মানুষের দেহে সম্ভব!

'এখানে সরে এসো ত মা, একটু।'

রঘুনাথের সুগভীর কণ্ঠস্বরে শিবানী যেন সংবিৎ ফিরে পেল, সসংকোচে এগিয়ে বসল কিছুটা।

'দেখি আমার দিকে তাকাও ত এবার।' খুব মোলায়েম করে বললেন রঘুনাথ। তারপর ডাইনে বাঁয়ে নানাদিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি শিবানীকে পর্যবেক্ষণ করলেন অনেকক্ষণ। দেখলেন, সব রকমেই শিবানী ভারী সুলক্ষণা। বললেনও: 'তোমার শিবানী নাম সার্থক! তুমি লক্ষ্মী, পরম ভাগ্যবতী!' সঙ্গেসঙ্গেই একটা করুণ নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর,—থেমে গেলেন রঘুনাথ। আর কিছু পারলেন না বলতে। বিধাতার চক্রান্তের প্রতি তাঁর মনের বিশ্বাস গভীর হয়ে উঠল।

রঘুনাথবাবু অবসর সময়ে ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি চর্চা করতেন এবং মানুষের মুখের গঠন দেখে তা অনুশীলন করার শখ তাঁর মাঝেমাঝে হত। এতে তিনি কদাচিৎ অকৃতকার্য হতেন। —সেদিন শিবানীর চেহারা দেখে তিনি যেমন আনন্দে পুলকিত হয়েছিলেন তেমনি অজানা নিরানন্দেও তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। রাত্রে স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর নিকট কথাচ্ছলে এসংবাদটাও তিনি অতি সংগোপনে না দিয়ে পারলেন না যে, তাঁদের আদরের পুত্রবধু শিবানীর জীবনে আত্মকেন্দ্রিকতা ও একরোখামির প্রভাব অলঙ্ঘনীয়। —এই কথা শুনে সেদিন ব্রহ্মময়ী নীরবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দুঃখ আর অনুশোচনায় প্রায় সমস্ত রাত্রিই অসহায়ের মত অশ্রুপাত করেছিলেন শুধু।

আজ আর তাঁর সে কথা মনে নেই।

পুত্রবধুর মোটর ড্রাইভিঙ্গে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় স্বামীর কর্ণে বাণী বর্ষন করলেন, টেনে টেনে স্বর দিয়ে বললেন: 'তুমি না মেয়েদের স্বাধীনতা পছন্দ কর না!'

…দেখতে দেখতে বৎসর গড়িয়ে চলল শিবানীর, এই মুখার্জি পরিবারের

মাঝখানে। দিবাকর এখন এম-এ পাশ করে পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশোনা করছেন। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাযত্নে শিবানীরও বেশ সুখ্যাতি। অন্ততঃ সে যে নিজেকে এই পরিবারে খাপ খাইয়ে নিয়েছে কী সুন্দর—এ কথা বাইরের সকলেই স্বীকার করেন।

তবু শিবানীর মনে, এক বদ্ধধারণা যে, বাড়িরভিতরে নিরালায় বসে-বসে কাজকর্মে কোনো কৃতিত্ব আছে নাকি আবার! বহির্মহলে গিয়ে পুরুষদের সমান অধিকার দাবী করা চাই। পুরুষরা যা করে, মেয়েদেরও তাই করতে হবে। এই করে পশ্চিম যে কত এগিয়ে গেল, আমরা শুধু পিছনে পড়ে আছি। শিবানীর প্রশ্ন : কেন পারব না ওদের সঙ্গে পাল্লাদিয়ে চলতে? কিন্তু প্রগতি-শীলাদের সঙ্গে এহেন তর্কের নিষ্পত্তি কোথায়? বাইরের কারো এ-সব জানবার কথা নয়। জানতেন শুধু দিবাকর ;—আর বুঝেছিলেন অনেকটা রঘুনাথ।

শিবানী বাহ্যতঃ স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছিল বটে, কিন্তু ঘরেতে মন না বসলে এর সার্থকতাই বা কি! গাড়ি নিয়ে সময়ে-অসময়ে এখানে সেখানে নানা জনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত সে। সম্ভ্রান্ত ঘরের বধু, শিক্ষিতা, সর্বোপরি আধুনিকতর নূতন হাওয়া বইতে শুরু করেছে যখন—কেউ সেজন্য কিছু বলত না. বলতে সাহসও পেত না। কাজেই, একদিন রঘুনাথবাবুর আদেশ শিরোধার্য করে শিবানী যে বাধ্যতার স্বীকৃতি জানিয়েছিল—এখন কালের ঘূর্ণিচক্রে নিষ্পেষিত হয়ে তার গুরুত্বের কিংবা মাধুর্যের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই।

প্রকারান্তরে শিবানী যোগাড় করল ফের একটা স্কুলের কাজ।

সেই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস নিজে এসে রঘুনাথকে অনুরোধ করলেন। স্কুলটি বাড়ি থেকে দূরে, আলিপুর অঞ্চলে। তাহোক্—রঘুনাথের পূর্বমতের আর কোনো বালাই ছিল না। বস্তুত শিবানীর প্রতি নানা কারণে তিনি তখন উদাসীন।

নম্রতা দিয়ে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠর আধিপত্য স্বীকার করতে শিবানী অনভ্যস্ত। তাই,—সেই অনভ্যস্তেরই তাড়নায় গেল সে দিবাকরের কাছে, নবাগতা হেডমিস্ট্রেসের অনুরোধটাও পেশ করল তখন।

দিবাকর বুঝলেন. লাভ কি বাধা দিয়ে? বললেন: 'স্কুলে কাজ করতে পার আপত্তি নেই,—তবে এই বাড়িতে থেকে তোমার তা করা চলবে না। বাবার ইচ্ছার অমর্যাদা হবে।' —দস্তরমত কঠিন হলেন দিবাকর।

'তাহলে?' জিজ্ঞেস করে শিবানী।

শিবানীকে নিজের দায়িত্বেই ত এনেছিলেন দিবাকর—সেজন্যে কি ভুলের মাশুল দিতে হবে না! তাই একটু চিন্তাকরে দিবাকর শান্তগলায় জবাব

দেন : 'তোমাকে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে থাকবে।'

শিবানী খুশি হল, কারণ, মামুলী রিস্ট্রিক্‌শন্ থেকে ত মুক্তি পাবে।

দিবাকরও ভাবলেন, শিবানীর চরিত্রে পাশ্চাত্য-সভ্যতার বিকৃতঅভিব্যক্তি তাঁদের মুখার্জিবাড়িতে কিছুতেই খাপ খাবে না—পরন্তু এই পরিবারের ঐতিহ্যকে নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত করে তুলবে। তার চেয়ে যাক্ বাইরেই স্বতন্ত্র বাড়ি ঠিক করে দেওয়া যাবে—সেখানেই থাকুক শিবানী। কে জানে তাতে যদিবা পরিবর্তন আসে কিছু। মনে-মনে পরিতৃপ্তও হলেন খুব, যে, ভুলটা সহজে তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছেন এই ভেবে।

কিন্তু ব্রহ্মময়ী কি তা মানবেন?

তাঁকে কি বলে বোঝাবেন, ইতস্ততঃ করতে লাগলেন দিবাকর।

এরই মধ্যে, —বিন্দুবালার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বলে একদিন সংবাদ এল। ডাক্তার তাঁকে স্থান পরিবর্তনের উপদেশ দিয়েছেন। তা শুনে দিবাকর তাঁকে দার্জিলিঙ্গ শহরে ডাক্তার সুরঞ্জন দাসের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

সঙ্গে যাবে শিবানী।

দিবাকরকে আড়ালে শাসালেন ব্রহ্মময়ী : 'বাড়ির বৌ যেখানে-সেখানে যাবে একলা! তুই বলিস কি, দিবা!'

'একলা নয় মা।' দিবাকর বোঝান : 'ওর মার সঙ্গেই যাচ্ছে। আর তুমিও এসব দিকে নজর দিয়ে কেন মনে দুঃখ টেনে আনছ, বল দিকিন!'

সুরঞ্জনকে দেখেছিলেন ব্রহ্মময়ী। শিবানীর কোন এক দূর সম্পর্কের ভাই নাকি। বিয়ের সময় হঠাৎ এসেছিল কলকাতায়। তখন একটা অস্পষ্ট বিশ্রী কদর্য ইঙ্গিতও উঠেছিল মেয়েদের মহলে। ব্রহ্মময়ী নিরুপায়ের মত চুপ করে ছিলেন। ফলতঃ ওর সঙ্গে শিবানীর বেশি মাখামাখিটা তিনি তেমন সুনজরে নিতে পারেন নি। তাই আজ না বলে পারলেন না : 'কী জানি বাবা, আমার ভাল ঠেকছে না ওসব।'

দিবাকরেরও কি আর ভাল লাগে! কিন্তু তাঁর মন বলল, এই সুযোগে ঔদার্য না দেখালে ভবিষ্যতে তাঁদের হয়ত অপদস্থ হতে হবে আরো। কাজেই এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে আপাততঃ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না তিনি।

সুরঞ্জনের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছিলেন ব্রহ্মময়ী, তবু ক্ষণেক থেমে আবার গায়েপড়ে বললেন : 'তা তোমার বাবাকে জানিয়ে দেখ, তিনি কি বলেন। আমি মুখ্যসুখ্য সেকেলে মানুষ। মনে সন্দেহ হল, তাই খোলাখুলি বলে ফেললুম।'

রঘুনাথের সঙ্গে দিবাকরের পরামর্শ আগেই হয়ে গেছে। তিনি আর আপত্তি করবেন কেন? এমন কি এসব ব্যাপারে কোনো খোঁজখবর নেবারই ইচ্ছা হল না তাঁর। একটু পিছনের দিকে তাকালেন রঘুনাথ:

কোথা থেকে জানি খবর জেনে এসে একটা পুরনো কাপড়ের মিল্ কিনবার বায়না ধরেছিল শিবানী। দিবাকর বলেছিলেন: বাবাকে জিগ্যেস করে দেখি।

'না, না—ওঁকে জানাবার দরকার কি!' বাধা দিয়ে যুক্তি দেখিয়েছিল শিবানী: 'তাহলে, আবার তোমার অন্য চার ভাইয়েরও মতামত নিতে হবে।'

'তা হলই বা!'

অভিমান হল শিবানীর। শিবানী তখন নূতন বধূ।

দিবাকর হাসলেন। তাঁর একটি হাত তখন শিবানীর কোমল মুঠির ভিতর, সেখানে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন: 'বাবাকে যদি না জানাই, আর আমি এ মিল্টা কিনে নিই—তাহলেও ত ভাইদের অংশ থাকবে এর মধ্যে।' একটুখানি সোহাগ ঢেলে বোঝাতে চাইলেন আরো: 'তখন, ওরা ভালমন্দ একটা কিছু হলে আমাকেই ত বলবে।'

'তুমি বোঝ না কিচ্ছু।' বলতে বলতে শিবানীও তেমনি ঘনিষ্ঠ হল আরেকটু—দিবাকরের কাঁধে মাথা রাখলে: 'আমার কথা শুনবে?'

'বল।'

'আমার নামে কিনে রেখে দাও এখন—দেখবে, কেউ কিচ্ছুটি বলবে না।' শিবানীর এই পরামর্শে দিবাকরের মনের ঘনিষ্ঠতা সহসা শিথিল হল। এমনতর আরেকটি ঘটনা তাঁর মনকে নাড়া দিলে—তাই চুপ করে গেলেন তিনি।

'ও'—শিবানী ঠোঁট বাঁকালো: 'তোমাদের সম্পত্তি আমি খেয়ে ফেলব—এই ভয়? সেই কথাটাই স্পষ্ট করে বল না কেন?'

তবু দিবাকর কিছু বললেন না দেখে সে রাগের চোটে, দূরে সরে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল: 'তোমার যদি এ বাড়িতে কোনো ব্যক্তিত্ব কোনো রকমের নিজস্ব সত্ত্বা না-থাকে তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন? আমার একটা সামান্য কথা রাখতে পার না তুমি, দশজনকে তোমার জিজ্ঞেস করে চলতে হয়। কেন, আমার কি কোনো prestige নেই এ বাড়িতে?'

এ সব কথা মোটেই পছন্দ হল না দিবাকরের। মেয়েদের প্রেস্টিজ্ নিয়ে বক্তৃতা দেবার দুঃসাহস তিনি রাখেন না, অন্ততঃ শিবানীর সামান্য সহচরত্বে এই জ্ঞান-লাভ তাঁর যথেষ্ট হয়েছে। তিনি নিরুত্তরে অন্য কাজে মন দিলেন।

শিবানীও টের পেল, এইভাবে দিবাকরকে দিয়ে কাজ করানো শক্ত।

সুযোগ বুঝে কথাটা পরে সে ব্রহ্মময়ীর কানেও তুলল একবার। অবশ্যি ভণিতা করে বললে: 'আপনার ছেলের ভালর জন্যই বলেছিলাম,—ভবিষ্যৎও ত একটা আছে ওঁর।'

ব্রহ্মময়ী তাই বিশ্বাস করলেন। সব কথা এসে জানালেন স্বামীকে।

রঘুনাথ অনেকক্ষণ চুপ। তাঁর আশংকার ভিত এবার তাহলে পাকা হয়ে উঠল,—পরিবারের মধ্যে ভাঙনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট দেখলেন তিনি। কিন্তু ব্রহ্মময়ীকে এ সব বোঝানো বৃথা;—তাঁকে শুধু বললেন: 'একমাত্র সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য যতটুকু আবশ্যক তার বেশি বৈষয়িক নানা রকমের কুটিল আলোচনা মেয়েদের অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের সাথে করতে নেই,—আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ তা করেন নি।'—থামলেন রঘুনাথ।

'তাহলে উপায়?'—হতাশ হলেন ব্রহ্মময়ী।

রঘুনাথ নীরব।

'কই'—রঘুনাথের পায়ের উপর ঈষৎ নাড়া দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন ব্রহ্মময়ী: 'কিছু বলছ না কেন?'

'বিধাতার সংসারে যার যা কাজ ভাগ করা আছে—সে যদি তা না করে, সেখানে তখন বিশৃঙ্খলা আসেই আসে। তখন নীরবে তা দেখতে হয়, সইতে হয়—এ ছাড়া কিছু করার উপায় নেই আমাদের।'

'ও সব ত গভীর তত্ত্ব-কথা,—আমি তা শুনতে চাইনে!'

'তাহলে তুমিই বল, কী করা যেতে পারে!'—রঘুনাথ আরো বেশি গম্ভীর হলেন, বললেন: 'তত্ত্ব-কথা শুনতে চাও না তাহলে কী চাও—আবোল-তাবোল তর্ক করবে আমার সঙ্গে?'

'যাও'—এবার বিরক্ত হলেন ব্রহ্মময়ী, দুচোখ তাঁর ক্রমশঃ জলে ভরে এলো: 'আমি কি কোনো কালে তর্ক করেছি তোমার সঙ্গে! এ সব কি মেয়েদের কাজ নাকি? সব কিছুতেই তোমার তামাসা—ভাল লাগে না আর।' ক্ষণকাল থেমে সহজ কণ্ঠে আবার বলেন: 'আমি দিবাকরকে চিনি—ঐ রকমের ছেলেই নয় সে, যে, ভাইদের বাদ দিয়ে আলাদা কিছু করবে। আমি তাকে জিগ্যেসও করেছিলুম,—বললে, বউমা নাকি কান্নাকাটি করছে ঐ মিলটা কিনে নেবার জন্যে। কিন্তু, আমি বলি—বৌমা-ই বা কী ধরনের মেয়ে বল তো? আমি যেন বুঝতেই পারছি না।' বলতে বলতে ব্রহ্মময়ী জিদ ধরলেন: 'দেখব আমিও, কী রকমের বাপের মেয়ে সে। আর কেন,

কেনই বা সে আমার ঘর ভাঙাতে চায়।'

আর কিছু না বুঝলেও ব্রহ্মময়ী এটা ঠিকই বুঝেছিলেন যে, শিবানী তাঁর সাজানো সংসারে কোনো এক নূতন বিপর্যয় নিয়ে আসছে। স্থির করলেন, তিনি তা রোধ করবেনই – করবেন।

প্রবল এক উত্তেজনায় বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ব্রহ্মময়ী।

'দোহাই তোমায়'—বাধা দিলেন রঘুনাথ: 'তুমি আর ঝগড়াঝাঁটি করতে যেও না এ নিয়ে। তাহলে নিজেই ছোট হবে ওর কাছে।'

এই পর্যন্ত বলে রঘুনাথ মনে মনে ভাবলেন, তুমিই বা কী ধরনের তাও কি আর বুঝতে পারলুম আজ পর্যন্ত! তোমাদের সম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মাই ত কিছু জানেন না শুনেছি। বড় হাসি পেল তাঁর। এসব নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতেও প্রবৃত্তিতে বাধল। যদিও এই সুযোগে স্ত্রীকে ভালোকরেই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারতেন তিনি: এই ত মেয়েদের স্বাধীনতার পরিণতি; কেবল পাশকরা লেখাপড়া জানা মেয়েই দেখেছিলে—দেখনি ত কখনো, দেখতেও চাওনি—কোন রক্তস্রোত বইছে তার দেহের শিরায় শিরায়; কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর মনে পড়ল, এ বিষয় নিয়ে কথা তুললে এতে শুধু বিরোধই বাড়বে, নষ্ট হবে নিজের পারিবারিক শান্তি—সুফল হয়ত কিছুই হবে না।

এ ভাবে চিন্তা করার কারণও ছিল রঘুনাথের।

দিবাকরের বিয়ের পরই—তাঁকে সঙ্গে করে দক্ষিণকলকাতায় ঢাকুরিয়া লেকের কাছে একটা জমি দেখতে গিয়েছিলেন তিনি,—পছন্দ হয়েছিল খুব। নানা দিক বিবেচনা করে দিবাকরকে বলেছিলেন: 'তোর নামেই বায়না কর।' কিন্তু রেজিস্ট্রেশন হল জমি শিবানীর নামে। তা দেখে রঘুনাথ অবাক হলেন, ডাকালেন দিবাকরকে।

দিবাকর স্তম্ভিত—কী বলবেন! তিনি যে কিছুই জানেন না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেরেস্তার মুহুরীকে গোপনে ভুল পরামর্শ দিয়ে বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ নিজেই এ সব করিয়েছেন।

ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা দিবাকরের।

এখন যদি বাইরে এ সব কথা প্রকাশ পায় তাহলে?

রঘুনাথ বুঝেছিলেন সমস্তই। তিনি পুত্র দিবাকরকে কখনও অবিশ্বাস করতেন না, সেদিনও করেন নি। তবে, শিবানীকে এই সূত্রে তিনি চিনেছিলেন আরো বেশি করে। এ ধরনের মেয়ে পোষ মানতে চায় না,

এরা ব্যক্তিগত সুখবিলাসে বাধা পেলে ঘর ছেড়ে পালায়,—আবার জোর করে আটকে রাখলে সেই ঘর ছারখার করে দেয়—এর জাতই আলাদা। তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে দিবাকরকে উপদেশ দিয়ে ব্যাপারটা এখানেই নিজেদের মধ্যে চেপে দিয়েছিলেন রঘুনাথ।

কাজেই শিবানী আর এসব জানবে কী করে!

ব্রহ্মময়ী পর্যন্ত জানতেন না কিছু। দিবাকর আর রঘুনাথের মধ্যেই একটা বোঝাপড়া হয়েছিল।

আজ শিবানী দিবাকরকে ছেড়ে সোজা শাশুড়ীর কাছে গিয়ে আবদার ধরেছিল, হয়তো ভেবেছিল: মিলটা কেনার মত করাতে পারলেই শেষে না হয় ঐ জমি রেজিস্ট্রী করার মতনই কোন এক কৌশলে এও নিজের নামে করিয়ে নেবে আর কি!

কিন্তু, একটা হয়েছিল বলেই যে আরেকটাও সহজে হয়ে যাবে এমন ত কোনো কথা নেই। পিতাপুত্র একদিকে দাঁড়ালেন, গোপনে আলোচনাও হল।

ভেস্তে গেল এ যাত্রা শিবানীর মিল কেনার আবদার।

ব্রহ্মময়ী বললেন: 'বেশ হয়েছে।'

এই ভাবে আরো কত কিছু যে ঘটেছিল তাঁদের পরিবারে এই শিবানীকে নিয়েই—সে সব আর ব্রহ্মময়ীর ভাল করে মনে নেই।

তবে হ্যাঁ,—বিন্দুবালাকে দার্জিলিং রেখে শিবানী তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছিল কলকাতায়। সেই যে আলিপুর কোন এক স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস এসেছিলেন—সেখানের কাজটা সে এ্যাক্‌সেপ্ট্ করেছে, এখন join করতে হবে ত! তাই দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে শিবানী বহু সুযুক্তি দিয়ে ব্রহ্মময়ীকে বুঝিয়েছিল, এমনি ত বাড়িতে বসে-বসে সময় নষ্ট করছে—এখন যদি লেখাপড়া নিয়ে তা মেয়েদের মধ্যে শেখাবার চেষ্টা করে—সে কাজ ত খারাপ নয় কিছু। তার উপর এমনতর কাজ যে কত সম্মানজনক, তার নজিরও দেখিয়েছিল অগুনতি।

ব্রহ্মময়ী অবোধ নন। কিন্তু তবু বিদ্রোহ করলেন তিনি। রঘুনাথের কথাটা তাহলে শিবানী রাখল না। শিবানীকে কিছু বললেন না, তিরস্কার করলেন দিবাকরকে খুব।

'সেজন্যই ত আলাদা থাকার ব্যবস্থা করলাম ওর।' জবাব দিলেন শান্তকণ্ঠে দিবাকর, বুঝিয়ে বললেন আরো, যে, তিনি নিজেও সেই ভাড়াটে বাড়িতে রাত্রিযাপন করবেন শিবানীর সঙ্গে,—তাহলে আর ব্যাপারটা লোক-

চোখে অশোভন হবে না কিছু। এমন ত আজকাল কত হচ্ছে হামেশাই।

স্নেহের কাছে যুক্তিতর্ক বড় দুর্বল।

'কী, কী বললি তুই দিবা?' রাগে দুঃখে ব্রহ্মময়ীর ভ্রূযুগল কুঁচকে উঠল, তিনি কেঁদে ফেললেন প্রায়: 'আমায় ছেড়ে আলাদা হয়ে যাবি? পারবি, পারবি তুই এ কাজ করতে?' আর সহ্য করতে পারেননি ব্রহ্মময়ী।

উঃ মনে পড়ে,...

কী তীব্র উত্তেজনা নিয়েই না সেদিন সোজা এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি স্বামীর সামনে: 'আমি আমার দিবাকরকে আবার বিয়ে দেওয়াব।'

'কেন!' হেসে ফেলেছিলেন রঘুনাথ, বলেছিলেন: 'মেয়েদের স্বাধীনতার উপর হঠাৎ এত বিরূপ হয়ে উঠলে যে!'

'বুড়ো বয়সে আর ঢং কর না আমার সাথে।' অনুনয় করে বলেছিলেন ব্রহ্মময়ী: 'তোমার পায়ে পড়ি—দোহাই তোমার, তুমি এ ছেলের আরেকটি বিয়ে দাও।'

রঘুনাথ তারপর স্নিগ্ধশান্তকণ্ঠে ব্রহ্মময়ীকে বুঝিয়েছিলেন অনেকক্ষণ: 'কুলীনের ঘরে এ-কাজ চলে বটে; কিন্তু দিন-কে-দিন যে-হাওয়া বইছে তা বিশেষ সুবিধের নয়। একটা সামঞ্জস্য বজায় রেখে না চললে উপায় নেই। তাছাড়া সংসারটা কত জটিল, দেখতেই ত পাচ্ছ। উতলা হয়ো না, শান্তমনে ভেবে দেখো—দিবাকর যা ব্যবস্থা করে দিয়েছে তা খারাপ নয়।' থামলেন একটু, ভাবলেন, বলবেন কি না, বৌমার স্বরূপ ইতোমধ্যে যা প্রকাশ পেয়েছে, এখন আবার ছেলের বিয়ে দিলে সেখানে নির্ঘাত ঘৃতাহুতি পড়বে, তখন সে কলংক ঢাকবার কোনো পথই থাকবে না আর। কিন্তু তা সরাসরি না বলে একটু ঘুরিয়ে বললেন: 'জোর করে কোনো কিছুই করতে নেই, তাতে বিরোধ দ্বন্দ্বের শেষ হয় না কখনও। আর বস্তুত, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘরের শান্তি নষ্ট করেই বা আমাদের লাভ কি! বরঞ্চ, পার তো দিবাকরকে এই শিক্ষাই দাও—আহূতা নারী তার বংশে লাঞ্ছিতা, অনাদৃতা—এ অপবাদ যেন ঈশ্বরও তাকে না দেন।'

এ সব কথা পর পর মনে হতেই—

ব্রহ্মময়ীর চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে এল।

খোলা গীতাখানা তাঁর সামনেই পড়ে আছে।

মন আর তাতে দিতে পারছেন কোথায়! ঘুরে ফিরে কেবলই মনে পড়ছে, অনেক আঘাত জীবনে পেয়েছিলেন রঘুনাথ। তাই খাঁটি সত্য-

কথাটা বেরিয়েছিল তাঁর মুখ দিয়ে, বলেছিলেন তিনি : 'ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক, যা তাঁর করবার তিনি তা আমাদের দিয়ে করাবেনই করাবেন। কেননা, ঐ প্রয়োজনটা যে তাঁরই, তোমার আমার তো নয়। ...কাজেই দুঃখ কর না, নিজের হাতে হাল ধরতে যেও না সংসারের,—ছেড়ে দাও তাঁর উপর। সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাক, তিনিই কর্ণধার--তিনি তাঁরই দরকার অনুসারে সময় মত সব যাত্রীদের ঠিকজায়গায় নিয়ে পৌছাবেনই।'

ব্রহ্মময়ী তাই আজ, তাঁর মেজ ছেলের বিয়ের ব্যাপারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিবানীর হাতে ছেড়ে দিয়ে একেবারে অবসর হয়ে বসলেন। শিবানীর গৃহিণীপনায় কোনো চিড় পড়েছে কি না তাও ভাবতে ভাল লাগল না তাঁর। সকলকে বলে দিলেন : বড় বৌমা আছে, তার কাছে যাও। সে যা বলবে, যে-রকমটি বলবে—সে ভাবেই চলতে হবে।

ব্যস, শিবানীও কোমর বেঁধে তিলে-তিলে মেনে চলতে সুরু করে দিল সকল রকমের হিন্দু আচার অনুষ্ঠান। শাশুড়ী নির্লিপ্তের মত দূরে সরে থাকলেও আগে সব কাজকে তাঁর অনুমোদন না করিয়ে কোনো কিছু সে করলে না। পাঁজিপুঁথি ঘেঁটে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে তুললে সব বিধিব্যবস্থা,—ত্রুটি ধরার জো-টি রইল না কারুর। কলকাতার পেশাদারী বামুনপুরুতের দল পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন।

বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রিতেরা এলেন সকলেই।

শিবানীর লেখাপড়া জানা বন্ধুর দল ঠাট্টা করে বললে : স্কুলের হেডমিসট্রেস হলে হবে কি! তুই বাপু নিশ্চয়ই লুকিয়ে-লুকিয়ে সেবায়তের কাজ কোথাও প্র্যাক্‌টিস্ করেছিস এতদিন—আর আজ কিনা দিব্যি টেক্‌কা দিয়ে নাম কিন্‌লি তুই আমাদের উপর!

॥ ৫ ॥

এই বিয়ের দু-তিন দিন পর।

সুপ্রিয়া গাড়ি নিয়ে বেরিয়েই সোজা গিয়ে উঠল অমিতের মেসে। দেখলে, অমিত সেখানে নেই, তার ঘরের দরজা খোলা। সেখানে নতুন এক ভদ্রলোক এসেছেন, ঘরের আসবাবও নতুন। সুপ্রিয়া থমকে দাঁড়াল। তাহলে কি অমিত চলে গেছে—মনটা স্বভাবত খারাপ হয়ে গেল তার। কিন্তু তা জানা দরকার, তাই একটুখানি গলা খাঁকরি দিল সুপ্রিয়া।

শব্দ শুনে ঘরের ভদ্রলোকটি মুখ ফেরালেন। তাঁর বাচনিক সুপ্রিয়া জানতে পারল, স্কুলের পাশে একটা ঘর পেয়ে প্রায় এক সপ্তাহ হল অমিত সেখানে চলে গেছে এই মেস ছেড়ে।

এমনি অদ্ভুত অমিতের চালচলন, সুপ্রিয়া তা জানে। যাক্ ভবানীপুর থেকে সোজা গাড়ী ফেরাল সে আলিপুরের দিকে। যেতে যেতে ভাবে এখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা! কিন্তু স্কুলের সামনে আসতেই দারয়ান দেখিয়ে দিলে অমিতের নূতন আস্তানা।

আলো জেলে বসছিল অমিত, জানলার দিকে মুখ করে।

পিছনের খোলা দরজা দিয়ে পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকলো সুপ্রিয়া।

'আপনি মেস ছেড়ে চলে এলেন, আমরা কিছুই জানলাম না!' সুপ্রিয়ার এই অনুযোগে অমিত বললে: 'আজকালের মধ্যেই একবার তোমাদের ওখানে যাব ভাবছিলাম। যাকৃগে এসে গেছ যখন ভালই হয়েছে। বসো।'

বসল সুপ্রিয়া, কথাপ্রসঙ্গে জানল, শিবানীই উদ্যোগী হয়ে এখানে অমিতকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে—সৌজন্যের ক্রটি রাখেনি। শুনে ভাল লাগল সুপ্রিয়ার, আরো জানতে চাইল: 'এখানে তো আর মেস নেই। খাবার ব্যবস্থাটা কোথায় হয়েছে শুনি? স্বপাক বুঝি?'

'না, তোমার বন্ধুর ওখানেই পেয়িংগেস্ট হলুম আপাততঃ।'

নিশ্চিন্ত হল সুপ্রিয়া, মন্তব্য করলে: 'আগের তুলনায় আপনার এ জায়গা অনেক ভাল। এখানে গান বাজনারও কোনো অসুবিধা হবে না;—প্রাইভেসি রয়েছে প্রচুর।'—ঘুরে ঘুরে ছোট দুখানা ঘর, পেছনের বড় বারান্দা দক্ষিণ মুখো, একপাশে স্নানের কোঠা—সবই সে দেখে নিলে।

ঘরে এসে আবার বসল দুজন সামনাসামনি।

'উঃ! কী ভয়ই না পাইয়ে দিসলেন আপনি দেখুন ত!' কথা তুলল সুপ্রিয়া: 'মেসে আপনাকে না দেখে আমি ত ভাবলুম, বুঝি বা কলকাতা ছেড়েই চলে গেলেন!'

'আরে না, তাহলে কী আর তোমাদের না জানিয়ে যেতাম!'

'আপনি সব পারেন।' সুপ্রিয়া বলে: 'কৈ, এ বাড়িতে যে এলেন তা বুঝি আমাদের জানিয়ে এসেছেন, না!'

অমিত শুধু হাসল, কিছু বলল না।

দিবাকরের বাড়িতে শিবানীর দেবরের বিয়ে ছিল। বৌ-ভাতের দিন, রাত্রে স্কুলের সব টিচারদেরই সেখানে দেখেছে সুপ্রিয়া,—এক অমিত ছাড়া।

তাই জানবার কৌতুহল হল : 'আপনাকে কি নেমন্তন্ন করেনি শিবানী ?'

'করেছিলেন। কিন্তু আমি যাই নি।'

'কেন ?'

এর জবাব দিল না অমিত, চুপ করে রইল।

'কি জন্যে গেলেন না,'—সংকোচ নিয়ে আবার সুপ্রিয়া প্রশ্ন তুলল : 'বলতে কিছু আপত্তি আছে ?'

'না, আপত্তি নেই।' অমিত জবাব দেয় : 'বিয়ে বাড়িতে যাবার কাজ, —এ সব যে সামাজিক অনুষ্ঠান, নিছক লৌকিকতার ব্যাপার, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া হাসে আরো এই জন্যে, এমনতর কথাবার্তাতেই অমিতের বৈশিষ্ট্য সে টের পায় বেশি। কথা বাড়াবার ঔৎসুক্যে আবার বলে : 'তাহলে আপনি সমাজের কেউ নন ?'

'তা ত তোমরাই ভাল জান।'

সুপ্রিয়া চুপ। কেননা অমিত ত মোটেই সমাজবিরোধী নয়, সকল রকম সমাজে তার অবাধযাতায়াত, সে একজন চমৎকার আলাপী—এটা আপন-পর সবাই জানে। কিন্তু তর্কের খাতিরে না বলেও পারল না : 'তাহলে যে আপনাকে কেউ আর নেমন্তন্নই করবে না কখনও।'

'কারা করবে না ? যারা শুধু লৌকিকতার কাঙাল—তারা তো ? নাই বা করল !' অমিত সস্নেহে বোঝাচ্ছিল সুপ্রিয়াকে : 'লৌকিকতা যেখানে, সেখানে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঠেলাঠেলি। সেই ঠেলায় আন্তরিকতা নষ্ট হয় মানুষের। আবার, আন্তরিকতা যেখানে গভীর সেখানে যে লৌকিকতা অনাবশ্যক, সুপ্রিয়া। কাজেই দেখবে, লৌকিকতা যারা ভিক্ষা করে না, অন্তরের যোগই শুধু কামনা করে,—তারা সেই আশাতেই নিমন্ত্রণ করবে,—না করে পারবে না।' একটু থেমে অমিত ভাবল ; এ বিষয়টি শুধু শুষ্ক কথা দিয়ে বোঝানো শক্ত বৈকি। সঙ্গে উপমা দিলে হয়ত সুপ্রিয়া বুঝবে ভাল, তাই মৃদুহেসে কথার সূত্র ধরল আবার : 'এই যেমন, তোমার বিয়ের দিন —আমায় শুধুশুধু নেমন্তন্ন করেই কি খালাস পাবে ভেবেছ ? ধর, আমি যদি কোনো কারণে না যেতে পারি তাহলে ? কি করবে শুনি ? আমি লৌকিকতা দেখলাম না বলে আমার সব সম্পর্ক ছেড়ে দেবে তোমরা ? তেমনি আবার উল্টোদিকে,—তোমরা যদি আমার ঠিকানা না জানো, আর আমি কোনো-না-কোনো চক্রে তোমার বিয়ের সংবাদটা পেয়ে যাই, তাহলে কি মনে কর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব আমি ? যাব না তোমাদের ওখানে ?'

কঠিন প্রশ্ন বটে।

এ সম্পর্কে আর কথা না-বাড়িয়ে ঈষৎ লজ্জায় মাথা হেঁট করে সুপ্রিয়া। এমনসময় বাইর থেকে স্কুলটিচার দীননাথবাবুর ডাক শোনা গেল : 'অমিতবাবু ঘরে আছেন নাকি?' তিনি থাকেন পাশের বাড়িতেই।

সুপ্রিয়া ব্যস্ত হল তাঁকে দেখে, বললে : 'আজ তাহলে উঠি আমি।'

দীননাথকে ঘরে বসিয়ে অমিত সুপ্রিয়াকে এগিয়ে দিতে চলল কিছুটা।

যেতে যেতে সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করে : 'আচ্ছা, একটা কলেজে কাজ করার কথা যে সেদিন আপনাকে বলেছিলুম, তার কি করলেন?'

'বেশ ত, খবর নিয়ে দেখ না।'

'কিন্তু'—গাড়ির কাছে এসে সুপ্রিয়া হঠাৎ চুপ করে দাঁড়াল। এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট, রাস্তার ও বাঁকে অদূরে স্কুলে হেডমিস্ট্রেসের ঘরে আলো জ্বলছে দোতলায়।...

শিবানী এই আলিপুর গার্লস-ওউন্-একাডেমিতে প্রথম,সাধারণ অ্যাসিস্টেন্ট টিচারের কাজ নিয়েছিল। বোধহয় রঘুনাথবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌ হল সে। কাজ বাড়ল তার। তার উপর, শিবানী তখন এক ছেলের মা। থাকত উত্তর কলকাতায়—সেখান থেকে রোজ নিঃমিত আলিপুর আসাযাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। ঐ সব বিবেচনায় নিকটেই ভাল সুন্দর কোয়ার্টার করিয়ে দিলেন যজ্ঞেশ্বর। দিবাকরকে নিয়ে সেই থেকে শিবানী চলে এল এখানে।...তারপর অনেক বছর কেটে গেছে।

আজকাল শোনাযায়, স্কুলসংলগ্ন হেড্‌মিস্ট্রেসের বাড়িটার মালিকীস্বত্ব নাকি যজ্ঞেশ্বরবাবু ছেড়ে দিয়েছেন স্বয়ং শিবানী মুখার্জির উপর। তবে, দিবাকর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি তাঁর পৈতৃকসম্পত্তির তদারকের কাজেই সারাক্ষণ ব্যস্ত। কেবলমাত্র শিবানীর জন্যই তাঁর বর্তমান আলিপুরবাস, তাছাড়া ছোট একটি কন্যা অদিতিও আছে। দিবাকর প্রায়ই বলেন : ওকে হরিতকীবাগানে মা'র কাছেই নিয়ে আসব, আর শিবানী থাকবে আলিপুর তার বড় ছেলে মিহিরকে নিয়ে।

এ সব শিবানীর ঘরের খবর—প্রায় সুপ্রিয়ার জানা। সে আরো জানে, শিবানী শ্বশুরবাড়ি যাবার আজকাল খুব সময় পায় না বলেই, বিশেষকরে এই বিয়ের ব্যাপারে স্কুলের কাজে ছুটি নিয়েছে—সকলের একসাথে সাবেক হরিতকী বাগানের বাড়িতেই কাটাবে কিছুদিন।

কিন্তু এ কি!

স্কুল-ঘরে আলো জ্বলছে দেখে সুপ্রিয়া বিস্ময়দৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছিল খানিকক্ষণ, এবার অমিতের দিকে চেয়ে সুধালে: 'শিবানী ফিরে এসেছে বুঝি?'

'হতে পারে। আমি ত জানিনে।'

'ইশ্, মেয়েটা স্কুল স্কুল করেই গেল। ছুটি নিয়েছে, তবু রেহাই নেই ওর। যাকৃগে ভালই হল,'—গাড়ির দরজা খুলতে-খুলতে সুপ্রিয়া বললে: 'আমি এক্ষুনি শিবানীর সাথে দেখা করে যাচ্ছি। আর এই ফাঁকে কলেজের কাজের কথাটাও তাকে জানিয়ে রাখব আজ, দেখি সে কি বলে।'

সুপ্রিয়াকে বিদায় দিয়ে ফিরল অমিত।

দীননাথবাবু গল্প করছিলেন, তাঁর চাকরি জীবনের গল্প।

স্কুলের দারয়ান মোহনলাল এসে সংবাদ দিলে, শিবানীদি নাকি একবার অমিতের সঙ্গে দেখা করতে চান। দোতলায় অফিসঘরে অপেক্ষা করছেন।

ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হলেন দীননাথ: 'নিন্, একটুখানি বসে গল্প করার আশায় এসেছিলাম তা আর হল না।' উঠতে গিয়ে আবার বলেন: 'যান অমিতবাবু আপনি ছুটুন শিগগির। নয়ত উনি আবার নিজেই এসে হাজির হবেন।'

মোহনলালের পিছন-পিছন অমিত গেল স্কুলে। দেখে, শিবানী সত্যই আলো জ্বালিয়ে এই রাত্তিরে তার নীচে বসে অফিসের সব খাতাপত্র নাড়াচাড়া করছে। অমিতকে দেখে মুখ তুলে হাসল: 'বসুন'। অমিত বসলে পর শিবানী জিজ্ঞেস করে: 'কেমন লাগছে আপনার এই নূতন পরিবেশ? আমি ত ছিলাম না গত ক'দিন। বড্ড একা একা লাগছে—না?'

'না ভালই লাগছে'—সংক্ষেপে জবাব দিয়ে অমিত হাসল একটু।

'আমার কিন্তু এই স্কুল ছাড়া অন্য কোথাও ভাল লাগে না। দেখুন, ছুটি নিয়েছি তবু চলে এলাম।' —এমনি নানান কথাবার্তার মধ্যে শিবানী জানতে চাইল: 'কাল কি আপনি বিশেষ কোন কাজে ব্যস্ত আছেন? যদি না থাকেন, চলুন না আমার সাথে।'

'কোথায়?'

'আজকের কাগজে দেখলাম কোন এক মৃত স্কলারের লাইব্রেরি বিক্রী হচ্ছে,—দেখে আসি, যাবেন? সুবিধা মনে হলে—কিনে নেওয়া যাবে তা স্কুলের জন্যে। কিন্তু'—বলেই শিবানী থামল হঠাৎ।

অমিত তাগিদ দেয়: 'কি বলছিলেন বলুন। থামলেন কেন?

'ভাবি, এসব আবার দেখাশুনা করবে কে!' রীতিমত প্র্যাকটিক্যাল হল শিবানী, বলে: 'স্কুল টিচাররা কেউ যে এদিকে খুব ইন্টারেস্ট্ নেবেন, সেই

আশা কম। ওঁদের হয়েছে দিনগত পাপক্ষয়। বাঁধা রুটিন করে দেব,—তাই দেখে ওঁরা সময় মেপে-মেপে কাজ করবেন, ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় এসে স্কুলে দেবেন হাজিরা,—তারপর ছুটির ঘন্টা বাজা মাত্র যে যাঁর বাড়ি দৌড়াবেন! এমনি করে ওঁদের সাহায্যে কি নতুন বড় রকমের একটাকিছু গড়ে তোলার আদর্শ সামনে ধরা যায় কখনও—বলুন ত?' একটু থেমে: 'অথচ আমি এ-দিকে ওঁদের কারুর ওপর কোনো জোরও খাটাতে পারিনে।'

টিচারদের বিরুদ্ধে শিবানীর এমনতর প্রচ্ছন্ন অনুযোগের ভিতর একটা বিশেষ আন্তরিকতা অনুভব করে অমিত তাঁর দিকে সহানুভূতিতে নুয়ে পড়ল, বলল: 'ঠিক আছে—আমিই দেখব ও-সব।' অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভেবে সে কথা দিয়ে দিল শিবানীকে; তারপরেই সোৎসাহে জিজ্ঞেস করে: 'কাল কখন যেতে চান বলুন?'

শিবানী ইতিমধ্যে তাঁর সামনের খাতাপত্র সব গুটিয়ে রেখে গভীরভাবে তলিয়ে দেখছিল অমিতকে, আর ভাবছিল: কাচামাটি—গড়ে নেওয়া যাবে। নির্জনে থাকতে ভালবাসে—লোকটা গুণী বটে। আগে অমিতকে দূরথেকে মনে হত, বেজায় ভবঘুরে! কিন্তু এখন দেখছে সেটা ভুল। তবে এও ঠিক, যে, চাকরি জীবনের কোনো তিক্ততা এঁকে স্পর্শ করেনি আজও। আর এ জাতীয় লোকেরা বোধকরি সংসারে ঠিক চাকরি করতেও আসে না, আসে শুধুশুধু কাজ করতে—কাজের ফলাফলের বিচার নিয়ে মাথা ঘামায় কম। এই তো, —কী সুন্দর সরলমনে নতুন একটা দায়িত্ব স্বেচ্ছায় হাতপেতে নিয়ে নিল, এতে তার নিজের লাভক্ষতি কি হবে তা একটুখানি ভাবল না, জিজ্ঞেসও করল না। সুতরাং সতর্কতার সঙ্গে সুকৌশলে চালাতে পারলে—অমিতকে দিয়ে যে কাজ হবে অনেক, তাতে শিবানীর কোনো সন্দেহ নেই।

এসব ভাবল শিবানী—এবং পরদিন উভয়ের মধ্যে যাবার একটা সময় স্থির করে নিয়ে বললে: 'আমাদের বর্তমান লাইব্রেরির ঘর অত্যন্তছোট দেখেছেন ত। কালকে যদি নূতন লাইব্রেরিটা পছন্দ হয় তাহলে আমাদের বই-র সংখ্যা অবশ্যি বাড়বে, ঐ সঙ্গে জায়গাও আরো বাড়াতে হবে বৈকি।'

'নিশ্চয়'—অমিত তার উৎসাহিত কণ্ঠ যোগ দেয়: 'এটা করলে চমৎকার হয় কিন্তু। আমায় একটা চেয়ার-টেবিল দিয়ে দেবেন ওখানে—একটু নিরিবিলি জায়গা বেছে। তারপর অন্য সব আমি ঠিক করে নেব'খন।'

'বেশ তো'—শিবানীও মনে মনে উল্লসিত হয়, বলে: 'আপনি ইচ্ছা করলে এখানে বসে পড়ালেখার কাজও করতে পারেন অনায়াসে—নিশ্চিন্ত।

ভালকথা, সময় পেলে নাচ-গান সম্পর্কেই কিছু লিখুন না কেন মাষ্টারমশাই? সুপ্রিয়ার কাছে ঐ বিষয়ে আপনার একটি লেখা কবে জানি দেখেছিলাম—আমার কাছে ত খুব ভাল লেগেছিল।'

এই বিষয়ে শিবানীকে বেশি বলার সুযোগ না দিয়ে অমিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করে: 'ও সব বাজে, তা নিয়ে ইমিডিয়েট্‌লি কিছু ভাবতেও চাইনা। অনেককাল আগে লিখেছিলাম, মনের মত হয়নি—ফেলে দিয়েছি।'

শিবানী বলে: 'আমি কিন্তু ওটা নিয়ে রেখেছি আমার কাছে।'—তারপর খুব আস্তে আস্তে আপন মনে বলল আরো: ভেবেছি ছাপাবো।

শিবানীর অস্ফুট কথাগুলি অমিত মোটেই শুনতে পেল না—শুনবার চেষ্টাও করল না। কারণ—এই খানিক আগে যে শিবানী বলেছে, অমিত যদি লাইব্রেরিতে এসে পড়াশুনা করতে চায় তাহলে এর একটা বিশেষ ব্যবস্থা সে অবিলম্বে করে দেবে এবং সময় পেলেই যেন অমিত সেখানে চলে আসে, কোন অসুবিধা হবে না তার—এই নূতন কাজের পরিকল্পনাতেই অমিতের মন ভরে উঠেছিল অসম্ভব;—তখন অন্য কথা আর সে শুনবে কি করে!

'তা আপনি কি করছিলেন?' শিবানী জিজ্ঞেস করল: 'এখন ডেকে পাঠিয়ে কোন রকমের অসুবিধা করিনি ত আপনার?'

'না না অসুবিধা কিসের! এই গল্প করছিলাম দীননাথবাবুর সাথে বসে বসে,—তা উনি এতক্ষণে চলে গেছেন নিশ্চয়।'

'তাহলে চলুন—আমাদের বাড়ি। রান্না হয়ে গেলে একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসবেন।'

সেদিনই সকালবেলা।

হরিতকী বাগানের বাড়িতে চা খেতে বসে দিবাকর খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলেন। তার পাশে মিহির আর অদিতির খাবারের তদারক করছিল শিবানী। মিহির বলছিল তার মাকে, এবার যখন অমিতকে বাড়ির কাছে পেয়েছে সে, তখন আর তার গান শিখতে অসুবিধা কি! ছোট বোন অদিতিও আধো উচ্চারণে ঐ সঙ্গে বায়না ধরলে' সেও গান শিখবে, কী মজা! খুশিতে হাততালি দিয়ে নেচে উঠল।

কাগজখানার আড়াল থেকে দিবাকর তাদের দেখছিলেন; এবার বললেন 'হ্যাঁ তুমি একটু বড় হও মা। তোমাকে নিশ্চয় গান শেখাব আমি।' তারপর শিবানীর দিকে তাকিয়ে: 'এখন থেকেই অমিতবাবুর কাছে একে রাখতে পারলে মন্দ হয় না,—কি বল?'

'সেটাই ত মনে মনে ভাবছি আমিও। আগে দেখি, ভদ্রলোককে কোনো প্রকারে এখানে স্থায়ীভাবে আটকাতে পারি কি না! ওঁর চাহিদা তো আর কলকাতা শহরে কম নয়;—বাইরেও যেকোনমুহূর্তে পালিয়ে যেতে পারে।'- শিবানীর কথার শেষাংশ দিবাকরের কানে গেল না।

দিবাকর অন্যমনস্ক ছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন: 'আচ্ছা, আমি ত ভেবে পাইনে। একটি মাত্র লোক, আমাদের এখানে খাবেন—তাঁকে আবার পেয়িংগেস্ট হিসেবে রাখলে কেন তুমি?'

'উনি নিজে থেকেই ত টাকা অ্যাডভান্স করে দিয়েছেন।'

'টাকা অ্যাডভান্স করেছেন বলেই কি তুমি সে টাকা হাত পেতে নেবে? বেশ বুদ্ধি ত তোমার!'

কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে হাসল শিবানী, বললে: 'তাহলে?'

'টাকাটা ওঁর ফিরিয়ে দাও।'

'যে রকমের মানুষ—ফেরৎ নেবেন বলে ত মনে হয় না।'

'তাহলে, নিজে দেখেশুনে সামনে বসে ওঁর খাবার আয়োজনটা রোজ বৃন্দাবনকে দিয়ে করিয়ে দিয়ো। যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়।' এতটা বলে আবার অনুযোগ তোলেন দিবাকর: 'বিয়ের আগের দিন থেকেই ত সবাই এ-বাড়িতে চলে এলে; আর ভদ্রলোক একা ওখানে আছেন, —বৃন্দাবন ওঁকে কি খাবার দিচ্ছে, না দিচ্ছে—উনিই বা কী খেলেন বা না খেলেন —এ সবের কোন খবর নিয়েছ এ পর্যন্ত?'

'বা রেঃ! আমি কি জানতেম যে অমিতবাবু বিয়ে-বাড়িতে আসবেন না!' শিবানী সাফাই-এর সুরে বলে: 'তাঁর ত নিমন্ত্রণ ছিল এখানে।'

'তাইত বলছি, যখন আসেননি তখন এসব দেখাশোনা করা ত তোমারই ডিউটি!' —এই কথার মধ্যে দিবাকরের বিরক্তি প্রকাশ পেল একটু।

'ঠিক আছে, আমি দেখব এখন থেকে।' শিবানী বললে।

'শুধু দেখব বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলে ত চলে না। লোকটা খাঁটি বাঙ্গাল—বড্ড ভোজনবিলাসী ওঁরা। আমি সত্যি বুঝতে পারছি না, তুমি কী-করে সামলাবে এ-সব!' তারপর আপনমনেই বলতে থাকেন দিবাকর: তুমি আবার যা হিসেবী! মনে থাকে যেন, এই খাবারের জন্যে কিন্তু টাকা নিচ্ছ ওঁর কাছ থেকে। —এ কাজটা যে দিবাকরের পক্ষে কত লজ্জাকর—তা আর শিবানীকে মুখফোটে বলার সাহস হল না তাঁর।···

এ সমস্ত কথাই সত্য এবং উচিত।

শুনে শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে উঠেছিল শিবানীর।

তাই আর দেরি না করেই ফিরল সে আলিপুর। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর শুধু মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলো একা-একা।

সন্ধ্যায় যাচ্ছিল অমিতের ওখানেই—দেখলে, দূর থেকে সুপ্রিয়াকে। নিঃশব্দে ফিরে এসে স্কুলে অফিসঘরের দুয়ার খুলে বসল। সুপ্রিয়া চলে যেতেই মোহনলালকে পাঠাল অমিতের ঘরে।

তার পরেই ত,—

অমিতকে সঙ্গে করে শিবানী রাত্রে যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরল তখনও বৃন্দাবন রান্নাঘরে রান্না করছে। তার রান্নার কাজ বন্ধ রেখে চা করার নির্দেশ দিল শিবানী। ছেলেকে ডেকে বললে: 'যাও তো মিহির, মাষ্টারমশাইকে ছাদে নিয়ে বস গে একটু। আমি এক্ষুনি আসছি।'

সেখানে মাদুর বিছানো ছিল; অমিত নিশ্চিন্ত আরামে বসলে।

খানিকবাদে বৃন্দাবন এক হাতে চায়ের পেয়ালা, অন্যহাতে একটা ডিস্‌ভরা অনেকগুলো সন্দেশ নিয়ে উপস্থিত। বৃন্দাবনের চেহারা ছবি বেশ ভাল, গায়ের রং ফর্সা—তার উপর অতিরিক্ত রকমের ফিটফাট। শিবানীর বাড়ির 'কুক্,' বলেই সবাই তাকে চেনে—তা নইলে, কে বলবে যে, একটা অফিসের বাবু নয় সে। রান্নাঘর থেকে বেরুলেই ইস্ত্রি করা সার্ট আর ট্রাউজার গায়ে চাপায় বৃন্দাবন; কখন-সখন এই পোষাকে সে আলিপুরকোর্টের সামনে একটা টাইপরাইটিং মেশিন নিয়েও নাকি বসে—অমিত তা শুনেছে; বিশেষ করে এই কদিন ত বৃন্দাবন তার কাছে এসেছে ঘনঘন, শিবানী এ বাড়িতে ছিল না বলে।

অমিত বললে: 'তোমাকে আর আমার জন্যে ভাবতে হবে না বৃন্দা। তোমার দিদিমনি ত এবার এসে গেলেন।'

বৃন্দাবন নীরবে হাসল।

'আরে! এতো মিষ্টি এনেছ কেন?' প্লেটের দিকে নজর পড়তে অমিত বলে ওঠে: 'ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

'খান বাবু, এ সব বিয়েবাড়ির সন্দেশ, দিদিমণির সঙ্গে এসেছে। আপনি ত যান নি সেখানে।' বৃন্দাবনের এই কথার সঙ্গে মিহিরও যোগ করল: 'বাপি সেজন্যে মাকে খুব বকেছে।'

অমিত বুঝতে পারল ব্যাপারটা; —এনিয়ে আলোচনা করা এদের সঙ্গে অশোভন এবং উচিত নয় ভেবে বৃন্দাবনকে নীচে পাঠিয়ে দিল।

মিহির পুরানো একটা ভাঙা সেতার নিয়ে এসে বললে: দেখুন ত মাষ্টারমশাই, এটা বাজাতে পারেন কিনা।

চা খেতে খেতে হাত বাড়িয়ে সেতারটা নিল অমিত। পুরানো বটে, কিন্তু খুব ভাল সেতার—বেশ দামী মনে হচ্ছে। মিহিরের কাছথেকে কথায়-কথায় জানল, এর মালিক নাকি দিবাকরবাবু, গান বাজনার দিকে তাঁর বেজায় ঝোঁক। বেহালাও নাকি বাজান সময়-সময়, ঐ বাড়িতেই সব—বড় পিয়ানো আছে ওঁর সেই হরিতকীবাগানের বাড়িতে একটা। শুনে দিবাকরের উপর অমিতের শ্রদ্ধা জন্মালো। চা খাওয়া শেষ করে সেতারের ছেঁড়া তারগুলো খুলে ফেলে অমিত তাতে নতুন তার জুড়ছিল। কোন ফাঁকে যে শিবানী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে সেদিকে অমিতের মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

সেতারের টুং টাং শব্দ, আর সুরেরমধ্যেই অমিত তখন বিভোর।

অনেকক্ষণ অপেক্ষান্তে একটু চঞ্চল হল শিবানী: 'ও মাষ্টারমশাই—এটা আপনারঘরে পাঠিয়ে দেব, ঐখানে বসে-বসে সময়মত ঠিক করবেন এ ভাঙাসেতার। এখন রেখে দিন।' —এই বলে মৃদুহাস্যে শিবানী নিজেই সেতারখানা অমিতের কোল থেকে টেনে একপাশে সরিয়ে রেখে মিহিরকে বললে: 'খাবার ঘরে টেবিলে তোমার খাবার সাজিয়ে রেখে এসেছি। বৃন্দাবন আছে সেখানে—যাও, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়গে।'

মিহির উঠে গেল।

পর মুহূর্তেই অমিতের চোখ সরাসরি পড়ল শিবানীর উপর।...

শিবানী এইমাত্র স্নান করে এসেছে। সদ্যভিজা খোলা চুলের রাশ ছড়িয়ে আছে তার পিঠের ওপর। তা দেখে অমিত প্রসন্নমনে অনুভব করে যে, প্রসাধনের সামান্যস্পর্শে অতিঅল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েদের বাইরের রূপটা কত সহজেই না উজ্জ্বল ও আকর্ষক হয়ে ওঠে,—বলল সংযত কণ্ঠে: 'বসুন এসে ভাল করে আপনি। সেদিন বলেছিলেন না আমায় গান শোনাবেন—ছোটবেলায় ওস্তাদের কাছে যা শিখেছিলেন সে-সব? আজ কিন্তু আপনার গান শুনব—'

'ওমা! আমার আবার কী গান শুনবেন!' শিবানী আশ্চর্যান্বিত ভঙ্গিমায় তার নারীসুলভ গৎ-বাঁধা আপত্তি জানালো।

'তাহলে আমিই গাইছি—আপনি শুনুন।' স্বেচ্ছায় পরপর অনেকগুলি গান করল অমিত।

শিবানী ভাবাবিষ্ট, কোনো সন্দেহ নেই—সঙ্গীতে সে উৎকৃষ্ট শ্রোতা।

গান শেষ হলে একটা স্থর নিয়ে অমনিতে গুন্‌গুন্‌ করছিল অমিত।

শিবানী জিজ্ঞেস করে: "আপনি তো প্রায়ই দিব্যি খালি গলায়—কোনো রকমের বাজনার সাহায্য না নিয়েই গান গেয়ে যান! এম্‌নি খালিগলায় গান করা কি খুব কঠিন কাজ?'

'মোটেই না। অভ্যাস করলেই তা পারা যায়।'

শিবানী উৎস্থককণ্ঠে বলে: 'আমি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে গাইতে শুনেছি—খালিগলায় গাইতেন তিনি। বেশ পরিষ্কার বোঝা যেত—অবশ্যি বলতেনও অনেক সময় যে, এটা তিনি করতেন—তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য ও গানের কথার স্পষ্টতা যাতে বাজনার শব্দে ঢাকা না পড়ে—সেই উদ্দেশ্যেই। তাঁর আশ্রম শান্তিনিকেতনে গিয়েও সেখানকার ছেলেমেয়েদের দেখেছি—দিনেন ঠাকুর মশায়ের কাছে বসে খালিগলায় গান গাইতে। কোনো-বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের দিকে তাঁদের ত মোটেই কোন আগ্রহ নেই অথচ তাঁদের গাওয়া গান শোনায় কত ভালো আর কত স্পষ্ট। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়,—গান গাইবার এই স্পিরিটটা বাইরে আমাদের কাছে প্রায় অবহেলিত। সত্যি বলতে কি—এসব জায়গায় যেন কেউ কল্পনাই করতে পারেন না যে,-বাজনা ছাড়াও গান ভাল হতে পারে। এটা কেন হয় বলুন তো?'

'ঐ তো বললুম—অভ্যাস।' অমিত সংক্ষেপে জবাব দিল: 'যে যে-ভাবে যা অভ্যাস করে, সে সে-ভাবেই তা করতে ভাল বাসে।'

শিবানী, ইতোমধ্যে অনেকটা চিনেছে অমিতকে, বুঝতে পারল, অমিতের মেজাজ যেন এই মুহূর্তে কোন সিরিয়স্‌ বিষয় নিয়ে আলাপ করার মত প্রস্তুত নয়, তবু শিবানী স্থযোগ পেয়ে একটু মন্তব্য জানায়: 'আপনি যাই বলেন না কেন—বাইরের লোকদের রুচি কিন্তু ভিন্ন ধরনের। তাঁদের অধিকাংশই গানের ওপর বাজনার উগ্র চাকচিক্য পছন্দ করেন বেশি! কিন্তু বিশেষকরে বাংলাগানের সঙ্গে একমাত্র তারের যন্ত্র ছাড়া কোন-কোন বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্রের, যেমন হারমোনিয়ম ইত্যাদির সঙ্গত যে অনেক সময় 'সাপে-নেউলে'র রূপ নেয় এবং তা যথার্থ গুণীরসিক শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তপীড়াকর হয়ে ওঠে—এটা বোঝেও বুঝতে চান না আমাদের দেশের বহু গায়কশিল্পীরা, অর্থাৎ তাঁদের ঐ সম্পর্কীয় বোধশক্তিটাই থাকে নানা দুর্বিপাকে বিলুপ্ত—আর ঐকারণেই খালিগলায় গান করার রেওয়াজে তাঁরা পারেন না অভ্যস্ত হতে—এ সত্য কথাটা আমি বলবই বলব।'

সঙ্গীত-প্রসঙ্গে শিবানীর এই অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক রসানুভূতিকে অমিত

মনে মনে তারিফ করল এবং জবাবে একটু হাসল বটে,—কিন্তু এ নিয়ে আর নতুন কথা বাড়াতে চাইল না।…

ক্ষণকাল সম্পূর্ণ নীরব থেকে শিবানী সহসা প্রশ্ন করল : আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনারা কয় ভাই ?

—আমি একা। —বোন ? —তিনটি। —বিয়ে হয়ে গেছে ওদের ?

—হ্যাঁ তিন জনেরই বিয়ে হয়েছে। —আপনিই ত সকলের বড়ো ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আপনি বিয়ে করেন না কেন ? —প্রশ্নের মধ্যে একটুখানি মীড় তুলে শিবানী যেন নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হল নিজে, বললে সঙ্গে-সঙ্গে : 'কিছু মনে করবেন না, প্রশ্নটা হঠাৎ এসে গেল মুখে।'

এবার অমিত অনায়াসে বলতে পারত, যে, এ বিষয়ে ত ভীষ্মদের মতন সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয় কারো কাছে—ব্যস। কিন্তু তা না-বলে সে শখ করে কথার ঘুড়ি ওড়াবার দিকে ঝুঁকলো একটু, বলল : 'এর মধ্যে মনে করার কিছু নেই।' তারপর শিবানীকে সাহস জুটালো আরো এই বলে : 'এসব তো খুব স্বাভাবিক অতি সাধারণ প্রশ্ন,—পৃথিবীর সকলেই করে থাকেন। বরং—না করলেই অনেক সময় অনেক কিছু মনে করতে ইচ্ছে হয়।'

শিবানী নীরবে তাকাল অমিতের মুখের দিকে।

অমিত আরো বলে : 'তবে প্রশ্নটা যত সহজে করা যায়, উত্তরটা হয়ত সব সময় তত সহজে দেওয়া যায় না—এই যা মুশকিল।'

'কেন, মুশকিল কিসের ?' শিবানীর এ প্রশ্নে অতিরিক্ত আগ্রহ।

'ধরুন, আমি যদি বলি, বিয়ে করতে হলে যে সব প্রস্তুতির দরকার, আমার তা কিছুই নেই।'

অমিতের এমনতর স্পষ্ট সুবিবেচিত জবাব শুনে শিবানী চট্‌করে নিজের ভিতরটা ঘুরে এল অনেকখানি, এ সব যে তারই মনের কথা। তবু বললে : 'প্রস্তুতি বলতে আপনি কি মীন করেন ?' —কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে তার।

'দেখুন, গাড়ি-বাড়ি কাঞ্চনের প্রাচুর্য যার নেই—তার মনে এসবের চিন্তা পোষণ করাও যে হাসির ব্যাপার শিবানীদি।' —প্রসঙ্গটাকে এখানেই কোন প্রকারে চেপে দিয়ে একটা বাহাদুরি নিতে চাইল অমিত।

কিন্তু শিবানী যে কতটুকু নাছোড়বান্দা—অমিত কি তা জানত!

'সবই হতে পারে।' —হাসির বন্যায় এবার শিবানী উদ্দীপিত হয়ে বললে : 'মানুষের অসাধ্য কিছু নেই ভাই।' একটু থেমে : 'সত্যি চান

আপনি—কাঞ্চন বাড়ি আর গাড়ি?' প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো নাচছে শিবানীর: 'তাহলে, বিয়ে করতে রাজি আছেন—বলুন?'

অমিত মনে মনে আতংকিত হল, আলোচনাটা আর অধিক ভাল লাগছিল না তাই অস্ফুটে বললে: 'কী জানি। ওসব ভাবিনি ত কখনও।'

আর কোনো ভণিতা না করে শিবানী আসল কথাটা তুলল এবার: 'সুপ্রিয়া আপনাকে খুব ভালবাসে—না মাষ্টারমশাই?'

প্রশ্নটা খাপছাড়া। অমিত ঠিক বুঝতে পারল না কি অর্থে শিবানী হঠাৎ একথা বলছে, তাই বিভ্রান্তের মত পাল্টা প্রশ্ন করলে: 'কি করে আপনি বুঝলেন?'

'এমনিতেই— দেখে মনে হল।' —বলে মুখটিপে হাসে শিবানী।

অমিতের ভিতর বিদ্যুৎ খেলল এবার। ...আজ সন্ধ্যায়ই ত সুপ্রিয়া এসেছিল তার ওখানে—তা কি আর শিবানী দেখেনি! শিবানীও ত তার সেই ভবানীপুরের মেস্-এ পর্যন্ত গেছে কতবার—অথচ আজ এত কাছে তবু কেন গেল না? অনায়াসেই ত যেতে পারত বিশেষত সুপ্রিয়া যখন ছিল সেখানে। এই সহজপথে না গিয়ে সুপ্রিয়া চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে মোহনলালকেই বা পাঠাল কি জন্যে! —এসব সূক্ষ্ম জটিল মনস্তত্ত্ব অমিতকে সজাগ করে তুলল কতকটা। আর তাই না ইচ্ছা করেই সে হেঁয়ালি ছড়ালো নিজের কথার ওপর, বললে: 'দেখুন শিবানীদি, শুধু শুধু এমনিতে দেখে মনে হওয়ায় কারো ভালবাসার বিচার চলে কি!' —তারপর যেন রীতিমত কথাবলার প্রলোভনে পেল তার। সে সরাসরি শিবানীর এই সুচারু নৈশসজ্জা আর নিভৃত পরিবেশকে নীরবকটাক্ষে ইঙ্গিত করে না-বলে পারল না: 'এখন এইঅবস্থায় যে আমাদের দেখবে সে-ই ত ভাববে যে আপনিও আমাকে ঐ সুপ্রিয়ার মতনই ভালবাসেন, কিংবা তার চেয়েও অনেক বেশি। অথচ বলুন দেখি, আপনারসঙ্গে আমার কীই বা সম্বন্ধ? আপনি স্কুলের এক হেডমিসট্রেস আর আমি সেখানে স্রোতে ভেসে-আসা এক মিউজিক্‌টিচার—এইত?'

শিবানী একটু বেকায়দায় পড়ল, অথচ নিরুত্তর থাকলে তার জবাবটি জানা হবে না, তাই বললে: "না, না কথাটা ঠিক ঐ ভাবে আমি বলিনি কিন্তু—"

"ভালবাসা সম্বন্ধে, গল্প উপন্যাস পড়ে কিংবা হয়ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আপনার যা 'কন্‌সেপ্‌শান্'—আপনি সেইভাবেই যে তা বলেছেন আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি। তবে আপনার বলার কারণটা আপনি অতি যত্নে আমার কাছে অস্পষ্ট রেখেছেন—এই যা।"

অমিতের কাছে ধরা পড়ে গেছে শিবানী। এতদূর এসে আবার পিছিয়ে পড়াটা তার পক্ষে শোভন নয় ভেবেই বোধকরি শিবানীর মুখ থেকে সহসা পিছলে এল : "আমার মনে হয় সুপ্রিয়াকে বিয়ে করলে আপনাদের মানাতো ভাল।" বলেই আবার চুপি চুপি বললে : "দেখবেন মাষ্টারমশাই, কথাটা যেন আবার সুপ্রিয়াকে আপনি বলে দেবেন না।"

একথা অমিত মোটেই গায়ে মাখেনি—এটুকু বোঝাবার জন্যে হো হো করে হেসে উঠল : 'আমাকে কিছু বলতে হবে না আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সুপ্রিয়া আপনার বন্ধু। আপনার কাছ থেকেই সে জানতে পারবে সব।'

শিবানী নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল অমিতের মুখের দিকে।

অমিত বলছিল : 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, সুপ্রিয়ার মামা দুর্গাপ্রসাদ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুপ্রিয়ার মা'কে আমি দিদি বলি, আর সুপ্রিয়া আমার ছাত্রী। কাজেই ওর সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তা আপনার কাল্পনিক সম্বন্ধের চেয়ে অনেক খাঁটি—অনেক সুন্দর।'

খানিক নিস্তব্ধতার মধ্যে বৃন্দাবন এসে ওদের খাবার জন্যে ডেকে নীচে নিয়ে গেল বলে—এ আলাপ আর বেশীদূর এগুলো না। কিন্তু পরদিন সেই লাইব্রেরীটি পছন্দ করে ফিরে আসার পথে গাড়িতে বসে শিবানী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঐ কথাই তুললে : 'যাকগে, কালকের ওসব কথা ভুলে যান আপনি।' তারপর আলাপের মোড় ফেরালো : 'সুপ্রিয়া বলছিল, অন্য কোন্ এক কলেজে নাকি আপনার জন্যে কাজের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি—ও সব হবে-টবে না। বস্তুত কাল সারাটা রাত, সুপ্রিয়ার মুখে ঐ কথা শোনার পর থেকে, আমি যে অনবরত কত কি ভাবছি—আপনি তা জানেন?' এইটুকু বলে অমিতের মনোজগতের শূন্যস্থান আরো অনেকখানি দখল করে নিল শিবানী।

এরপর আর কাহাতক অমিত নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। শিবানীর দুর্ভাবনার কারণ জানার উৎসাহ দেখাল সে।

শিবানী বললে : 'আমি মনে করেছি, আপনাকে এখানেই হোল্ টাইম্ টিচার করে নেব আমরা।'

অমিত আপত্তি করতে যাচ্ছিল।

শিবানী বুঝিয়ে দিল : 'স্কুলে আপনাকে গান করতে হবে না সব সময়, হাজিরাও দিতে হবে না একটানা ভাবে। আপনি যখন লাইব্রেরীর কাজ ভালবাসেন, বেশ তাই করুন না সকালের দিকে,—আর বিকেলে এসে গান শেখান। আশাকরি এতে আপনার গলার উপর বিশেষ কোনো 'স্ট্রেন্'ও হবে

না। আর যদি মনোটনাস্ মনে হয় তাহলেও নিজের খুশিমত তা অদল-বদল করে নিতে পারেন। এ নিয়ে আপনাকে কেউ কিছু বলবে না। মোটকথা, আপনার ওপরই গানের সেকশানের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে দিতে চাই। যখন যা অসুবিধা মনে হয় বলবেন আমাকে উইদ্ নো হেসিটেশন্।' কথার শেষে আরো সহানুভূতি ছড়ালো শিবানী: 'আর আপনি বাইরে বাইরে ভুতের মত ছুটছেন কেন বলুন ত? টাকার জন্যে? এরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আমি আপনাকে করে দেব—আপনি দয়া করে আমার উপর নির্ভর করুন।'

এরপর আর কী বা প্রতিবাদ করবে অমিত! শিবানীর সৌজন্যে বিহ্বল হয়ে পড়ল সে,—এই শিবানী তার জন্য এত ভাবে!

তবে হ্যাঁ, শুধু গান শেখালেও অমিতের ডেজিগ্নেশন্ কিন্তু ওদের খাতায় পত্রে থাকবে অ্যাসিস্টেন্ট টিচার,—মিউজিক টিচার নয়।—এটা স্কুলের এক আভ্যন্তরীণ আইনের ব্যাপার—অনেকক্ষণ ব্যাখ্যা করে বোঝাল শিবানী, তারপর টিচার'দের চাকরির নিরাপত্তা এবং মাইনে ইত্যাদি বাবদ যত রকমের সুযোগ সুবিধা আছে তাও অমিতকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বললে: 'আপনার পোষ্ট হবে পার্ম্যানেন্ট্। কেমন রাজি আছেন ত?'

এসব নিয়ে বেশি ভাববার স্বভাব অমিতের নয়।

সে দেখল, তার প্রতি শিবানীর সহানুভূতির ত্রুটি নেই—অন্ত নেই। আর ভবিষ্যতে যদি স্কুলটি যথার্থই আবাসিকে পরিণত হয়—তাহলে এ-কাজে আফ্সোস্ বা অনুযোগের কীই বা থাকতে পারে তার!

॥ ৬ ॥

'অমিতবাবু, আপনি আগে এভাবের চাকরি করেননি কক্খনো, আর সত্যি বলতে কি, চাকরি করার মেজাজও আপনার নয়—তাই এতটা বেপরোয়া, কারো কোনো তোয়াক্কা রাখেন না আপনি। কিন্তু—'

বলতে দেয়নি আর অমিত, ক্ষেপে উঠেছিল: 'ধেৎ মশাই, চাকরি করলেই মোস্ট্ ওবিডিয়্যান্ট্ ডগ্ হতে হবে এমন কোন নিয়ম আছে নাকি?'

হেসে উঠেছিলেন দীননাথ। তারপর অমিতের পিঠে কাঁধে হাত বুলিয়ে বুঝিয়েছিলেন: 'প্রভুত্ব করতে হলে নম্র হতে হয়, নত হতে হয়—ছোটর কাছেও! এই দুটি গুণের অভাবে কিন্তু প্রভুর আসনও ভেঙ্গে যায় অমিতবাবু।'

দীননাথের এই উপদেশটা অমিতের খুব ভাল লেগেছিল। বস্তুত তার পর থেকেই নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করেছে অমিত,—সে যে স্কুলের একজন মোস্ট্

ওবিডিয়্যান্ট্ সার্ভেন্ট্ একথা আজকাল আর সে ভোলে না, কথাবার্তাও বলে খুব সাবধানে! বৃদ্ধ দীননাথবাবুকে সে শ্রদ্ধা করে, ভালোও বাসে যথেষ্ট। তার মনের সব কথা প্রায় ঐ বুড়োর সঙ্গেই। ...বলেছিল সে একদিন: 'জানেন? শিবানীদি আমায় ধরেছেন, কলকাতা শহরে একটা বাড়ি তৈরী করতে। আপনি ত বুড়ো হলেন দীননাথদা, আচ্ছা বলুন ত, এই অনিত্য সংসার—এখানে আর পাখির বাসা তৈরী করে হবে কি?'

প্রশ্নটা শুনে দীননাথ খুব হেসেছিলেন প্রথম। অতঃপর শান্ত গম্ভীরভাবে বলেছিলেন: 'হবে না কিছুই। তবে, পাখির বাসা মানুষের বাসা যাই বলেন না কেন অমিতবাবু,—তৈরী যে করলেন এইটেই ত এক স্যাটিস্‌ফ্যাকশন্। এই তৃপ্তিই বা জোটে ক'জনের কপালে ভাবুন ত? সচ্ছল সঙ্গতিসম্পন্ন হলেও কি আর তা পেতে পারে সবাই? তা-ছাড়া নিজের কর্মক্ষমতা, তথা নিজেকে কোনো-কোনো দিক থেকে চেনবার জানবারও যে এই একটা বিশেষ অপর্‌চ্যুনিটি, —তা কি আপনি স্বীকার করেন না অমিতবাবু?'

অমিত ভেবে দেখেছিল, কথাটা সত্য-ই।

কিন্তু হাইকোর্টের এটর্নি মিঃ কালিপদ বটব্যাল কেন তাঁর ভবানীপুরের বাড়িটা শিবানীর মধ্যস্থতায় সামান্য একটা দামের বিনিময়ে যেন অমনিতেই তাকে দিয়ে দিতে চাইছেন—এ ব্যাপারটাই বড় রহস্যজনক মনে হচ্ছিল তার! দীননাথের কাছে যেমন সব কথা বলে তেমনি এটাও সবিস্তারে বলতে চেয়েছিল সেদিন, কিন্তু পারল না—গোপন রাখল। আরো এই জন্যে, রহস্যটা নিজেই উদ্‌ঘাটন করতে চায় নীরবে।

কিছু দিন পর, এক বৈকালে।

সুপ্রিয়া এল বেড়াতে শিবানীর ওখানে। তারপর দেখা করল অমিতের সঙ্গে। একটা সংবাদ এনেছে নূতন। বললে; তার জয়পুর কলামন্দিরের বন্ধু যমুনা এসেছে কলকাতায়, আছে জাষ্টিস্‌চন্দ্রমাধব রোডে কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়ি। একবার আসতে চায় অমিতের এখানে, কবে কখন সুবিধা হবে জিজ্ঞেস করল।

'বেশ কালকেই নিয়ে এস সকালের দিকে, আমি ঘরে থাকব।' বলে অমিত জিজ্ঞেস করে: 'তুমি কি এখন গাড়ি নিয়ে এসেছ?

'হ্যাঁ'—সুপ্রিয়া বলে: 'যাবেন নাকি কোথাও? চলুন, কাজ সেরে ঘুরে আসবেন আমাদের বাড়ি। অনেক দিন ত যাননি।'

'চল'—অমিত বললে। দুজনেই উঠে বসল গাড়িতে।

গাড়ি চলছে।

'আপনাকে ত আর শিবানী দিল না অন্য কলেজে কাজ করতে'—কথা আরম্ভ করল সুপ্রিয়া : 'আশাকরি ওর স্কুলের কাজ ভা-ই লাগছে আপনার।'

'বেশ, ভালই ত।' সংক্ষেপে জবাব দেয় অমিত।

'আপনি নাকি লাইব্রেরির কাজটাও নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন আজকাল, আর তাই না, স্কুলের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে একসাথে হাজার কয়েক টাকা পেয়ে গেছে শিবানী। ঐ টাকায় লাইব্রেরি-রুম হচ্ছে আলাদা,—সঙ্গে হেডমিস্ট্রেসের একটা চেম্বার নতুন প্যাটার্ণের শিগগিরই তৈরী হচ্ছে। ছাত্রী-সংখ্যা বাড়ছে—বিশেষকরে কলকাতার বাইরে থেকে আসতে চায় অনেক—অথচ তাদের এখানে থাকার সুবিধা নেই ; ঐজন্যে একটা হোষ্টেলবিল্ডিং তাড়াতাড়ি দরকার—তাও নাকি তৈরি হবে। ক্রমশঃ এইভাবে আরো অনেককিছু হবে শুনলাম। বাস্তবিক নূতন কিছু গড়ে তোলার কাজে ওর আশ্চর্য-রকমের উৎসাহ ; আর আপনিও ত এরই মধ্যে স্কুলটার শ্রী বাড়িয়ে তুলেছেন কত!' একটু খুশির ঝোঁকেই সুপ্রিয়া আরো বলে : 'বাস্‌রে! আপনাকে পেয়ে আর আপনার কাজ দেখে শিবানীর কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। সঙ্গে সঙ্গে আমারও কত খাতির।'

চুপ করে হাসে অমিত।

'সেদিন দিবাকরবাবুকে নিয়ে শিবানী এসেছিল আমাদের ওখানে,'—সানন্দে আরো নূতন তথ্য যোগ করে সুপ্রিয়া : 'ওদের মধ্যে কথা হচ্ছিল, শিবানীকেই বলছিলেন দিবাকরবাবু খুব সিরিয়াস্‌লি, তোমরা অমিতবাবুকে পার্মানেন্ট্‌ করেছ ভালকথা। কিন্তু তোমাদের ঐ স্কুলের টিচারদের যা ইউশিয়্যাল্‌ স্যালারি সে ত আর একজন আর্টিস্টের যথোচিত রিমিউনারেশন্‌ হতে পারে না ; এ বিষয় তোমরা একটু বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখো। কাশ্মীরী-শাল যেন শেষপর্যন্ত গা মুছবার বস্ত্রখণ্ডে পরিণত না হয়। আমরা তাঁর এইকথা শুনে খুব হাসলাম বটে, কিন্তু তিনি তখনও গম্ভীর। জিনিসের যে যথোচিত কদর করতে হয় সেটাই শান্ত গলায় বুঝিয়ে দিলেন। শিবানী এ সবই মানল। বললও : অমিতবাবুর মাইনে অন্যদের তুলনায় অমনিতেই বেশি আছে এখন, তবে আমাদেব স্কুলে সংগীতবিভাগ খোলা হলে আরো বাড়িয়ে দেওয়া হবে, এ-প্রস্তাব অনেকআগেই রিজল্যুশনে পাস্‌ করিয়ে রেখেছি আমি। তাছাড়া শিগগিরই উঁচুদরের একটা গ্র্যান্ট পাব আমরা ঐ মিউজিক-ক্লাসের জন্যে ; এবং এটা সম্ভব হচ্ছে—অমিতবাবুকে এই মুহূর্তে পার্ম্যানেন্ট্‌ টিচার হিসাবে দেখানো যাচ্ছে বলেই। দেখুন সব রকমের নিয়মকানুন ওর নখদর্পনে, আর কেমন পাকাবৈষয়িকবুদ্ধি মেয়েটার!'

'কিন্তু দিবাকরবাবু অত্যন্ত sober সুবিবেচক।' মন্তব্য করল অমিত।

'হ্যাঁ যা বলেছেন।' একটু থেমে কি যেন ভাবল সুপ্রিয়া, আবার বলল : "আপনি দেখবেন দিবাকরবাবু কিন্তু ঠিক ফেঁপে ওঠা চলতি বড়লোকদের মত নন, প্রাচীন কলকাতার প্রতাপশালী বনেদী বংশজ এঁরা। এঁদের পরিবারের কত অভিজাত্য কত সুখ্যাতি, এটা শিবানীর নজরেই পড়ে না! সে যজ্ঞেশ্বরবাবুর নামে আত্মহারা—এনিয়ে কথা কাটাকাটিও হয় খুব। আশ্চর্য, তাঁর সাথে আবার মাঝেমাঝে দিবাকরবাবুরও তুলনা করে কিনা – দিবাকরবাবু প্রায় নীরবে সহে যান সব কিছু! তা দেখে বড় হাসি পায়, দুঃখও হয় আমার ভাবিও অনেক সময় যে, এমনি বিপাকে পড়েই কি মানুষের জীবনে সহনশীলতা গড়ে ওঠে তা কে জানে—বলুন দিকিন আপনি?'

সুপ্রিয়ার প্রতিটি কথা অমিত নিরুত্তরে শুনে যাচ্ছিল···

মহাকালীব্যাঙ্কের ম্যানেজিংডাইরেকটার যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে ব্রাইট্‌স্টারব্যাঙ্কের এজেন্ট্ হয়ে—গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুর। তারপর ঐ ব্যাঙ্ক ফেইল পড়বার বেশ কিছুদিন অগেই অবস্থা বুঝে কলকাতায় ফিরে এলেন হঠাৎ। শুরু হল তাঁর চাউলের ব্যবসা। লাভ হল বিস্তর;—এর পরিণতিতে অত্যন্ত অমায়িক আর জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি। আরো নানা রকমের (সব সুপ্রিয়ার জানা নেই) ব্যবসা ফাঁদলেন এখানে-সেখানে, শেয়ারমার্কেটে নাম লিখলেন এবং দেখতে-দেখতে আলিপুর সদর রাস্তার উপর এক শুভদিনে তাঁর মহাকালীব্যাঙ্কের দ্বারও উদ্‌ঘাটিত হল। কলকাতার গণ্যমান্য বিশিষ্ট সজ্জনরা উপস্থিত থেকে যজ্ঞেশ্বরবাবুকে নানাভাবে অভিনন্দিত করলেন। পৌরসভার সদস্য হয়ে রাতারাতি বাড়ি ঘরের উন্নতি হল তাঁর।···এর পরেই ওঁর স্কুল-প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমশ শিবানীর সঙ্গে পরিচয়। শিবানী দেখল : অতি আধুনিক এ্যামেরিকান প্যাটার্ণে মস্তবড় চমৎকার বাড়ি তৈরী করিয়ে আলিপুর খাঁটি অ্যারিস্টোক্র্যাট্‌দের পাড়ায় বাস করছেন যজ্ঞেশ্বর। এই আধুনিকতার চাকচিক্য প্রাচীনের গাম্ভীর্যকে ম্লান করে তোলে, বোধহয় উপহাসও করে। শিবানীর ভাল লাগল যজ্ঞেশ্বরের বাড়ি-ঘর-দোর সব কিছু। দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাড়িতে সে গেল একদিন। তখন শিবানী থাকত হরিতকীবাগানের কাছে বিডনস্ট্রীটে একটা ভাড়াটে বাড়িতে। দিবাকরেরই পরামর্শে সে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে এই আলিপুর মাইল ছয়েকের রাস্তা গাড়িতে এসে রোজ নিয়মিত স্কুল করে যেত শিবানী। যজ্ঞেশ্বর তাই দেখে সহানুভূতিতে বলেছিলেন : 'আপনাকে আমি এখানেই ভাল কোয়ার্টার দিচ্ছি—এসে থাকুন না।'

'বেশ, আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলুন'। —তাই দিবাকরকে শিবানী নিয়ে এসেছিল যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়িতে। আসবার তেমন কোনো ইচ্ছা ছিল না, তবু এলেন তিনি শিবানীর জন্যই। …যজ্ঞেশ্বরের বিপুল ঐশ্বর্য দেখে ঐশ্বর্যপতি দিবাকরও বিস্মিত হলেন, ঈর্ষায় নয়—সংশয়ে।

যজ্ঞেশ্বরবাবুই গল্প করছিলেন সরল মনে : যজ্ঞেশ্বর আর রত্নেশ্বর দুই ভাই। বড় অভাব অনটন আর দুঃখের মধ্যে মানুষ হয়েছেন ওঁরা। সমাজে অবহেলিত বলে বাপের মনে তীব্র ইচ্ছা জেগেছিল, তাঁর ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক। যজ্ঞেশ্বর মাইনর পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন কলকাতায়—পরীক্ষা আর দেওয়া হল না, একটা চাকরিতে ঢুকলেন, অফিস-বেয়ারার্-এর কাজ—পাঁচটাকা মাইনে। তখনও বোধ করি দেশে পঞ্চমজর্জের রাজত্ব শুরু হয়নি—সপ্তমএডোয়ার্ডই রাজা আমাদের। সেদিনে মাসে পাঁচটাকা রোজগার কম নয়। এক দিকে চাকরি আছে তবু এরই মধ্যে বই পত্র জোগাড় করে বড় কষ্টে পড়াশুনায় মন দিলেন তিনি। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে একদিন প্রবেশিকাও পাশ করলেন—একেবারে ফার্স্ট ডিভিশন। এতদিন বছরের পর বছর কাজ করেছেন, অফিসের বড়কর্তার দেখা পাননি কখনও। এবার সোজা ডাক পড়ল তাঁর চেম্বারে,—দরজায় নেইমপ্লেট ঝুলছে : মিঃ নবকুমার বসু, ম্যানেজিং ডাইরেকটার। পরিচয় হল। —সুপ্রিয়ার তখনও জন্ম হয়নি—এ সব খবর সে জেনেছে পরে তার বাবা নবকুমারবাবুর মুখে। —যজ্ঞেশ্বরের দীর্ঘ সুডৌল গৌরাঙ্গ তখন সদ্যস্ফুটতারুণ্যে ঝলমল, দেখতে সিনেমার নায়কদের মত বেশ রোম্যান্টিক। কথাবার্তায়ও ধীমান খুব – এইটে বুঝেই নবকুমার খুশিমনে তাঁকে বসিয়ে দিলেন একটা কাউন্টারে। সেদিনই ব্রাইট্‌ষ্টারব্যাঙ্কের ক্লার্ক হলেন যজ্ঞেশ্বর, আর বুদ্ধিরজোরে তাড়াতাড়ি কাজ শিখেনিয়ে এজেন্ট্ হয়ে পাড়ি দিলেন সিঙ্গাপুর। এইভাবেই কাজে লেগে থেকে যজ্ঞেশ্বরবাবু তৈরি করেছিলেন তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র। —বললেন : 'হ্যাঁ, আমার ছোটভাই এম্ এ পাশ করে বাবার ইচ্ছাটা পূরণ করেছে, আপনাদের বনেদী কুলীন মিত্তিরের মেয়ের সাথে বিয়ে হয়েছে তার। কিন্তু আমার আর কিছুই হল না দিবাকরবাবু।'

দিবাকর ত হতভম্ব।

কে বলবে, যজ্ঞেশ্বরের কিছু হল না। এই ত আজ কলিকাতা শহরে তাঁর এত অর্থ, এত যশ, এত প্রতিপত্তি। যজ্ঞেশ্বরবাবুকে কে না চেনে,—একজন স্বনামধন্য এম্-এল্-সি তিনি। তবু বিনয়ে নম্র হয়ে আছেন যজ্ঞেশ্বর।

দিবাকর দেখছিলেন, যজ্ঞেশ্বরের চোখ দুটো সুন্দর বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নাসিকা অতিরিক্ত রকমের উন্নত ও বক্র —চিক্কণ ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ঈষৎ কপট হাসি সর্বক্ষণ

জড়িত। নিঃসন্দেহে যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক অসামান্য বিচক্ষণ। দেখে দেখে দিবাকর বিভ্রান্ত হয়ে বোবার মত চুপ করে রইলেন শুধু।

'আমার বাগান বাড়িটা স্কুলের জন্য ছেড়ে দিয়েছি শুনেছেন হয়ত।'—যজ্ঞেশ্বর এই নীরব পরিবেশকে সহজ করার উদ্দেশ্যে কথা তুলেলেন নিজেই। তারপর দীর্ঘক্ষণ শিবানীর প্রশংসা করে সর্বশেষ জানালেন,—এই মেয়েদের স্কুল যথার্থভাবে সার্থক রূপ নেবে যদি এবার স্কুলহেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌ মিসেস্‌ মুখার্জি স্বয়ং এখানেই চলে আসেন। বাগানবাড়ি সংলগ্ন কিছুটা ফাঁকাজমি আর প্রায় বড় রাস্তারই ধারে একতলা ছোটবাড়ি আছে, তা তিনি শিবানীর বসবাসের জন্য দিয়ে দিতে চান। এখন এ বিষয়ে দিবাকরবাবুর কি অভিমত।

যজ্ঞেশ্বর তখনও আজ্ঞাবাহী জনসেবক-স্বরূপ বিনম্রভঙ্গীতে দিবাকরের সামনে উপবিষ্ট। —দিবাকর বিব্রত বোধ করলেন। কেন জানি এ ব্যক্তিটির সাহচর্যের মধ্যে কোনো মহৎশুভইঙ্গিতের আশ্বাস পাচ্ছিলেন না তিনি। মোটকথা ভাল লাগছিল না তাঁর। অথচ, শিবানীকে বাধা দেন কি করে! সে ত আর তাঁর কথা রাখবে না কখনও। কাজেই, এখানে নির্লিপ্ত উদাসীন থাকাটাই সমীচীন মনে হল তাঁর।

যজ্ঞেশ্বরের কথায় দিবাকর প্রকাশ্যে কোনো আপত্তি তুললেন না, উৎসাহও দেখালেন না তেমন কিছু। —দিবাকর সম্পূর্ণ নীরব।

এই মৌনতাকেই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়েঃ 'বেশ,'—হিল্লে লিয়া উঠলেন যজ্ঞেশ্বর; করজোড়ে দিবাকরকে সবিনয়ে বললেনঃ 'আপনি তাহলে অনুগ্রহ করে আসবেন ত? আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। বলতে সাহস পাইনে,—নিজেদের মনে করেই চলে আসুন আর কি? এ সমস্ত তো আপনাদেরই।' হাত বাড়িয়ে ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ করলেন।

একজন বিশিষ্ট এম্‌-এল্‌ সি-র এবং কতকটা বয়োজ্যেষ্ঠরও অনুরোধ।

দিবাকর আর কি বলতে পারেন!

—শিবানী এল।

পরে দিবাকরও আসেন যান। এই তো।

সুপ্রিয়া যা যা জানত, অমিতকে খুলে বলল সব। ঐ সঙ্গে ফের মনে করিয়ে দিল তার আগের প্রশ্নটাঃ 'মানুষের জীবনে ধৈর্যের শিক্ষা কি ঘটে শুধু শুধু সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরেই?'

'নিশ্চয়। দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়েই তো আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। সুখের ভিতরে তা হয় না। বিপদ বা দুঃখের মুখ যে দেখেনি কখনও, তার

জীবনে ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা লাভের শিক্ষা আসবে কী করে, বল? আর সহিষ্ণুতা যার যত বেশি তিনি তত মহান—একথা ত আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তোমার বক্তব্যের বিষয়বস্তুটি যে অন্য'—বলে অমিত চুপ করে ভাবতে লাগল। তার অল্প বয়সের বুদ্ধিতে সে এইটুকুই জানে, কোনো মানুষেরই জীবন, দেহ, মন এ-সমস্ত কিছু শূন্য থেকে আচমকা গড়ে ওঠে না—এ সব অনেকটা ভূমিজাত। মাটিতেই জন্মেছে—মাটিতেই মিশে যাবে একদিন। কাজেই মাটির ওপরে যে রকমের বীজ ছড়ানো যায় তার ফসলও জন্মায় সেই রকমের। এখন এই জন্মানো ফসলের কৃতিত্বটা কি সম্পূর্ণভাবে মাটিরই—না বীজেরও? —এই সবের সুষ্ঠু বিচার, শান্তস্থির ও অভিজ্ঞজনের চিন্তাশক্তির দ্বারা সম্ভব—এবং তারজন্য অনুকূল পরিবেশও চাই। কাজেই অমিত এক্ষেত্রে গাড়ির মধ্যে বসে বসে চলার পথে সুপ্রিয়ার প্রশ্নের জবাবে শুধু বললে: 'তোমার প্রশ্ন বড় কঠিন ও জটিল, সুপ্রিয়া। তবে ব্যক্তিগত environment এবং heredity-র প্রভাব বোধকরি কেউই সহজে এড়াতে পারেন না—শিক্ষা, কৃষ্টি এই সমস্ত ত হল বাইরের একটা পোষাক মাত্র!'

এ-নিয়ে আর আলোচনা চলল না বেশিক্ষণ। গাড়িটা যে সুপ্রিয়াদের বাড়ির দুয়ারে এসে পৌঁছে গেছে।

'ওমা! মামাবাবু এসেছেন দেখছি!' সুপ্রিয়া বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল।

'কে? দুর্গপ্রসাদ এসেছে বুঝি!' —অমিতও সোল্লাসে কথাটা বলতে বলতে গাড়ি থেকে নেমে হাত ধরল দুর্গাপ্রসাদের।

হাইকোর্টের কি এক মামলার ব্যাপারে আজ অকস্মাৎই উকিল দুর্গাপ্রসাদের এই কলকাতায় আগমন। তা আগে কারোর কিছু জানা ছিল না।

দুর্গাপ্রসাদও অমিতকে পেয়ে খুশি, বললে: 'আজ রাত্রে ভাই, এখানেই থাক—কোথাও যেতে পারবে না।'

শোবার ঘরে বসে আহারাদির পর এ-কথা সে-কথা চলছে দুই বন্ধুতে।

সুপ্রিয়াও আছে সেখানে।

'আচ্ছা বল ত'—হঠাৎ খানিকটা সংশয় নিয়েই অমিত কথা তুললে: 'কলকাতায় নিজে বাড়ি করে থাকার জন্যে মিসেস মুখার্জি আমায় কদিন যাবৎ বড় চাপ দিচ্ছেন কেন, সুপ্রিয়া?' —প্রসঙ্গত, সম্প্রতি শিবানী তাকে একদিন গড়পাড়রোডে নিয়ে গিয়েছিল—এ কাহিনীও সবিস্তারে বর্ণনা করল অমিত।

'কী! বটব্যালের বাড়িতে আপনি গিয়েছিলেন শিবানীর সঙ্গে? প্রশ্ন করেই ভ্রূযুগল কুঁচকাল সুপ্রিয়া। ...এই বটব্যাল-পরিবারের সঙ্গে যে

শিবানী নানা স্বার্থে জড়িত, খুব দহরম-মহরমও ওদের সঙ্গে শিবানীর—এসব খবর সুপ্রিয়ার জানা। …তাইবলে, অমিতকে ওদের ঐখানে কেন নিয়ে যাবে শিবানী—কী অভিসন্ধি ওর ?

সুপ্রিয়া বিরক্ত হল খুব। মনে পড়ল তার,—অনেকদিন আগে কবে যেন শিবানী ওকে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, 'আমাদের বিউটিকে যদি অমিতবাবুর গলায় ঝুলিয়ে দিই—কেমন হয় বল দিকিন !' …বিউটি ওর স্কুলের স্টাফদের মধ্যেই একজন, তাই কথাটা তেমন বিশ্বাস করতে পারেনি সেদিন সুপ্রিয়া, হাসতে-হাসতেই উড়িয়ে দিয়েছিল। …কানাছেলের নাম যেমন পদ্মলোচন হয়, তেমনি বটব্যালমশাই তাঁর এই একমাত্র কন্যাটির নাম রেখেছিলেন সুললিতা। বাড়িতে ডাকতেন 'বিউটি'। শিবানীও ওকে আদর করে বিউটি বলত।

গাটা রি-রি করে উঠল সুপ্রিয়ার।

তাহলে কি ঐ বিউটির জন্যই বটব্যালের যোগসাজশে কোন বিশেষ চক্রান্ত চালাচ্ছে শিবানী ? যদি সত্যি হয়, তবে ত ভাল নয়। সুললিতার যে রীতিমত দুর্নাম আছে ভদ্রসমাজে ! অমিতকে এক্ষুনি সাবধান করে দেওয়া দরকার। না, থাকগে, অমিত আবার কী ভাববে জানি ! তার চেয়ে, সে নিজেই খুব সতর্ক নজর রাখবে এদিকে।

মনকে প্রবোধ দিয়ে সংযত করল সুপ্রিয়া, শান্তগলায় বললেঃ 'শিবানীর প্রস্তাবটা খারাপ কিসের ? জমি যখন আপনাদের একটা আছেই কলকাতায়—বাড়ি করে ফেলুন সেখানে। আমিই ভাবছিলুম, আপনাকে তা বলব একদিন। তাছাড়া এ-স্কুলের কাজেও ত আপনি স্থায়ীভাবেই বহাল হলেন।'

'তাই নাকি !' দুর্গাপ্রসাদ খবরটা জেনে খুব খুশি হলঃ 'বন্ধু তাহলে তুমি তোমার নঙ্গর ফেললে কলকাতায় ! গু-ড, ভেরি গুড্।'

'আচ্ছা মামাবাবু,"—সুপ্রিয়া বলেঃ 'তোমার ত জানাশোনা লোক আছে কত,—ওঁর বাড়িটা তৈরি করিয়ে দিতে পার না ?'

'O. K. আমি এক্ষুনি এর ব্যবস্থা করছি।' —বলতে বলতে দুর্গাপ্রসাদ সোৎসাহে কক্ষান্তরে গিয়ে টেলিফোন নিয়ে বসল।

'আঃ বাঁচালে সুপ্রিয়া, বাড়িটা এবার না হয় এই সুযোগে করিয়েই নিই—কি বল ! কিন্তু'—অমিত কী যেন ভাবতে থাকে।

'আপনি ব্যস্ত হবেন না। বাড়ি করার বিষয় নিয়ে শিবানীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার। আমার উপরে ছেড়েদিন,

আমিই দেখব ও-সব।' অমিতের চিন্তার উপর পূর্ণচ্ছেদ টানল সুপ্রিয়া।

হাল্‌কা হল অমিতের মনটাও—হাসতে হাসতে বলে: 'দেখ, তোমার বন্ধুটি যেন আবার চটেমটে না যান। আরেকটা মজা কি জান, আমাদের জমির কথাটা কিন্তু ওকে এখনও জানাইনি কিছু।'

হাসে সুপ্রিয়াও। বলে: 'ঠিক আছে—ওসব আমি ওকে বুঝিয়ে বলব খন। উঠুন, এবার ও-ঘরে যাই। শুনি গে, মামাবাবুর ডিসিশান্ কি!'

পরদিন সকালেই অমিতের সঙ্গে সুপ্রিয়া আর যমুনাকে দেখল শিবানী।

যমুনার সঙ্গে আলাপ হল কিছু কিছু।

এবার নূতন এক হুজুক চেপেছে শিবানীর মাথায়। তাঁর স্কুলে বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরনী-উৎসবে যে গান হবে তার সঙ্গে নাচের ব্যবস্থা চাই। অমিত বলছিল: যমুনা সুপ্রিয়ার পুরনোবন্ধু, নাচে ভালো, শেখাতেও পারে অন্যকে। তাহলে ওর কি সাহায্য পাওয়া যাবে না কিছুদিনের জন্যে? অমিতেরই পরামর্শ মত সুপ্রিয়ার শরণাপন্ন হয়ে শিবানী ধরে আনল যমুনা জাবেরীকে।

সভার মধ্যে নাচগানের সাফল্যে হাতে-হাতে দর্শকমণ্ডলীর কাছ থেকে স্কুল-টীচাররা অসম্ভব রকমের প্রশংসা পেলেন. সংবাদপত্রের রিপোর্টাররাও কাগজে কাগজে লিখলেন খুব,—বিশেষত হেডমিস্ট্রেস শিবানীর জয় জয়কার চারদিকে। তাঁর দূরদর্শিতায়—সর্বজন পঞ্চমুখ। মোটেরউপর এইসূত্রে স্কুলের নাম খ্যাতি বাড়ল আরো অনেকখানি। কাজেই, এরপর যমুনাকে আর শিবানী ছাড়ে কি করে এত সহজে!

যমুনা ভাটিয়া বণিকের কন্যা। সেই যে কলকাতা এসেছিল, আর দেশে ফিরে যায়নি। ওর বাবা এলগিন রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়ে এখানেই ব্যবসার কাজে লেগেছেন। কিন্তু কেন জানি, যমুনার বাবা ওকে শিবানীর কাছে আবার পাঠাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন!

শিবানী ছাড়বে না কিছুতেই। সে নিজে বলেছিল, এবার সুপ্রিয়াকে দিয়ে বলালো, তাতেও যখন ফল হল না তখন ধরল অমিতকে।

'কী দরকার ওকে এনে শিবানীদি?' বললে অমিত: 'বাদ দিন্।'

কথা শুনল না শিবানী, বললে: 'না, আপনি নিজে একটি বার যান, মাষ্টার মশাই।' কণ্ঠস্বরে তার স্নেহময় আদেশ আবদার দুই-ই জড়ানো।

যমুনা অমিতের ছাত্রী। অমিতকে দেখে তারা আর কিছুতেই পারলেন না আপত্তি করতে। শুধু যমুনাকে নয়,—স্কুলের জন্য বেশ মোটা রকমের ডোনেশানও

যমুনার বাবার কাছ থেকে সংগ্রহ করে হাসতে হাসতে ফিরে এল অমিত।

আর, শিবানী নিজে ড্রাইভ করে সেদিনই প্রথম অমিতকে সঙ্গে নিয়ে বেরুল সিনেমায়।

যমুনা আলিপুর গার্লস-ওউন-একাডেমির নৃত্যশিক্ষিকার পদে অভিষিক্ত হল।

সকলে দেখলেন, যমুনা যেন অমিতের সঙ্গ মোটেই ছাড়ে না। নাচ শেখাবার যাবতীয় পরামর্শ সে আগে অমিতের সঙ্গে করে নেয়, তারপর শেখাবার কাজে হাত দেয়। সপ্তাহে মাত্র দুদিন স্কুলে আসে। অন্য কারুর সাথে সে মেশে না, কথাবার্তাও বলে কম। ···এ সবেতে কারুর কিছু তেমন আসে যায় না। কিন্তু ছুটির পর অমিতকেও যে নিজের প্রকাণ্ড গাড়িখানার ভিতর বসিয়ে এক সঙ্গে তাদের বাড়ি ধরে নিয়ে যায়!—ব্যাপার কি!

শিবানী এ সমস্তই নীরবে লক্ষ্য করত,—কিন্তু বলত না কিছু।

প্রথম প্রথম অমিত শুধু যমুনার সঙ্গেই যেত। কিন্তু ক্রমশঃ এর মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যখন অমিতকে যমুনার বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য রোজই ছুটির পর গাড়ি আসতে আরম্ভ করল, তখন শিবানী দস্তুরমত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।···একদিন ত যমুনার গাড়ি স্কুল ছুটির পর গেটে ঢুকতে না ঢুকতেই তা ফেরৎ পাঠিয়ে দিল শিবানী।

অমিত তা জানল না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ট্যাক্সিতে যেয়ে হাজির হল সে যমুনার বাড়ি।

'সে কি!' অবাক হয়ে যমুনা শুধালে: 'আপনার হাতে যখন কাজ ছিল মাষ্টারজী, আজ না এলেই বা কী হত? মিথ্যা ট্রাব্‌ল্‌স্ নিলেন আপনি।'

বুঝতে না পেরে অমিত জানতে চাইল: 'হাউ স্ট্রেঞ্জ! গাড়ি কি তুমি পাঠিয়েছিলে আজকে?'

'Of course'—যমুনা বলল: 'ড্রাইভার এসে আমায় জানালে, শিবানীদি নাকি ওকে বলে দিয়েছেন, মাষ্টারমশায়ের অন্য কাজ আছে স্কুলে,—আজ যেতে পারবেন না।'

এবার সব বুঝতে পেরে অমিত চুপ করে রইল খানিকক্ষণ;—তারপর এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কত না মনঃসমীক্ষণের প্রচেষ্টা—আর কী হাসাহাসি!

॥ ৭ ॥

চলতি রীতিতে কোনো বিশেষ বড রকমের প্রচার নেই,—তবু আলিপুর গার্লস্-অউন একাডেমি ধীরে ধীরে একটা কস্‌মোপলিট্যান্ রূপ নিচ্ছে, অর্থাৎ বাঙালী-প্রতিষ্ঠান হলেও কলকাতার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত অবাঙালী পরিবারের কিছু কিছু মেয়ে এসে ভর্তি হচ্ছে এখানে। খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত। এর প্রমাণ পাওয়া গেল, সম্প্রতি বোম্বে থেকে বসুমতী পারেখ নামে জনৈক গুজরাতীমহিলা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দশ হাজার টাকার একখানা চেক্ পাঠিয়েছেন হেডমিসট্রেস্ শিবানী মুখার্জীর কাছে স্কুলের ডোনেশান্ হিসাবে, লিখেছেন, ছোটবেলায় অমিত লাহিড়ীর ছাত্রী ছিলেন তিনি।

ইত্যাকার কারণে অমিতের প্রতি শিবানীর কৃতজ্ঞতা স্বভাবতই গভীর হয়ে উঠছিল—সে চাইছিল, অমিতের নাম উল্লেখে কাগজে স্কুলের একটা বড় বিজ্ঞাপন দিতে, হয়ত অমিত তাতে খুশি হবে। কিন্তু অমিত একাজে আপত্তি করে শিবানীকে বুঝিয়ে দিয়েছে, যাঁরা সময়-সময় ডোনর্ হচ্ছেন তাঁদের নাম নিউজ হিসাবে কাগজে দিন, তা-বলে অমিতের নাম জড়িয়ে স্কুলের কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়াটা ঠিক শোভন নয়। পরিষ্কার ভাবেই সে বলেছে: ‘ফুল ফোটার যখন সময় হবে তখন কলি ছেড়ে সে বেরিয়ে আসবেই—এবং সেই ফোটা ফুলের সৌরভ থাকলে—ঐ সৌরভ আপনা থেকেই বাইরে ছড়িয়ে পড়বে। সেদিনকার সেই বিজ্ঞাপনই হল যথার্থ এবং শাশ্বত।’

এই ত, মাত্র একবছরের মধ্যেই—

অমিত আর যমুনার মিলিত প্রচেষ্টায় কলকাতা রঙ্গমঞ্চে একাধিক নৃত্যগীতাদি অভিনীত হয়ে যা কিছু অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল তা দিয়ে বর্তমানে স্কুল-কম্পাউণ্ডে একটা সুন্দর হলঘর তৈরী হয়েছে। নাচগানের ক্লাশ এখানেই হয়ে থাকে। …হলের দু-পাশে দুটো চেম্বার করিয়ে দিয়েছে শিবানী: একটা সঙ্গীতশিক্ষক অমিতের, আর অন্যটা নৃত্যশিক্ষিকা যমুনার।

এ সবের পৃথক মামুলী বিজ্ঞাপন নেই, কিন্তু তা জানে শহরের সবাই।

অবশ্য যমুনা এ-সবে ভুলবার নয়। তার আজও মনে আছে: সে যে অমিতের কাছে বাংলা শিখছে পড়ছে নিয়মমত, আর অমিতও তাই যমুনার বাড়ি রোজ আসা-যাওয়া করে তা কে না জানতো? অথচ এই দৃশ্যই শিবানীর কাছে হল চক্ষুশূল।

হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল যেন।

স্কুল ছুটি হয়ে গেছে তখন। অমিত আর যমুনা একই সঙ্গে বেরিয়ে আসছিল। শিবানী ডাকল পিছন থেকে: 'মাষ্টারমশাই, আপনি লাইব্রেরির কাজে আর তেমন মন দিচ্ছেন না।' অদ্ভুত অনুযোগ! শুনে থমকে গিয়েছিল অমিত। নিজেকে সামলে বলেছিল: বই ত সবই লাইব্রেরিতে যথাযথ এণ্ট্রি করে ঠিক ভাবে সাজিয়ে রেখে দিয়েছি।'—এর পরেও যে কিছু বলার থাকতে পারে অমিত বা যমুনা কেউই তেমন ভাবতে পারেনি। কিন্তু শিবানী বলল: 'না, তবুও ঠিক আগের মত আপনাকে আর আমি পাচ্ছি কোথায়!' গলায় তার অভিমানের ক্ষীণস্বর,—অমিত তা টের পেয়ে মুখ টিপে হেসে শুধু বলেছিল: 'ও সেই কথা!' তারপর যমুনাকে ইশারায় ডেকেছিল: 'চল যাই।' তার পিছন-পিছন গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল যমুনা।

অমিতের পাশে বসেই যেন তীর ছুড়ল সে, বললে: 'এ-সব ডেফিনিটলি আগ্‌লি, ডার্টি অ্যাণ্ড আন্‌টলারেবুল্‌!' শুধু ভেঙে পড়েনি—বোধহয় বাঙালি মেয়ে নয় বলেই। আরো বলেছিল: 'ইউ নো, দিস্‌ শিবানী মুখার্জি মাস্ট বি হুয়িপ্‌ড্‌।'—চাবুক নিয়ে এসেছিল পরদিন, সংকল্প করেছিল—এই স্কুলের সঙ্গে কোনো সংশ্রবই রাখবে না আর।

কিন্তু ওকে যে দূর থেকে দেখে ফেলেছিল অমিত। ত্রস্তপদে এগিয়ে এসে পথ আগলে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অন্যত্র। তখন স্কুল চলছে পুরোদমে,—নাটকীয় সেইদৃশ্য কেউ দেখেনি তাই।

'স্কুলের কী অপরাধ যমুনা!' বলেছিল অমিত: 'এটা পৃথিবীর জিনিস,—পৃথিবীতেই থাকবে—শিবানীমুখার্জির ত নয়। আমি চাই, এইটুকুন তুমি এই সুযোগে ভাবতে শেখো। তা-ছাড়া দিনরাত এরজন্যে কত খাটছি দেখতে পাচ্ছ ত। এতে আমি আছি বলে বসুমতীও সেদিন টাকা পাঠালো বোম্বে থেকে, আর সেই টাকা দিয়েই যে বর্তমান মেয়েদের হোষ্টেলবিল্ডিং তৈরির সূত্রপাত—এসব কিছু তোমার অজানা নেই। তুমি কো-অপারেট্‌ করলে আমরা এখানে কী না করতে পারি!—ভুলে যাও, ক্ষমা কর শিবানীমুখার্জিকে। মনে রেখো, ক্ষমায়ই পরমসুখ—পরমশান্তি।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত তখন ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে যমুনা। তবু খানিকক্ষণ কী ভেবে শেষে বলল: 'অলরাইট, এবার আমাদের ফাংশনের পরেই হল-ঘর তৈরির কথা বলবেন মিসেস মুখার্জিকে। ঐ ঘরটি হলেই আমি চলে যাব কিন্তু।'

অমিত বুঝেছিল, পরিবেশটাকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না যমুনা, তাছাড়া তার বন্ধু সুপ্রিয়া তাদের পারিবারিক কোন এক ব্যাপারে বেশ

দীর্ঘকালের জন্যে চলে গেছে কলকাতার বাইরে—যমুনাও নাকি ঐদিকে যাবার জন্য মনে মনে উদ্‌গ্রীব, এমনতর ছোটখাটো ব্যক্তিগত কারণও আছে। তাই তার ইচ্ছায় কোন আপত্তি না-দেখিয়ে অতি সংক্ষেপে বলেছিল: 'বেশ ত, আগে হলটা তৈরি হোক।'

এখন হল-ঘর তৈরী হয়েছে, যমুনার চেম্বার হয়েছে তা'তে।

কিন্তু যমুনা সব সময় খুঁত খুঁজছে শিবানীর।

অমিত এ-সব টের পায়, এ-নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনা। তবে যমুনা চলে গেলে তার কাজেরধারা স্বভাবত একটু ম্লান হয়ে পড়বে এটা অমিত অনেকসময় আনমনাভাবে অনুমান করে, কিন্তু বাইরে বুঝতে দেয় না কারুকে কিছু—সারাক্ষণ স্কুলের কাজে ডুবিয়ে রাখে নিজেকে।

হ্যাঁ তার নিজের বাড়ি হয়েছে এবার।

দুর্গাপ্রসাদই লোক লাগিয়ে তৈরী করে দিয়ে গেছে সব—সুপারভাইজ্ করেছে অবশ্যি সুপ্রিয়াই আগাগোড়া। সুন্দর মাঝারি-সাইজের দোতলাবাড়ি। কম্পাউণ্ডের কিনারা ঘেঁষে চারিদিকে আছে নিম, বেল, অশ্বত্থ, আমলকি, অশোক, বটগাছের চারা—ছোটখাটো পঞ্চবটীই বটে। বৃহৎ উদ্যানের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ ফাঁকা। জায়গা ত আর কম নয়—প্রায় কাঠা দশেক হবে, সেই বড় যুদ্ধের আগেই ১৯১২ কি ১৩ সালে জমিটা সস্তাদরে পেয়ে কিনে রেখেছিলেন অমিতের বাবা। এখন অমিত ঐ জমির উপর দিনে-দিনে একটা সাত্ত্বিক শান্তিপূর্ণ আশ্রমিকভাব ফুটিয়ে তুলছে নিজের হাতে। দোতালায় ঘরখানা অমিতের নিরিবিলি। সেখানে প্রতিসন্ধ্যায় ভজন হয়—অমিত একাই কখন-বা তানপুরা কখন-বা অর্গেন নিয়ে বসে। তখন যমুনা আসে, আসে যজ্ঞেশ্বরবাবুর মেয়ে বিনতা তাদের চেনা-জানা অন্তরঙ্গ হিন্দু, জৈন, খৃশ্চান—আরো অনেককে নিয়ে। এলে পরে গানে যোগ দেয় তারাও। এই আসরটিকে এক সার্বজনীনরূপ দেবার চেষ্টা করে অমিত। শিবানী এ-সব জানে। ঐ বিশেষ মুহূর্তে সে প্রায়ই ওখানে যায় এবং তা দেখে শুনে পরিতৃপ্ত হয়, কল্পনা করে, অমিতকে যাযাবর-বৃত্তি ছাড়িয়ে তাহলে সে-ই এবার পুরোপুরি বন্দী করতে পারল! ভাবে, আরেকটা কাজ কোনপ্রকারে হাসিল্ করে নিতে পারলে কে-পি-বটব্যাল মশায়ের কাছেও তার কদরটা বাড়বে বৈ কি!

শিবানী এক ছুটির দিনে অমিতের বাড়ি গেল, পেছনে সুললিতা, বললে: 'একে একটা বাজনা শিখিয়ে দেবেন ত, মাষ্টারমশাই।'

নিজেরবাড়িরই নীচেরতলায় অমিত গানবাজনার একটা প্রাইভেট ক্লাশ

নের। ঐখানেই সুললিতা আসে সেতার-বাজনা শিখতে। একমাস যথানিয়মে লেসন্ দিয়ে অমিত দেখল, সুললিতার কোনো প্রোগ্রেস্ হচ্ছে না। হবেই বা কী করে—তার আঙুল এত স্টিক্ যে সেতারের তারের ওপর সাবলীলভাবে কিছুতেই চলতে চায় না, তাছাড়া সুললিতার সুর-তাল-জ্ঞান নেই এক বিন্দুও। এসব ত্রুটি বিশ্লেষণ না করে অমিত তাকে ভদ্রভাবে জানিয়ে দেয়, তার অন্য কাজ আছে, সুললিতাকে নিয়ে এখানে বসা তারপক্ষে আর সম্ভব হবে না, তাই সে দুঃখিত। সুললিতা স্থির করল, নিজের বাড়িতেই বাজনা শিখবে—অমিতকে নিয়ে যাবে সেখানে গাড়ি করে। অনুরোধও জানাল সেইভাবে। কিন্তু সেই অনুরোধ উইদ্ থ্যাঙ্কস্ রিফিউজড্ হয়ে যায়।

তা শুনে শিবানী ক্ষুন্ন হল খুব, এবং অমিতকে নির্জনে পেয়ে বললে: 'যমুনার ওখানে ত রোজ যান, সুললিতার বাড়িই বা যাবেন না কেন? সেও তো আপনাকে টাকা দিতে কার্পণ্য করে না।'

প্রতিবাদ বা ঝগড়া করল না অমিত। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বুঝিয়ে দিলে,—সুললিতার কিছু হবার সম্ভাবনা নেই অথচ এই ছুঁতোয় ওঁর কাছ থেকে কোনো টাকাপয়সা নেওয়া দস্তুরমত আন্‌জাস্ট্। শিবানীও নিজের ভুল বুঝল, তবু সে নাছোড়বান্দা, বলে: 'সেতার না হলে গীটার কিংবা অন্য কোন একটা বাজনা তাকে শিখিয়ে দিন প্লীজ্। দিদির অনুরোধটুকু কি রাখবেন না?'

'উঁহু—এ আপনার অদ্ভুত আব্দার!' মিষ্টি হেসে অমিত জবাব দেয়: 'কিন্তু ভাইয়ের দুরবস্থাটাও তো অনুমান করতে হয় দিদিকে।'

স্কুলে গানের ক্লাশ, নয়ত লাইব্রেরির কাজ নিয়েই অমিতের সময় কাটত বেশি। আজ বই নিতে এসে মেয়েরা ফিরে গেল; লাইব্রেরি ঘরে নাকি অমিতকে পায়নি ওরা। ···খবর পেল সুললিতা।

নূতন হল-ঘরে তখন যমুনা নাচ শেখাচ্ছে, আর অমিত ডাইরেক্‌শন্ দিচ্ছে কাছে বসে। সুললিতা তা দেখে এসে চুপি চুপি শিবানীকে বললে।

শিবানী চুপ।

দু-দিন পর যখন আবার যমুনা যথানিয়মে নাচের ক্লাশ নিতে এসেছে—সেদিনও তাই ঘটল। সুললিতা লুকিয়ে দেখে শিবানীকে খবর দিলে।

শিবানী চেয়ার ছেড়ে ধীরে-ধীরে গেল হল-ঘরে, দূরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখল: যমুনা তার পায়ের স্টেপিং বারবার ভুল করেছে,—অমিত তা শুধরে দিচ্ছে—আর মাঝে-মাঝে আঙুলের মুদ্রা, গানের কথার অর্থ

অনুযায়ী নানারকমের লাস্যভঙ্গী যমুনার হাত ধরে দেখিয়ে দিচ্ছে অমিত।

নিঃশব্দে সেখান থেকে বেরিয়ে এল শিবানী। অনেক ভেবেচিন্তে স্কুল ছুটির পর যমুনাকে আড়ালে নিয়ে অত্যন্ত নরমগলায় বললে: 'এ-ভাবে নাচ শেখাবার সময় গানের মাষ্টারমশাইকে তুমি ডেকে নিয়ে যেওনা।'

ব্যস্,—এটাই ত প্রত্যাশা করছিল যমুনা। প্রতিবাদ, তর্ক কিংবা উল্টো প্রশ্ন করল না কিছুই। নাই বা হল সে বাঙালী মেয়ে, তাই বলে কি আর নারীত্বের সুকুমার রসে বঞ্চিতা সে! দেখা গেল তারপর, যে নির্দ্ধারিত দিনে যমুনার ক্লাস নেবার কথা সেদিন আর সে এল না,—এল তার লেটারঅব্ রেজিগ্নেশান্। তা নিয়ে ছুটতে-ছুটতে অমিতের চেম্বারে গেল শিবানী: "এই দেখুন মাস্টারমশাই, যমুনার চিঠি। সে আর আসবে না।" —চিঠিখানা হাতের মুঠোয় রেখে বিমর্ষদৃষ্টি মেললে: "কী বা এমন বলেছিলুম ওকে! যাকগে, এখন ব্যস্ত আছি—পরে আপনার সঙ্গে এই নিয়ে কথা কইব।" —বলে যেমন এসেছিল তেমনি দ্রুত বেরিয়ে গেল।

অমিত নীরবে হাসল শুধু। সে ত জানতই, যে যমুনা চলে যাবে।

"কী করা যায় বলুন ত?" —রাত্রে শিবানী অমিতের বাড়ি এসে হাজির; স্বস্তি পাচ্ছে না সে, বলে: "যমুনার বাবার আবার ডোনেশান্ আছে আমাদের স্কুলে। এ অবস্থায় মেয়েটি প্রায় রাগ করে চলে গেল—বড় খারাপ দেখায়। কোনো রকমে ডেকে এনে কি একটা ফরম্যাল্ ফেয়ারওয়েল দেওয়া যায় না ওকে!" তাকাল অমিতের দিকে।

অমিত কিছু বলল না। শিবানী মন্তব্য করে: 'অবশ্যি কাজটা ছেড়ে দিয়ে যমুনা ভালই করেছে। আমাদের স্কুলে তেমন মেয়েই-বা কোথায় যে নাচ শিখবে? …তবু বোধহয় তার কাছে একবার যাওয়া দরকার—কি বলেন?'

'দেখুন আপনি ভেবে।' অমিত অলসভাবে বললে, তারপর চায়ের ব্যবস্থার জন্য উঠে গেল। ফিরে এলে শিবানী অনুযোগ করলে: 'এদিকে আবার স্কুলের মেয়েরা গোলমাল বাধিয়েছে, জিজ্ঞেস করছে যমুনাদি কেন এলেন না, কবে আবার আসবেন ইত্যাদি। বড্ড হুজুগে ত ওরা। আমি ওদের আপাতত বলে শান্ত করেছি, যমুনা ছুটি নিয়েছে কিছু দিনের—'

'কেন অনাবশ্যক মিথ্যাকথা বললেন আপনি মেয়েদের কাছে?'—অমিত এবার বিরক্তহয়েই বলে: 'ওদেরকাছে সবসময় সত্যিকথা বলাই উচিত।

আর, যমুনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারেন যদি ভালই হয়। তা নৈলে, আমায় অনুমতি দিন আমিই বলব ওঁদের সব বুঝিয়ে।'

'বেশ তাই করুন না।' —শিবানী খুশি হয়ে উঠল। তারপর চা-খাওয়া এবং সাধারণভাবে মামুলী কিছু জিজ্ঞাসাবাদ সেরে বাড়ি যাবার সময় আবার বললে : 'আর কীই বা এমন নাচতো যমুনা! সবই ত আপনার ডাইরেক্‌শনে হয়েছে!'—শিবানীর প্রতিটি কথা আজ অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয় অমিতের কাছে। নিজের অপরাধ ঢাকতে গিয়ে সে অপরাধের মাত্রা যে ক্রমশঃ বাড়াচ্ছে—এটুকু অমিত বুঝতে পারল ভালকরেই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা যেমন অশোভন, তেমনি অর্থহীনও।

ব্যস্‌ এর পর থেকেই শিবানী যেন কী রকম হয়ে গেল একটুখানি।

কিছু দিন যেতে না যেতেই,···

সুললিতাও আবার এক কাণ্ড করে বসল হঠাৎ। তা'তে অমিত পড়ল বেকায়দায়। এই খবরটাই, গান শিখতে এসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অমিতের কাছ থেকে সব যোগাড় করল বিনতা।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়িতে অমিতের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। কেননা, একমাত্র অমিতের জন্যই আজকাল কলকাতা শহরে তাঁর কন্যা বিনতার এত হাঁকডাক— বড়-বড় সার্কেলে তার সমাদর। মাঝে-মাঝে রেডিয়োতেও গান গায় বিনতা। বিনতার আব্‌দারের অন্ত নেই।

যখন-তখন এসে হাজির হয় সে অমিতের বাড়ি, শিবানীর স্কুলে। হয়ত শিবানীর সঙ্গে অমিতের কোনো কাজের বিষয় কথা হচ্ছে, এসে জোর করে টেনে নিয়ে যায় তাকে, শিবানীর মুখের উপরেই বলে : মাষ্টারমশাই ত শুধু আপনার নয় শিবানীদি, আমারও। ···কী? ···কাজের কথা? ···বেশ ত বলুন না, আপনার ত আরো টিচার আছেন—দীননাথবাবু, অবনিবাবু, কামাখ্যাবাবু ওঁদের সঙ্গে।'

প্রেসিডেন্টের মেয়ে, —তাই কিছু বলতে আর সাহস পায় না শিবানী!

অমিতের বাড়ি হল। বিনতা নিজে এসে তার ঘর দোর সব সাজিয়ে দিলে। বললে : আপনাকে দেখবার এখানে কেউ নেই—আমাকে দেখাশোনা করতে হবে। পাকা গিন্নীর মত তার কথাবার্তা। —বড়লোকের মেয়ে, সব মানায়। তার মুখে এসব কথা বিসদৃশ ঠেকে না কখনও, যদিও বয়স তার এবার কুড়ি ছেড়ে একুশ চলছে। কী করে জানি বিনতা খবর পেয়েছিল, অমিতের মশারিটা ছিঁড়ে গেছে। তক্ষুণি ঘরে এসে আলমারির

দেরাজ থেকে নূতন মশারিটা খুলে ঝি-র হাতে পাঠিয়ে দিল অমিতের বাড়ি। তার মা জিজ্ঞেস করলেন: কা'কে দিলি মশারি? বলল সব কথা। যজ্ঞেশ্বরবাবুও সামনে ছিলেন, তৃপ্তিতে হাসলেন, বললেন: বাধা দিও না ওকে কিছু করতে, বিনতার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ত আমাদের এত সব।

একদিন বড় একান্তে অমিতকে বলছিল বিনতা: দেখুন মাষ্টারমশাই, বাড়িতে সকলের কাছে 'আমায় বকুনি খেতে হয়। কারণ, আমি নাকি কর্তৃত্ব করি বড্ড বেশি। অনেক সময় ভাবি, কথাটা ঠিক কিনা। আমি কর্তৃত্ব করব কারুর উপর—সে ধৃষ্টতা আমার কোথায়! ক্ষণকাল মৌন থেকে আবার বলছিল: হ্যাঁ খোঁজ খবর নিই বটে সকলের, আমার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী; বিশেষতঃ নূতনপরিবেশের নূতনকাজে সহজে জড়িয়ে পড়তে সুবিধা পান না আপনার মতো নমস্য গুরুজন যাঁরা তাঁদের। তা নৈলে, আমার ঠাকুর আমায় ভালবাসবেন কেন,—বলুন দিকিনি মাষ্টারমশাই? বলতে বলতে বিনতা তার নিষ্পাপ শূন্যদৃষ্টি ছেড়ে দিয়েছিল অনেক দূর, চোখ দুটোও ঐ সঙ্গে সজল হয়ে উঠেছিল। সে আপনমনে বলেছিল আরো: জানি নে, এতে যদি কোন অপরাধ করে থাকি।—এইভাবে কল্পলোকের কোন্ অদৃশ্য উচ্চাসনে বসিয়ে অমিতের মনকে জয় করেছে বিনতা।

অমিত ভাবে, নারী হলেও বিনতা অগ্নিশিখার মত পবিত্র, নির্মল—সত্যই হয়ত তার সমস্ত অন্তর জুড়ে আছে তার ঠাকুরের দিব্যস্পর্শ।

এই বিনতাই আজ বলল অমিতকে: 'আমার বড়ো খারাপ লাগে, আপনি মুখ গুমরো করে বসে থাকবেন না মাষ্টারমশাই। কী আর হয়েছে এমন!'

অমিত শুধু নির্বাক তাকিয়ে চেষ্টা করে বিনতাকে চিনতে।

বিনতাও আর কিছু না-বলে নীরবে ভাবছে: তার কাকা রত্নেশ্বর প্রামাণিক একটু বড় বড় করেই বলেছিলেন যজ্ঞেশ্বরকে, 'দাদা, শিবানী তোমার অফিসে যাক্—যা খুশী তাই করুক, আমি কিছু বলব না। 'কিন্তু সে বাড়ির মধ্যে ঢুকলে আমি তোমার সঙ্গে এখানে বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকব না বলে দিচ্ছি, আমার স্পষ্ট কথা।'—কিন্তু শিবানী আসত, বাড়ির ভেতরে যেত, মিশতও সবার সঙ্গে। যজ্ঞেশ্বরের ভয়ে কেউ কিছু বলতেন না। ছোটভাই রত্নেশ্বর এ নিয়ে আর দ্বিতীয়বার কোনো ঝগড়াঝাঁটি করলেন না, স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। আর ফিরেন নি। —এইটুকু বেশ মনে আছে বিনতার, বিশেষত কাকার খুব আদরের ছিল সে। তখন একেবারে

ছোট, ভিতরের ব্যাপার বুঝবার বয়স নয়। তারপর বড় হয়ে ম্যাট্রিক দিতে গেছে বিনতা। কী কারণে জানি শিবানীর স্কুলের দুটি মেয়েকে বের করে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার হল থেকে,—টিফিনের সময় বিনতা একটা মৃদু অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনতে পেল: এইরকম আরো কয়েকটা স্কুলে যদি শিবানী মুখার্জির মত মাস্টারণী থাকে তাহলে আর ভাবতে হবে না আমাদের। দেশের মেয়েগুলোর মাথা একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে। আজকাল কলকাতায় বড় বড় লোকেরা টাকা দিয়ে হেড্‌মিস্ট্রেস পোষেন—এ যেন একটা ফ্যাশান হয়েছে। ...কথাগুলো শুনে বিনতার কান্না পেয়েছিল এবং তারপর থেকেই সে চেষ্টা করত এ-সব কথার তাৎপর্য বের করতে। কিন্তু পাবে কি করে? —বাপের কাছ থেকে ত আর কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না, —সেখানে যথার্থই যে শিবানীর মর্যাদা অক্ষুন্ন! তবে এই বিষয়ে তার মায়ের নির্লিপ্ততাটাই বড় দুঃখ দিত বিনতাকে। আজও দিচ্ছে। ...এই ত পুরো একমাসও হয়নি, একটা বিয়ে-বাড়িতে গিয়ে বিনতা শুনে এসেছে, একজন বিশিষ্ট মহিলা বলছিলেন আরো দশ জনের সামনেই: 'তোর মেয়েটাকে কি আর পড়াবার জায়গা পেলি না অমলা, —দিলি শেষ পর্যন্ত শিবানীর স্কুলে? আহা, কী আদর্শ চরিত্রই না ওর!' ...সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন ফোড়ন দিলেন: 'ও তো বাস্তবিকপক্ষে হেডমিস্ট্রেস্ হয়ে বসেছে কেবলমাত্র যজ্ঞেশ্বরবাবুর টাকার জোরে, নয় তো—' 'আরে সেজন্য কি দিয়েছি নাকি;' —বাধা দিলেন অমলা নিজে, বললেন: স্কুলের স্টাফ্ কত ভাল, জানিস্? এইত লাস্টইয়ারে ঐস্কুলেরই একটিমেয়ে ইউনিভার্সিটিতে ষ্ট্যাণ্ড করল। ভিতরের অন্যসব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা—তা কলকাতার কোন স্কুলে ত দূরের কথা, কোন কলেজেও আছে কিনা সন্দেহ! সবারউপরে নাচ-গান শেখাবার কী সুন্দর বন্দোবস্ত হয়েছে আজকাল—গিয়ে দেখেছিস এ-সব কখনও? শিবানীর ভাল জিনিসটা তোরা কখনও দেখবিনি। কবে, কোন যুগে, কোথায় সে কি করেছিল শুধু তাই মনে গেঁথে নিয়ে বসে আছিস তোরা! আর সত্যি কথা বলতে কি, তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমাদেইর বা এত ঘাটাঘাটির প্রয়োজন কিসের বাপু! —সে কলকাতাশহরে একটা মস্তবড় হাই-স্কুল চালাচ্ছে, তার হেড্‌মিস্‌ট্রেস্—এই ত যথেষ্ট।'

'নাঃ আমার প্রয়োজন আছে ঘাটাঘাটির। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংবাদ আমাকে নিতেই হবে।' দাতেদাঁতে ঘসে আপনমনে কথাটা বলেউঠল বিনতা।

'কি ভাবছ আর বিড়বিড় করছ অমন করে?' —অমিত সুধালো।

'কৈ না,' —হঠাৎ চমকালো বিনতা, একটু ম্লান হেসে বললে: 'বলছিলাম কি, শিবানীদি হয়ত লজ্জায় আপনার সঙ্গে আগের মত মিশতে পাচ্ছেন না। তাই বলে, আপনি কেন সহজ হবেন না ওঁর কাছে বলুন দিকিন!'

'বেশ তো তোমার বক্তব্যটা কি শুনি!'

'আপনি সুললিতা বটব্যালকে আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। এতে শিবানীদির বুকে কি সামান্য আঁচড়ও লাগবে না? তাই আমি বলি অর্থাৎ অনুরোধ করছি আপনাকে, আপনি শিবানীদির কাছে একটি বার যান।'

'কেন? why?'

'বাব্-বাঃ! কী রাগ আপনারও। এখানে আপনি খাঁটি বাঙাল কিন্তু' হি-হি করে বিনতা হেসে উঠল: 'বলি মেয়েদের একটুখানি খুশি করতে দোষ কি!'

মনে মনে হাসে অমিতও, তারপর গম্ভীর গলায় বলে: 'নাঃ, ঐ সব ভণ্ডামি আমার দ্বারা হবে না। আমি পারব না।'

'বা রে:! কিছুটা ভণ্ডামি না করলে ওঁর সাথে কাজই বা আপনি করবেন কি করে, মাষ্টারমশাই?'

'ছেড়ে দেব।'

'আ-হা! আপনি বললেই আমরা আপনাকে ছাড়ব কেন?' মুখটা বেজার হল বিনতার: 'না না, আপনাকে এখানে থাকতেই হবে। স্কুলটা এত সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন মনে-প্রাণে খেটে। তা ছেড়ে দেবেন কি, এমনি এমনি? বিধাতার সংসারে ত শুনেছি মাষ্টারমশাই,—কোনো ভাল কাজই নাকি সহজে গড়ে ওঠে না। ধৈর্য ধরে তাঁর করুণার অপেক্ষা করতে হয়। আর সেই করুণাও কি যখন-তখন যার-তার অদৃষ্টে এসে জোটে?'

অমিত যেন এই সূত্রে একটা মধুর দৈববাণী শুনতে পেল। শুনে স্তম্ভিত, কিছু আর বলল না সে।

'স্কুল ছাড়তে চান! ছেড়ে করবেন কি শুনি? আগের মত শুধু বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াবেন—এই ত?' এবার বিনতা শুরু করল হিতোপদেশ দিতে:' এটা কি একটা কাজের কথা নাকি? যে দেশের জলমাটিতে আপনার জন্ম,—শত বাধাবিপত্তির মাঝখানে, সেইখানের মানুষদেরই ত গড়ে তোলার দায়িত্ব আপনার। এ দায়িত্ব-ভার আপনি নেবেন না? এতো কৃষ্টি, এতো শিক্ষা,

এতো সাধনা আপনার,—পরবর্তীদের জন্য কি দিয়ে যাবেন না তাহলে কিছুই?'

বাঃ! বিনতার কথাগুলো ভারী চমৎকার ত!

অমিত এ সবের কোনো প্রতিবাদ করল না, মুচকে একটু হাসল। কারণ, বিনতা ত আর জানে না সুললিতা বটব্যালের কীর্তির আদ্যোপান্ত কাহিনী।

…সেদিন এসে বলল, গান শুনবে সে অমিতের। নূতন হল ঘরে বসেই গান করছিল অমিত। গানের পর সুর, তাল শাস্ত্রাদি নিয়ে আলোচনা শুরু হল। জানা কথা, এসব বিষয় পেলে অমিত আলাপে মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেদিকে শ্রোতার মন আর কোথায়? কী এক অভিপ্রায়ে জানি ধীরে ধীরে নিজেকে বসালে প্রায় অমিতের গা ঘেঁষে। অমিত তা লক্ষ্য করেনি—সে ত বক্তৃতা দিচ্ছেই দিচ্ছে। হঠাৎকিন্তু,—'দেখুন দেখি মাষ্টারমশাই আমার এখানে কী যেন কামড়ে দিলে'—বলেই নিজের ঘাড়ের পিছনটা বাঁকিয়ে অমিতের চোখের সামনে এগিয়ে ধরল। সেখানে হাত ছুঁয়ে পরখ করতে না করতেই চুলের খোঁপাটা খসে পড়ল সুললিতার,—আর অমনি আর্তস্বরে বলে উঠল সুললিতা: 'উহুঃ-আহ্, আপনি কি অভদ্র অমিতবাবু, মেয়েদের সম্ভ্রম জানেন না রাখতে। ওদের চুলে হাত দেন!' একথা বলতে বলতে নিজের গাত্রাভরণকেও অদ্ভুতভাবে স্বচেষ্টায় বেসামাল করে দিয়েছিল সে। তাই না অমিত সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে শাসিয়েছিল: 'বেরিয়ে যান এক্ষুণি আমার এখান থেকে। কী দরকারে এখানে আসেন?' —সুললিতার দুই একটি স্তাবক নাকি বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল তখন, ওরাই লতায়-পাতায় জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লাগাল সব শিবানীর কানে।

এত সব ঘটনা আজ বিশদভাবে বর্ণনা করে অমিত বলে: 'বুঝলে বিনতা এই ধরনের জঘন্য কাণ্ড করেছিল সুললিতা সেদিন।'

বিনতা নিস্তব্ধ।

অমিতও কিছু বলল না আর, উঠে দাঁড়াল।

বিনতার ফিরে যাবার সময় হয়েছিল। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে: 'আপনি এটা শিবানীদিকে জানান না কেন?' —রাগে যেন ফুলছে বিনতা: 'কী সাজ্যাতিক মেয়ে ওই সুললিতা। চেহারাও তেমনি। ওর কীর্তি জানিয়ে রাখা দরকার।'

'তোমার ইচ্ছা হলে তুমি জানাতে পার।' —গেটের সামনে এসে অন্যমনস্কের মত কথাটা বলল অমিত।

'বেশ, আমিই বলব।' —দু'টো ঠোঁট একত্র করে সামান্য কুঁচকাল বিনতা, ভাবলে অনেক কিছু,—মেয়েদের ত স্কুল এখানে সুললিতার বিরুদ্ধে অমিতের এ নালিশ হয়ত টিকবে না। কেননা, মেয়েরা, ন্যায়হোক অন্যায়হোক মেয়েদের পক্ষই চিরকাল টেনে আসছে। এ হীনমন্যতা থেকে ত ওরা আজও নিষ্কৃতি পায়নি। কাজেই, অমিতের নালিশ সত্য হলেও তা অবিশ্বাস করেই উড়িয়ে দেবে শিবানী—তখন অমিতের আবার বিপদ। বিনতা স্থির করল তার সংকল্প, সে সুললিতাকে ঠিক-ঠিক শাস্তি দেওয়াবেই। তারপর অমিতকে নিয়ে নিজেই যাবে শিবানীর কাছে একদিন। বললে: 'দেখবেন, আপনি ওঁর সাথে দেখা করতে গেছেন খবরটা শুনলেই কত খুশি হয়ে ওঠেন উনি, তখন আপনার পক্ষ নিয়ে কথা বলতে তাঁর আর আটকাবে না-কিছু। আপনি ত এসব বোঝেন না মাষ্টারমশাই। চাকরি করতে গেলে এ বুদ্ধিরও দরকার।' একটু হেসে অনুনয় করল: 'বলুন, যাবেন তখন?'

উপায় নেই কিছু না বলে,—তাই: 'আচ্ছা আচ্ছা যাওয়া যাবে।' ঝোঁকের মাথায় জবাবটা দিয়ে বিনতাকে তার গাড়িতে তুলে দিল অমিত।

॥ ৮ ॥

ট্রেনে কাশী যাচ্ছিলেন দিবাকর।

আজকাল ব্রহ্মময়ী আছেন সেখানে। অদিতিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, রেখে আসবেন তাঁর মায়ের কাছে। কলকাতায় শিবানী থাকলেও মেয়ের শিক্ষার উপর তেমন কোনো নজর দেওয়া হচ্ছে না—দিবাকরের মনের এই বিশ্বাস।

ঐ ট্রেনের ফার্স্টক্লাসের একই কামরায় উঠেছেন দিবাকরের বাল্যবন্ধু কৃষ্ণপদ,—যাবেন বর্দ্ধমান। কৃষ্ণপদ, এটর্নী কালিপদ বটব্যালের অনুজ। তিনিও হাইকোর্টের উকিল। মেজাজটা অত্যন্ত সেকেলে—খোলাখুলি কথাবার্তায়ই অভ্যস্ত। তাই নানারকম কথাবার্তার মাঝখানে কোনো ভণিতা না করে সহসা একটা প্রশ্ন করে বসলেন বন্ধুকে: 'আচ্ছা, আলিপুরে যে বাড়িতে তোরা আজকাল আছিস—এটা কি নিজেরই?'

থমকে যান দিবাকর, সবিস্ময়ে বলেন: 'কেন?'

'সোজা কথায় জিজ্ঞেস করছি, বাড়িটা কিনেছিস্ কি না তাই বল।'

দিবাকর আর বলবেন কি? কারণ, এ বিষয়ে ত যজ্ঞেশ্বরবাবুর সঙ্গে শিবানীর বন্দোবস্ত। তবে ইদানীং সেখানে নূতন ঘর একটা

বানিয়েছে শিবানী, যেটা একতলা ছিল সেটাকে দোতলা করেছে বছর কয়েক আগেই নিজের টাকায়,—দিবাকরের কাছ থেকেও নিয়েছে কিছু। তাই বললেন: 'নতুন বিল্ডিং ত করা হয়েছে ওখানে নিজেরই খর্চায়।'

'আঃ!' বাধা দিয়ে কৃষ্ণপদ প্রায় লাফিয়ে ওঠেন: 'স্ত্রীকে ডিফেন্ড দিতে গিয়ে উকিলদের মত প্যাঁচ খেলাস কেন! পারবি আমার সাথে?—সোজা কথা বল, শুনি। নূতন বিল্ডিং করেছিস আর পুরোনোটাকেও বাড়িয়েছিস তা ত জানি, আর তা যে তোদের টাকায়ই হয়েছে—সে খবরও আমি রাখি। কিন্তু—এই জমিটা কি তোর?'

'শিবানীর নামে।'—অস্ফুট দিবাকর জবাব দেন।

'তার deed আছে?'—কৃষ্ণপদের প্রশ্ন।

চিন্তামগ্ন হলেন দিবাকর, তাড়াতাড়ি কিছু বলতে পারলেন না। অনেকক্ষণ পরে বললেন: 'জায়গাটা পেয়েছে যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাছ থেকে শিবানী। আর তিনিই রিটন্‌পর্মেশান্‌ দিয়েছেন সেখানে বাড়ি তৈরী করতে—মাত্র এইটুকু আমি শুনেছি ওঁর মুখে।'

'তাই বল, যজ্ঞেশ্বরবাবুর জায়গা!'—কৃষ্ণপদ অন্যমনস্ক হলেন।

'কেন, চিনতে পারলি না, যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক এম্‌-এল-সি-কে?'

'চিনেছি রে ভাই, চিনেছি। বিলক্ষণ চিনতে পেরেছি—পারব না কেন?' হাসলেন কৃষ্ণপদ, বড় ম্লান-বিমর্ষ-হাসি, বললেন: 'যখন অন্ন-বস্ত্রের অভাবে পূর্ব-পশ্চিম উভয় বাংলার লক্ষ লক্ষ সংসার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখন দেশবাসীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বেচাকেনা করেছিলেন যারা—এই যজ্ঞেশ্বরবাবুও ত তাদের মধ্যে একজন।'

খুব বেশি অবাক হলেন না দিবাকর। কেননা, এই রকমের একটা সংশয় যে তাঁর মনেও কোনোদিন জাগেনি তা নয়। শিবানীর সঙ্গেও এই নিয়ে তাঁর মনের অমিল দেখা দিয়েছে অনেকবার। চুপ করে রইলেন তিনি। আজ কৃষ্ণপদর মুখে এই লোকটা সম্বন্ধে এমন এক অকাট্য মতবাদ শুনে দিবাকর শুধু বললেন: 'তাই নাকি!'

সেদিনই রাত্রে,…অনবরতঃ বৃষ্টিপাতের পর রাস্তাঘাট সব ডুবে গেছে কলকাতার। বাইরে জল পড়া থামেনি তখনও।…

ঘুল-ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শিবানী বললে: 'আজ আর আপনার বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না দেখছি।'

'তাই তো, কী করি!'—ঈষৎ চিন্তিত হল অমিত।

'কি আর করবেন?' শিবানী বোঝালো: 'আজ এখানেই থাকুন আর কি! বৃষ্টিটা থামলে পর মোহনলাল গিয়ে একটা খবর দিয়ে আসবে না হয়।'

'বৃষ্টি থামলে আমিই চলে যেতে পারব। এই ত মিনিট কয়েকের রাস্তা।'

'না না আপনাকে যেতে হবে না এই জল ভেঙে'—হিতৈষী অভিভাবকের মতো অন্তরঙ্গভাবে শিবানী বলে উঠল: 'কিছুতেই দেব না আমি যেতে। এই ত ক'দিন আগে না একবার জ্বর হল আপনার।'

আজকাল অমিত আবার স্কুল-লাইব্রেরির কাজে ডুবে গেছে।

গত কদিন সত্যই শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না বলে অমিত বাড়ি থেকে বেরোয়নি, সেইজন্য শিবানীর আর দুশ্চিন্তার অবধি নেই। দিনে দুবার তিনবার তার খবর নিতে আসে, খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যায় নিজে এসে। তা দেখে অমিত আড়ষ্ট হয়, আপত্তি করে: 'লোক ত আছে আমার এখানে। আপনি কেন অযথা এ-সব কষ্ট করেন শিবানীদি!'

শিবানী তা শুনতে চায় না এই সূত্রে আন্তরিকতা তার পূর্ববৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অমিতের মনে পড়ে বিনতার কথা: আপনি শুধু একটিবার দেখা করুন মাষ্টারমশাই। তাহলেই দেখবেন, শিবানীদি আপনার জন্যে কি না করেন। নীরবে হাসে অমিত, চোখমেলে দেখে, বিচিত্র এই জগৎ—তারমধ্যে কত কিছু শিখবার জানবার আছে। এখানে নাকি ভাঙা জিনিসও জোড়া লাগে; জোড়া জিনিস ত ভাঙেই।...

অমিত বলছিল: 'কিন্তু এখানেই বা থাকি কি করে!'

'আচ্ছা বিপদ ত! এখানে বললাম বলে কি স্কুলে থাকতে হবে নাকি? আমাদের বাড়ি যাবেন, ব্যস্ত হবেন না।' টেবিলের 'পর হাতের পাশেই তৎক্ষণাৎ টেলিফোন-রিসিভারটা তুলে নেয় শিবানী, বৃন্দাবনকে ডাকে: 'গানের মাষ্টারমশাই আজরাত্রে আমাদের ওখানে খাবেন থাকবেন, তার ব্যবস্থা রাখবি। আর ড্রাইভারকে বলে দে আমার গাড়িটা এখানে নিয়ে আসতে।' রিসিভার রেখে শিবানী অমিতের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসে: 'কেমন, এবার ভাবনা গেলে ত?' বলেই মোহনলালকে ডেকে ছাতা হাতে পাঠিয়ে দিল অমিতের বাড়ি।

অমিত কিছু বলল না আর।

শিবানী ভালকরে বসল চেয়ারে, জিজ্ঞেস করলে: 'তারপর বলুন এবার। আমার গান ত শুনলেন। কি মনে হয় আপনার,—গাইতে পারব আমি?'

'নিশ্চয় পারবেন। সুরের উঁচু-নীচু জ্ঞান আপনার যথেষ্ট আছে। তবে সাধাগলায় গান করলে আরো ভাল শোনাবে। নিজেও গেয়ে তৃপ্তি পাবেন তখন। সময় পেলেই গলা সাধবেন মাঝে-মাঝে।'

'কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে হলেও কি গলা সাধার খুব দরকার?'

'বাঃ!' অমিত অবাককণ্ঠে জবাব দেয়: 'রবীন্দ্রনাথের গান বলে কোন আলাদা কথা এখানে ওঠেই না! গলা সাধবেন আপনি,—আপনার কণ্ঠস্বরকে অধিকতর শ্রীমণ্ডিত, সতেজ এবং স্বাস্থ্যবান করার জন্যেই। এ-কাজটা যেমন গান গাইবার বেলায়, তেমনি কথা বলার বেলায়ও প্রয়োজন। তা নৈলে, বয়স বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে গলার আওয়াজ যে অমনিতেই নিস্তেজ হয়ে আসে অনেকের,—তখন তা রোধ করবেন কিসের জোরে? আসলে গলাসাধা হল একটা শারিরীকব্যায়াম—শুধু নামের কারসাজিতে একে আমরা বলি 'কণ্ঠমার্জনা' কিংবা 'ভয়েস্‌কালচার'—তা তো আপনি নিজেই বোঝেন। তবে ঐ সব ব্যায়ামেরচর্চা সুশিক্ষিত গুরুর অধীনে থেকে বিজ্ঞানসম্মতরীতি মেনেই করা উচিত।'

শিবানী কথার মাঝখানে হঠাৎ কি কাজে উঠে গেল,—ফিরে এসে বলে: 'আচ্ছা ঐ মুলতানী রাগটা আমার যেন ঠিক আসে না, গলায় তুলে দিতে পারবেন আপনি?'

'দেখি চেষ্টা করে।'

কোনো বাজনা ছিল না সেখানে। স্রেফ্‌ খালি গলায় সুর তুলছিল অমিত, —শিবানী মনদিয়ে একমনভাবে শুনছে তাতে বেশ বোঝা যায়, এককালে গানের চর্চ্চা সে করত রীতিমত। অমিতের সুর শুনে-শুনে গাইছিল অতি সংযত কণ্ঠে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইর থেকে কলিংবেল টেপার শব্দ এল।

অমিত ও শিবানী উভয়েই উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখে ড্রাইভার ছাতা নিয়ে এসেছে। শিবানী জিজ্ঞেস করে: 'বাইরে জলপড়া থেমে গেছে নাকি লছমন সিং? বাড়ি যাওয়া যাবে ত?'

'হ্যাঁ দিদি এখন বৃষ্টি নেই। তবে রাস্তায় জল জমে আছে। আমি তাই গাড়ি বের করিনি। কিন্তু আপনারা ত হেঁটেও যেতে পারবেন না। রিকশা ডাকি একটা? ঐযে দাঁড়িয়ে আছে।'

'হাঁ তাই কর।'

বাড়িতে পা দিয়েই অমিত বললে, সে আর রাত্রে খাবে না কিছু। ভাল লাগছে না তার।

ব্যস্ত হয়ে পড়ল শিবানী : 'কেন, আবার জ্বর এল নাকি?' অমিতের গায়ে হাত দিয়ে দেখলে, গা বেশ গরম। সোজা শোবারঘরে নিয়ে গেল সে অমিতকে। বিছানা তৈরিই ছিল, শুয়ে পড়ল তাতে অমিত—কোনো অনুমতির অপেক্ষা রাখলেনা, ক্লান্তভাবে বললে : 'মাথাটা যেন ব্যথা করেছে কিছু-কিছু।'

'গরম এককাপ চা খান, দেখবেন ভাল লাগবে। আর ওডিকোলনের শিশিটা আমি নিয়ে আসছি এক্ষুণি।' বলে বেরিয়ে গেল শিবানী।

অমিত শুয়ে-শুয়ে দেখছিল, এ ঘরটিতে বিশেষ কিছু নেই—শুধু স্প্রিংয়ের গদি-আঁটা একখানা চৌকি, তার ওপর সাদা ধবধবে বিছানা পাতা, আর এককোণে ছোট একটা জাপানীফোল্ডিংঅর্গেন—তার লাগাও দেয়ালে টানানো কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের একখানা ফুলসাইজের ফোটো। মাথার উপর ফ্যানটা শিবানী খুব মোলায়েম্ ভাবে চালিয়ে দিয়ে গেছে।

শিবানী ফিরে আসতেই অমিত জিজ্ঞেস করলে : 'ঐ অর্গেনটা ব্যবহার করেন নাকি আপনি?'

'এককালে করতাম,' —সলজ্জ ভাবে শিবানী বলে : 'একজন আমায় ওটা উপহার দিয়েছিলেন। আজকাল করি না।'

শেষের কথাগুলো অমিত লক্ষ্য করল না, বললে : 'বাজান ত শুনি। আমার মাথা ব্যথাটা তাহলে সেরে যেতে পারে।'

'তবেই হয়েছে!' খিলখিল করে হেসে উঠল শিবানী : 'আমি কি আর বাজনা জানি নাকি? শিখিয়ে দেন যদি তাহলে বাজাই।'

অমিত আর অনুরোধ করল না।

শিবানী এক টুকরো সাফ্ন্যাকড়ায় ওডিকোলন ভিজিয়ে অমিতের কপালে লাগিয়ে দেয়। অমিত চুপ করে।

'আপনার কাছে বিরক্তিকর লাগবে না ত?' —বাজনা শোনাবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে শিবানী এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল : 'অর্গেনটা বাজাব নাকি? শুনবেন?'

'হ্যাঁ শুনব, বাজান।' —অলসভাবে চোখ বুঁজল অমিত। কেননা, তার ধারণা—যে-কোনো প্রকারের বাজনার শব্দই মনকে ডিভার্ট করে আর তাতে অসুখ-বিসুখেরও উপশম হয় অনেকটা।

অর্গেনের কাছে শিবানী বসল গিয়ে, নিতান্ত সরম-জড়িত-ভঙ্গিমায়। ঢাকনাটা খুলেই আবার করুণ গলায় বললে: 'আমি ত বাজাই না কখনও।'

সেই মামুলী কথা, বোধহয় মেয়েদেরই একচেটে, —অমিত তা কানে নিল না। বললে: 'ছবি আঁকতে পারলে আপনাকে আমি এঁকে নিতুম এক্ষুণি। অফিস ঘরের টেবিলে যে কাগজপত্র ছড়িয়ে বসেন, সেটা ঠিক মানায় না আপনাকে। সত্যি বলব শিবানীদি, এ দেখে এখন যেন আমার অর্দ্ধেক অসুখ সেরে গেছে।'—ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সহাস্যে বলে: 'দেখুন ত।"

স্তব কেনা ভালোবাসে? ...অমিতের মুখে প্রশংসাবাদ শুনে শিবানীর পোষাকিরূপটাও মুহূর্তের মধ্যে খসে পড়ল, স্বচ্ছন্দ ঘরোয়াভাবে বলে ওঠে শিবানী: 'তাহলে সঙ্গেসঙ্গে যদি গান করি, নিশ্চয় বাকী অর্ধেক অসুখটাও আপনার সেরে যাবে, —না?'

'করুন।' নির্লিপ্তের মত বলল অমিত।

শিবানী গান গাইল, অর্গেনও বাজাল চমৎকার। এইমাত্র বাড়ি আসার আগে স্কুলে বসে শিবানী গান করেছিল, অমিত তখন ভাল বলেছে। এবারও সে আরেকপ্রস্থ প্রশংসা করল শিবানীর; কোন এক নামকরা গায়িকার গলার মত নাকি শোনাচ্ছে—এমনটাও মন্তব্য করল অকপটে।

ঈশ্—এতো প্রশংসা! শিবানী যেন আর সামলাতে পারে না নিজেকে। নীচের ঠোঁট উল্টে বলে: 'আহা, ভারী ত আমার গলার স্বর,—তার আবার গান।'

অমিত আর কিছুই বলে না।

শিবানী শান্তভাবে এসে বসল অমিতের বিছানার পাশে: 'দেখি, এবার অসুখটা সম্পূর্ণ সারল কিনা!' বলতে গিয়ে হাসি পেল তার।

অমিতও হাসতে-হাসতে উঠে বসল, বললে: 'সম্পূর্ণ সারেনি বটে, তবে কমেছে কিছুটা। কিন্তু আপনি খেতে যাচ্ছেন না কেন শিবানীদি? রাত ত কম হয়নি।' এতক্ষণ মনে-মনেখুঁজছিল, এবার প্রকাশ্যে জিজ্ঞেস করল: 'আর দিবাকরবাবুকেও দেখছি না যে?'

'তিনি ত এখানে নেই। আজ বিকেলের মেলে গেলেন বেনারস।'

'ও'—অমিত একটু চুপ করে আবার বললে: 'তাহলে আপনি আসুন, আর বসে থাকবেন না এখানে। আমি ঘুমুই একটু।'

অন্য দিকে গাড়িতে বসে দিবাকরবাবু যজ্ঞেশ্বর সম্বন্ধে কথা যতই শুনছেন ততই আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছিল তাঁর।

কৃষ্ণপদ বলছিলেন: 'বন্ধু, একটা কথা জেনে রেখো', সততার পথ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়ীরা যখন তস্কর মনোবৃত্তির আশ্রয় নেয় তখনই আসে তাদের চরম দুর্দিন। আমার মনে হয়, এই যজ্ঞেশ্বরবাবুর জীবনেও তাই এসে গেছে।'

'কী বলিস্ তুই!' দিবাকরের কণ্ঠে অবিশ্বাসের আমেজ।

'ঐ ত বললাম বন্ধু, ধাঁধা লেগে যায় চোখে। দিনরাত্রি যেখানে মুক্তহস্তে দানদক্ষিণা চলছে, নিত্য নূতন দামী-দামী গাড়ির আনাগোনা, সেখানে কি দুর্দিন আসতে পারে কখনও! বিশ্বাসই ত হয় না, না?' বলে মুচকে হাসলেন কৃষ্ণপদ, তারপর গলার স্বরটা একটু নামিয়ে: 'অবান্তর কথা বলে তোকে আমি বিভ্রান্ত করতে চাইনে দিবাকর। আমি কোর্টে শুনেছি,—যজ্ঞেশ্বরবাবুর জমিজমা, ধনদৌলত যা-কিছু তিনি তাঁর জীবনে সঞ্চয় করেছেন সব কিছুই গোলমেলে। এখন ওসব ঢাকবার জন্যে দুহাতে শুধু টাকা ওড়াচ্ছেন তিনি। সেজন্যেই ত জানতে চেয়েছিলাম, আলিপুরে যে-জায়গায় তোরা থাকিস এর কোনো দলিলপত্র আছে কিনা। তুইত এ সবের সঠিক কিছুই বলতে পারলি নে। যাক্‌গে, এবার কলকাতায় গিয়ে তুই দাদার সাথে একবার দেখা করিস্, কেমন?'

'হ্যাঁ, আরেকটা কথা,'—আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন কৃষ্ণপদ: 'ছায়াপথ' সিনেমা হাউস্‌টার বিষয় কিছু জানিস তুই?'

'কেন জানব না?' দিবাকর এবার শক্ত হয়ে বসলেন। মনে পড়ল অনেক দিনকার আগের কথা: এই নিয়েই ত তাঁর পরিবারে গোলমালের সূত্রপাত। বাবা ক্ষমা করলেন বটে; কিন্তু শিবানী কি করে বসল! বাইরের লোক না বুঝলেও তিনি ত বুঝেছিলেন সব। তারপরেও আবার ঐ শিবানীরই অনুরোধে পড়ে কত কষ্টেই না বাবার অনুমতি নিয়েছিলেন তিনি। আজ ভাবেন, এটা না করলেই তখন ভাল হত। বললেন: ঐ জমিটা ত শিবানীর নামে আমিই কিনেছিলুম। ইদানীং কোন এক ফিল্মকোম্পানীর সঙ্গে বথা কয়ে সেখানে ঐ সিনেমা-হল্ করিয়েছে শিবানী।'

'ছিঃ ছিঃ, তুই খবর কিছুই রাখিস নে তাহলে।' অত্যন্ত ম্লান নৈরাশ্যের হাসি হেসে কৃষ্ণপদ এবার মূল তথ্য পরিবেশন করেন: 'ফিল্ম-কোম্পানী না ছাই। ঐ সবই ত যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিকের কারসাজি। বিনামা কোম্পানী করেছেন আর টাকা খাটাচ্ছেন ওতে। আইনকে ফাঁকি দেবার কতকৌশল

না তাঁর আয়ত্তে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, যজ্ঞেশ্বরবাবুর মহাকালীব্যাঙ্ক থেকে টাকা লোন্ নিয়ে ঢাকুরিয়াতে সিনেমাহল তৈরী করার কী এমন দরকার ছিল বাপু, বল্ দিকি? জমিটাও শেষপর্যন্ত হাতছাড়া হবে দেখিস্।'

'মরুক গে যাক্'—দিবাকর বিরক্তিতে বললেন: 'ওসব আর ভাললাগে না আমার। তুই অন্য কথা বল শুনি।'

…মুখে বললেন বটে 'ভাল লাগে না ওসব,'—কিন্তু কলকাতায় এসেই দিবাকর শিবানীকে সুধালেন: 'এই যে এখানে বাড়ি করছ এতো টাকা খরচ করে,—জমিটার কোনো দলিলপত্র আছে তোমার কাছে?'

শিবানী যেন আকাশ থেকে পড়ল;—দিবাকর ত এ-সব বিষয় নিয়ে কখনও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন না। তাই একটুভেবে জবাব দিলে: 'দলিল ত তৈরী করে দিয়ে দেবেন,—যজ্ঞেশ্বরবাবু অনেক দিন আগেই বলেছিলেন।'

'তা তিনি দেননি আজও, না?'

'কেন!' দিবাকরের মুখে এমনতর কথায় শিবানী বিরক্ত হল মনে-মনে, কিন্তু তা সামলে নিয়ে কটাক্ষে বললে: 'তিনি আমাদের সঙ্গে ট্রেচ্যারি করবেন বলে কি মনে কর তুমি?'

'না, আমি কিছু মনে করিনে। তবে, বাড়ি-ঘরের দলিলপত্রটা নিজের হাতেই রাখতে হয়। তাছাড়া, এত্তোগুলো টাকা—'

'ভয় নেই।' কথা লুফে নিল শিবানী, বললে: 'তোমার তবিল থেকে ত আর কিছু তসরূপ করা হচ্ছে না।'

দিবাকর হাসলেন অসহায়ের মত। দুঃখও হল খুব,—তসরূপের কথাটা তাঁর স্ত্রীর ভদ্র মনে আসেই বা কী করে! 'বংশ-দোষ, স্বভাব-দোষ নাকি না যায় মলে' এ-প্রবাদটি প্রারব্ধজীবনের তিক্তঅভিজ্ঞতায় দিবাকর ভাবতে শিখলেন। শুধু বললেন: 'তবিলটা আমার নয়,—তোমারই।' আর এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না দিবাকর।

ঢাকুরিয়া 'ছায়াপথ' সিনেমা হলের বিষয়টাও চাপা রইল তাঁর মনে।

॥ ৯ ॥

য়ুনিভার্সিটির পত্র।

স্কুলে নতুন কমিটি গড়বার জন্যে আদেশ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ, একটা বিশেষ বাঁধাসময়ের ভিতর। —জরুরী নির্দেশ। সময়টা ১৯৪৮ কি ৪৯ সালের কাছাকাছি হবে।

পত্রটি অমিতকে গোপনে দেখিয়ে শিবানী পরামর্শ চাইল : 'এখন কি করা যায় ? দেখলেন ত ব্যাপার খানা ।'

অমিতেরও ভাবনা হল খুব, জিজ্ঞেস করলে : 'অশোকাদি কি বলেন ?'

অশোকা মজুমদার এই স্কুলের অ্যাসিস্টেণ্ট হেডমিস্ট্রেস্। নিজের চেম্বারের বাইরে তাঁকে খুব কম দেখা যায়। অত্যন্ত রাশভারী—তাঁর ব্যক্তিত্বও তদনুরূপ। তাঁর সঙ্গে শিবানী কখনও কোনো কিছু পরামর্শ করে না। দরকার হলে সুললিতা বটব্যালকে ডাকে। অথচ, বটব্যাল একজন সাধারণ অ্যাসিস্টেণ্ট টিচার, —বয়সও তার অল্প। শিবানীর এই পক্ষপাতিত্ব স্কুলের যারা খুব বিশেষ পুরানো তাঁরাই জানেন। অমিত এ সবের কিছুই জানে না।

অমিতের সঙ্গে সেই ছোটখাটো গোলযোগ বাধার পর শিবানী কিছুদিনের জন্য সুললিতাকে ছুটি দিয়েছে, ছুটি পেয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছে সুললিতা। …এ কাজটা বিনতার চাপে পড়েই শিবানী করেছিল। ভেবেছিল, এই অবকাশে অমিতকে সে আয়ত্তে আনতে পারবে। এবং এনেছেও সত্যি। কোনো কাজে একটু ঘুরপ্যাচ দেখলে অমিত বিরক্তি প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সে বরাবরই শিবানীর সৎপরামর্শদাতা এতে কোনো সন্দেহ নেই। আজকাল প্রকৃতপক্ষে অমিতই হেডমিস্ট্রেস্ শিবানীর সহকারী হয়ে উঠেছে।

আজ বুঝি তাই চিঠিখানা নিয়ে শিবানী চুপি চুপি চলে এসেছিল অমিতের চেম্বারে। অমিতের প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে বললে : 'অশোকাদিকে আমি কিছু বলিনি।'

'কেন ! উনিই ত প্রপার পার্সন্ আপনাকে এ সব বিষয়ে পরামর্শ দেবার।'

'তা হোক্ গে। আপনার নিজের কি মনে হয় বলুন।' —কণ্ঠস্বরে স্বচ্ছ মধুর হৃদ্যতা এনে অমিতের কাছে ঘন হয়ে বসল শিবানী।

এরই ভিতর ঝি দু-পেয়ালা চা এবং ভরা দু-প্লেট জলখাবার রেখে গেছে ওদের সামনে। ছুটির ঘণ্টা বাজল। বাইরে মেয়েদের হল্লা হচ্ছে—তাই ঝি ফিরে এসে কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল। অমিত সৌজন্যসুন্দর হাসিতে বললে : 'দাঁড়ান শিবানীদি, আগে চা ও জলখাবারের সৎকার করে নিই। একটু ভাবতে হবে ত।' বলে শিবানীর অংশ এগিয়ে দিয়ে নিজেরটায় মন দেয়। খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করে : 'আচ্ছা দিবাকরবাবুকে জানিয়েছেন কিছু ?'

'তিনি ত বললেন, আপনাকে নিয়ে সংশ্লিষ্টবিভাগের প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে সোজা দেখা করতে। সেখান থেকে আমাদের জেনে নিতে হবে, কারা এ-ভাবে স্কুলের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন। এ-নালিশ একান্তই ছেলেমানুষী।

এটা জনসাধারণের অনুষ্ঠান, হঠাৎ এমনতর খামখেয়ালিতে একে নষ্টকরে দেবার অধিকার কারো নেই।' —একটু থেমে শিবানী ডাক দেয় ঝি-কে; সে এসে কাপডিসগুলো তুলে নিয়ে যেতেযেতে জানিয়ে গেল, সকল দিদিমনিরাই চলে গেছেন। এতে শিবানী কিঞ্চিৎ হালকা হল এবং পরামর্শকরার পরিবেশ নিরাপদ ভেবে তার আগের কথার খেই টানে একটু উত্তেজিতকণ্ঠে: 'যজ্ঞেশ্বরবাবুর মত একজন বিশিষ্টলোক, যিনি এই স্কুলের জন্ম থেকে টাকা, বাড়ি, ঘর, দোর জমি সমস্তদিয়ে অকৃপণভাবে আমাদের সাহায্য করে আসছেন—তাঁকে আজ বাদ দিয়ে আমি কী ভাবে, আর কোন লাজেই বা আরেকটা নূতন কমিটি গঠনের জন্য মিটিং কল করি—বলুন দেখি!'

স্কুলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অমিতের কাছে একেবারে নূতন। বস্তুতঃ এখানে এতদিন কাজ করার পর, আজ তা সে প্রথম শুনল। আগে অন্য কারো মুখে এনিয়ে ঘুণাক্ষরে কিছু শুনেনি। কাজেই, এখন শিবানী তাকে যে-ভাবে বিষয়টা বোঝালো ঠিক সেইভাবে তা বুঝে নিয়ে অমিতের মন ক্রমশ গভীর মমতায় আর সহানুভূতিতে ভরে ওঠে, বলে সে সদরদে: 'তাইত, এটা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, উচিতও নয় শিবানীদি।'

'বাস্তবিক, এ আমারদ্বারা হবে না মাষ্টারমশাই।' অমিতের আরো ধারে এগিয়ে যায় শিবানী, বলে: 'তার চাইতে চলুন, উপরওয়ালার ওখানে খোঁজ নিয়ে, যারা এ ভাবে নালিশ করেছেন তাদের নাম-ধাম আগে যোগাড় করি, —কি বলেন? আমার দৃঢ়বিশ্বাস, পাবলিকের সাপোর্ট আমি এ-কাজে পাবই পাব। আর তেমন প্রয়োজন হলে কোর্টেও কেস্ করব আমি ওদের বিরুদ্ধে।'—প্রতিশোধের আগুন শিবানীর চোখে। কণ্ঠস্বর নামিয়ে আবার সে জিজ্ঞেস করে: 'আপনি তখন আমায় সাপোর্ট করবেন ত মাষ্টারমশাই?'

অমিত সর্বদাই স্কুলের শুভচিন্তা করে আসছে। এক্ষেত্রে শিবানীর এমনতর দুর্ভাবনায় সে সত্যই বিচলিত হল এবং সঙ্গেসঙ্গে না-বলে পারল না: 'নিশ্চয় করব। কেন করব না? স্কুলের যাতে ভাল হয় তা দেখা যে আমারও কর্তব্য শিবানীদি। আর বাইরের লোক তা নষ্ট করতে এলে, আমরাই বা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি কোন্ যুক্তিতে? চলুন না, আমরা কালকেই অফিসে যাই। বড়সাহেব নটবর বাড়ুয্যে যখন আপনাদের পরিচিত বলছিলেন তখন আর ভাবনা কিসের?'

শিবানী বলে: 'আপনাকেই কিন্তু সব কথা বলতে হবে।'

'ঠিক আছে।' সাহস দিল অমিত।

শিবানীও তখন অভিভূত হয়ে পড়েছে কৃতজ্ঞতায়। দুর্ভাবনামুক্ত হয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছি", একটু থেমে জিজ্ঞেস করে: 'ভালকথা, আপনার কাছে কি শকুন্তলা এয়েছিল আজ?'

'কৈ, না ত!'

এই স্কুলে নূতন জোয়েন্ করেছে শকুন্তলা ত্রিবেদী। তাকে নিয়ে অমিতের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে শিবানী বলেছিল, ছোটবেলায় সে দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছে—নাচগান দুটোতেই ইণ্টারেস্টেড্। পরিচয়ের প্রথমদিনে প্রথমক্ষণেই শকুন্তলা জিজ্ঞেস করেছিল অমিতকে: 'আচ্ছা বলুন দিকি, যারা বরাবর গান করবে না এবং আমরা যখন নিশ্চিত জানি, যে, এই মেয়েরা সবাই বড় বড় গাইয়েও হবে না, —তখন তাদের দিয়ে সঙ্গীতশাস্ত্রের রাগরাগিণীর কঠিন পর্দাগুলো জোর করে গলায় টেনে আনার কোন সার্থকতা আছে কি?' —প্রশ্নটা অমিতকে বেশ একটু ভাবিয়ে দিয়েছিল। অমিত বলেছিল: 'কিন্তু এ যে আমাদের সিলেবাস্ মিস্ ত্রিবেদী। শেখাতেই হয় গানের ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের। উপর থেকে নির্দেশ।'

'মেয়েরা সহজে তা শিখতে না পারলেও?' চোখ বড় করে তাকিয়ে শকুন্তলা নিজেই মন্তব্য কেটে বলেছিল আরো: 'হাউ ফানি। অংক, বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল এ-সবের সিলেবাস্ না-হয় তৈরি করে দেন যত সব অরসিকের দল, —ছেলেমেয়েরা ঠিক শিখতে পারবে কি পারবে না—সেই দায়িত্ব ত তাঁদের নেই, অথচ এর মধ্যে ছক কেটে-কেটে টিচারদের পড়াতে হবেই, হচ্ছে-ও। কিন্তু, এখন যদি—গান শেখাবার বেলায়ও ঐ একই উপদ্রবের রেওয়াজ চলে তাহলে যে ব্যাপারটা বড় বিতিকিচ্ছি হয়ে দাঁড়ায়।'

সেদিন আরো যারা উপস্থিত ছিলেন সামনে, হেসে উঠেছিলেন শকুন্তলার এমনতর কথায়। কিন্তু অমিত শুধু নীরবে লক্ষ্য করছিল, শকুন্তলার স্বভাবের অভিনবত্ব—কথাগুলি তার যুক্তিযুক্ত। বেশ একটু বৈশিষ্ট্যও আছে এরমধ্যে, ঠিক এঁদের মত নয় শকুন্তলা!'

এরপর মাস দুই-তিন কেটে গেছে। ঐ সময়ের ভিতর শকুন্তলার আরো পরিচয় পেয়েছে অমিত। ···তবে হ্যাঁ, সেদিনই কিন্তু শকুন্তলার প্রস্তাবটা অমিত নিজে তুলেছিল শিবানীর কানে, বুঝিয়ে দিয়েছিল, বাংলাগানের ওপর সঙ্গীত-শাস্ত্রের ব্যাকরণ খুব কড়াক্কড়িভাবে চাপিয়ে দেবার কোনো মানে হয় না। কারণ, জাতিটা একে বেজায় ভাবপ্রবণ, —তার গানটাও ত ঐ ভাবপ্রবণতারই বিকাশ। এ ক্ষেত্রে ব্যাকরণ গৌণ বৈকি! শকুন্তলার কথারই মজির তুলে

বলেছিল অমিত: বেশত, যারা শাস্ত্রীয়সঙ্গীত চর্চা করতে চায় শুধু তারাই এসে শিখুক, মুখস্থ করুক রাগরাগিণী, ঠাট, আলাপ এসব ব্যবহারের মূল রীতিনীতি। বিশেষকরে মিস্ ত্রিবেদীও যখন নিজে ঐ ক্লাশের একজন মেম্বার হতে চাইছেন। আর, বাংলাগানের মধ্যে ত রবীন্দ্রসঙ্গীত অতুলনীয়—স্কুলের সব মেয়েরা তা শিখবে, একেবারে কম্‌পাল্‌সারি করে দিন, গাইবে কমিউনিটি সঙ্‌-এর অনুরূপ, গাওয়া উচিতও। ···শিবানী বুঝেছিল সমস্তই, এবং সানন্দে ঐ ব্যবস্থাটাই সে আজকাল করিয়ে নিয়েছে তার স্কুলে। ···বাংলাগান রোজ শেখায় অমিত, আর ক্লাসিক্যাল সপ্তাহে দুইদিন। তখন শকুন্তলা আসে, তার সঙ্গেসঙ্গে আসেন আরো দু-চার জন শিক্ষিকা। দেখে মনে হয় এঁদের মধ্যেও গান চর্চ্চার সহজ নেশাটা জাগিয়ে তুলতে চায় শকুন্তলা। তার এই অভিনব উদ্যোগ উৎসাহে হেডমিস্ট্রেস্ শিবানী যে বিশেষভাবে গৌরবান্বিত তাতে আর সন্দেহ কি।

আজ যখন য়ুনিভার্সিটির পত্রখানা নিয়ে অমিতের সঙ্গে কথা কইতে এসে শিবানী খোঁজ নিচ্ছিল শকুন্তলার, অমিত বললে: 'উনি এলে পরে আমি সব বলব খন ওঁকে।'

শিবানী চলে যাবার জন্যই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু আবার এসে বসল। কারণ এই মুহূর্তে সে অমিতের সাক্ষাতে শকুন্তলার প্রশংসায় আবো কিছুটা উচ্ছ্বসিত না হয়ে থাকতে পারছে না। অর্থাৎ ইতিমধ্যে একদিন নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীত-প্রসঙ্গে স্কুলের জনৈকা শিক্ষয়িত্রী তাঁদের কমনরুমে বসে মন্তব্য কেটেছিলেন: 'রবীন্দ্রনাথের গান ত শুনতে পাই, ওস্তাদদের মতে, ঠিক মিউজিকের পর্যায় স্থান পায় না!' ···শকুন্তলা তা শুনে পিঠপিঠ জবাব দিয়ে বলেছে: 'এ-কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, অযৌক্তিকও নয় অবশ্যি—from those Ostads' angle of vision—একথাটুকুও সকলের মনে রাখা দরকার! ওস্তাদরা যে, কোন্ অর্থে এটা বলেন—সেটা আমাদের আগে জানতে হবে, তবে তো এ-নিয়ে আমরা কথা বলব! কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, আপনারা কি কেউ গানে ওস্তাদ আছেন এখানে? কিংবা যে-কথা শুনতে পান বলে বলছেন, কেবল সে-কথার মানেটা নিজের জ্ঞান মতো পারেন আমাকে বুঝিয়ে দিতে?' —ব্যস মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এই একটি প্রশ্ন দিয়েই। এরপর শান্তগলায় বুঝিয়েছে সবাইকে: গান নিয়ে সামান্যতম আলোচনায় বসতে গেলেও তারজন্য একটা প্রস্তুতি চাই, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে আগে থেকে সাধারণভাবে খবরাখবর নেওয়া কিংবা পড়াশুনার দরকার আছে প্রত্যেকের। শুধু গানের কেন, যে-কোনো বিষয়েরই আলোচনা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে করা যায় না, করলেও তাতে কোন ফল হয় না। বরং

অস্পষ্টতার আবর্তে পড়ে আলোচকের বুদ্ধিও বোধশক্তিটা আরো অস্পষ্ট হয়ে আসে, যার পরিণতিতে আলোচনা হয় দুর্বোধ্য। তার উপর রবীন্দ্র-প্রতিভা, যে প্রতিভার জ্যোতিতে বিশ্বভুবন চমকিত—সেটা নিয়ে বিচার করতে যাওয়া কি যা-তা ব্যাপার !!

এই সব রিপোর্টই সবিস্তারে অমিতের কানে অনর্গল পরিবেশন করে যাচ্ছিল শিবানী. নিজেও এতে গর্ববোধ করছিল. তাই একটু থেমে ফের ব'লতে থাকে : 'বাস্তবিক মাষ্টারমশাই, শকুন্তলার বক্তব্যের মধ্যে জানবার. শিখবার, ভাববার মশলা আছে অনেক। আমার বেশ লাগে কিন্তু। এই তো সেদিনই কথায়-কথায় সে আরো বলছিল, রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরের প্রামাণিকতা নিয়ে কবিগুরুর মৃত্যুর পর থেকে যে বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়েছে নানা কাগজপত্রে দেখা যায়, তা যেন অমূলক বলে কেউ উড়িয়ে না দেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের দেশের জাতীয়সম্পদ। এর সংরক্ষণের কাজ কোন প্রণালীতে হচ্ছে তা ভালকরে জানবার বোঝবার জন্যে প্রসঙ্গত সকলকেই একটু সময় করে নিয়ে পড়াশুনা করতে সকাতরে অনুরোধ জানিয়েছে শকুন্তলা। ...তার মুখ থেকে এইসব শোনা অবধি আমিও সিরিয়াস্‌লি ভাবছি, — রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরের প্রামাণিকতা ত সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আসছে কবির নিজস্ব দেওয়া বাঁধাস্বরের স্বরলিপিগুলির উপরেই বরাবর। আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের চাহিদা সর্বত্র। তাই এর স্বরলিপিগুলিও প্রকাশকরা উৎসাহ নিয়ে সানন্দে ছাপাচ্ছেন অনবরতঃ, আর বাজারে বিক্রী করছেন **like hot cakes**! বলাবাহুল্য এই সুযোগে ব্যবসারও প্রচুর সুবিধা হচ্ছে তাঁদের। কিন্তু সেই-সুবিধা দেখতে গিয়ে তাঁরা যে তলায়-তলায় কী করছেন, আমরা সাধারণরা জানতে পারছি না। তবে একটা কৌশলজনক গোলমাল নিশ্চয় পাকিয়েছেন ওঁরা—তা নৈলে, শকুন্তলা যে বলল, প্রকাশ্যভাবে এ-নিয়ে লেখালেখির কাজে দেশের বিশিষ্টজনরাই বা এত সোচ্চার হবেন কেন! আবার অন্যদিকে, অসাধু উপায়ে বহু ব্যবসায়ীর ব্যবসা যে অনেক সময় দারুণ ফেঁপে ওঠে— এমনতর দৃষ্টান্তেরও ত অভাব নেই। এখন. এই স্বরলিপি গ্রন্থের ব্যবসাটাও কি ঐ রীতিধরেই এগোচ্ছে—তা কেবা জানে! যদি তাই হয়—তাহলে এ-কলংক যে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আঁকা হয়ে থাকবে চিরকালের জন্যে, —উঃ সে কী লজ্জা! এ-সব সত্যি মাষ্টারমশাই, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের জানা দরকার, বিশেষতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত-অনুরাগীদের ত অতি অবশ্যই—কি বলেন আপনি?'

অমিত এতক্ষণ নিঃশব্দে মন দিয়ে শুনছিল সব, এবার বলল: 'এই নিয়ে বলবার অনেক আছে শিবানীদি,—সময় আসুক নিশ্চয় বলব। আজ প্লীজ ও-সব কথা বাদ দিন।'

শিবানী তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝল সময় অনেক গড়িয়ে গেছে—অমিতকে ছেড়ে দিতে হবে—উভয়েরই বাড়ি যাওয়া দরকার, বলল: 'হ্যাঁ আপনি কালকেই শকুন্তলাকে আপনার এখানে ডেকে পাঠান। তার সাথে কথাবার্তা বলে একটা ফাংশনের ব্যবস্থা করে ফেলুন তাড়াতাড়ি।' বেরিয়ে যেতে যেতে আরো বলল: 'দেখুন, শকুন্তলাকে যদি কাজে লাগানো যায়,—ফিগারটা কিন্তু ভারী সুন্দর ওর।'

অমিত মন্তব্য করে: 'স্বভাবটাও।'

শিবানী তখন তার জরুরি কাগজপত্র সব গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

দিন কয়েক বাদে—

শিবানী আর অমিত বেড়াতে যাবে পুরী। যাচ্ছে ওরা রাত্রের এক্সপ্রেসে। কিন্তু তার আগে অমিতকে নিয়ে যখন নটবর বাড়ুয্যের চেম্বারে উপস্থিত হয়েছে শিবানী, তখন বেলা প্রায় দেড়টা। অমিত লক্ষ্য করল, শিবানীকে দেখে নটবরবাবু অসন্তোষে ভ্রূ কুঁচকালেন, কোনো অভ্যর্থনা জানালেন না। অমিত কিন্তু কারো অপেক্ষা না রেখে সোজা নটবরবাবুর বাঁ দিকের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল।

বিশালবপুধারী বিভাগীয় বড়কর্তা শ্রীনটবর বাড়ুয্যে নাকে চশমা এঁটে টেবিলের ওপর অপিসের কাগজপত্রাদি দেখায় নিজেকে ব্যস্ত রাখছিলেন; তার সামনে শিবানী ক্ষণেক দাঁড়িয়ে থেকে নম্রকণ্ঠে বললে: 'আপনাকে আজ একবার ফোন করেছিলাম—'

'হ্যাঁ'—কথা লুফে নিলেন নটবর, কৃপাকটাক্ষেবললেন: 'আমি স্কুলের ফাইল আনতে বলে দিয়েছি—ওটা নিয়ে আসুক।' আবার কাজে মগ্ন হলেন তিনি। বেশ বোঝা গেল, নটবর অনেক আগেই শিবানীকে চিনতে পেরে যথোচিত সংবর্ধনা জানিয়েছেন। তাঁর পাশে যে অমিত বসেছিল সেদিকে দৃক্‌পাতই করলেন না।

অমিত মনে-মনে হাসে, এমনতর দাম্ভিকতা যে হীনমন্যতারই সূক্ষ্মনিদর্শন, হায়রে! মানুষ তা বুঝবে কবে! যাই হোক্ তার সামনেই শিবানী দাঁড়িয়ে রয়েছে এও যে দৃষ্টিকটু! তাই অমিত বললে: 'আপনি বসুন শিবানীদি। এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

শিবানী কুণ্ঠিতভাবে নটবরের টেবিলের অপরপার্শ্বে সমুখের শূণ্যআসনে বসবার মুহূর্তকাল পরেই জনৈক অফিসবেয়ারার স্কুলের ফাইল এনে রেখে গেল টেবিলের উপর। তা হাতে নিয়ে দেখতে-দেখতে আগের মত নটবরবাবুর ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হল। খানিকক্ষণ ফাইল ঘেঁটে বলেন: 'এই যে পাওয়া গেছে আপনাদের স্কুলের রিপোর্ট। অর্ডার ত জারি হয়ে গেছে দেখছি। ব্যস্, যা বলা হয়েছে সেইভাবে নূতন করে কমিটি গড়ে নিন এবার।'

'কিন্তু কোনো সন্তোষজনক যুক্তি নেই, মিছিমিছি ওঁদেরকে সরিয়ে নূতন কমিটি গঠনের আদেশ দিয়েছেন যে!' আমতা-আমতা করে ক্ষীণ প্রতিবাদ তোলে শিবানী, বলে: 'অথচ, ওঁরাই এতদিনযাবৎ এই স্কুলটাকে পেট্রনাইজ করে আসছেন।'—শিবানীর এ-কথার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করে ফাইলটা একপাশে সরিয়ে রেখে নটবর নীরবে অন্য কাজে মন দিলেন।

শিবানী হতাশ হয়ে তাকাল অমিতের দিকে।

'আপনি স্যার',—খুব শান্ত ও ভদ্রভাবে অমিত এবার কথা শুরু করল: 'কাইনডলি বিষয়টা একটু রি-কন্‌সিডার করুন।'

দুর্দাণ্ড ভাবে চটে গেলেন নটবর, চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন: 'কী বলেন মশাই, রি-কন্‌সিডার করব! এই দেখুন দেখি—' বলে রেগেমেগে ফাইল্‌টা আবার টেনে নিয়ে অমিতকে দেখিয়ে বলেন: 'এতগুলো কম্‌প্লেন্ স্কুলটার এগেন্‌ষ্টে, তাসত্ত্বে-ও স্যুদ্‌লি ওর্ডার দেওয়া হয়েছে ওঁদেরকে,—স্কুলের ম্যানেজিং-কমিটি রিকন্‌স্টিটিউট্ করার জন্তে। তা ওঁরা কিছুই করেন নি, ডেইট্ এক্সপায়ার হয়ে গেছে, এখন এসেছেন তদ্‌বির করতে।'

অমিত আর বলবে কি! সময় যে আর হাতে নেই একথা ত সে এখানে আসবার আগেই শিবানীকে জানিয়েছিল। কাজেই চুপ করল সে।

'ওঁদেরকে কমিটি থেকে সরিয়ে দেবার ত কোনো মানে হয় না।' ভয়ে-ভয়ে বলে শিবানী: 'ব্যাঙ্কের ব্যাপারে হয়ত বা কেউ কেউ পার্স্যন্যাল গ্রীভ্যান্স নিয়ে ওঁদের বিরুদ্ধে নালিশ এনেছেন। এ নালিশ ত ভিত্তিহীন! আইনের চোখ **malicious.**'

'আপনি ব্যাঙ্কের ব্যাপার বলছেন কি!' রীতিমত বিস্মিত হয়ে নটবর পুনরায় ফাইলটা একটু বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখে নিয়ে মন্তব্য করেন: 'ও আপনাদের ম্যানেজিংকমিটিতে দেখছি, ব্যাঙ্কের ডাইরেকটারও একজন মেম্বার আছেন! আপনি ওঁর কথাই বলছেন বুঝি? তা বেশ, উনি এতদিন টাকা দিয়ে, জমি দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন স্কুলকে—এ অতি উত্তমকথা, হী ইজ্

কাইণ্ড এনাফ্ ; এখন উনি সরে পড়েন না কেন ?' তারপর অমিতের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিকট-হাস্যে বললেন : 'স্কুলটার ওপর কি তিনি মৌরসীসত্ব আরোপ করতে চান নাকি,—অঁ্যা ?'

অমিত এবার সুযোগ পেয়ে অনুনয় করল : 'যাকগে আমরা ত আর আপনার সাথে তর্ক করতে আসিনি। আপনাদের দেওয়া টাইম্‌টা এক্‌স্‌পায়ার করে গেছে তাই, অনুরোধ করছি.—মেয়েদের স্কুল বলে দয়া করে যদি একটুখানি লম্বা টাইম দেন তা হলে বড় ভাল হয়। আর সে ত আপনার হাতেই সব.'—অমিতের এইকথা শুনে, বিশেষতঃ তার ভদ্রমোলায়েম কণ্ঠস্বরে নটবরবাবুর বিরক্তি প্রশমিত হল। তিনি নীরবে অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন খাণিকক্ষণ।

'লম্বাটাইম্ বলতে কি একমাস, দু-মাস সময় চাইছেন ? তা হবে না মশাই। যান, পনের দিন সময় দিচ্ছি—এরমধ্যে সব ঠিক করে আমাদের অফিসে জানাবেন। নয় তো, যেমন পরিস্থিতি তাতে স্পষ্ট জানিয়ে রাখছি, স্কুলের অ্যাফিলিয়েশন কাটা যাবে।"—এই বলে শ্রীনটবর বাড়ুয্যে কলিংবেল্ টিপলেন। বেয়ারার্ এসে ফাইল্ ফেরৎ নিয়ে গেল।

তিনি নিজের কাজে পূর্ববৎ ডুবে গেলেন।

সেদিনই মধ্যাহ্নে······

দ্য আলিপুর গার্লস্-ওন্-একাডেমির টিচার্স দীননাথ চাটুজ্জে এবং কুমারী চারু সামন্ত তাঁদের রক্ষিত যৎসামান্য টাকা উয়িদ্‌ড্র করতে মহাকালী ব্যাঙ্কে ঢুকলেন।··· ব্যাঙ্কের মেনগেট্ তখন বন্ধ, শুধু চেনাশোনা যারা তাদের যাতায়াতের জন্যে পেছনের সংকীর্ণরাস্তাটা খোলা ছিল। দীননাথ আর চারু শুনতে পেলেন, বাইরের দিকে বারান্দায় কারা যেন বলাবলি করছে :

—ব্যাঙ্কের দরজাটা বন্ধ হয়ে রইল কয়দিন, আবার দেখছি দিব্যি টাকা পেমেণ্ট হচ্ছে! ব্যাপার কি হে ?—এই বুদ্ধিটাই ত তোমার আমার ঘটে নেই, ভাই।—হ্যাঁ যা বলেছিস। তাহলে ত আমরাই এক-একজন ব্যাঙ্কার বনে যেতে পারতুম। লেখাপড়া শিখে রাস্তায়-রাস্তায় বেকার ঘুরতে হত না!—আবার দেখছি, অধিকাংশ চেক্ই ডিসঅনার্ড্ হচ্ছে নানাছুঁতোয়। কিন্তু কাউন্টারে ডিপোজিটর নিজে হাজির থাকলে তা হয় না।—এটাই ত বড়দরের ভেল্‌কি! তানৈলে যে, চট্‌করে তুমি বদনাম করে ফেলবে যজ্ঞেশ্বরবাবুর. সেটা ভাবছনা কেন ? তাঁর সুনাম করবে এই রকমের একটা দল হাতের মুঠোয় রাখার জন্যই ত এই প্রসেস্।—হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই ঠিক কথা। অন্যায় করবে, তবু তার সুনামই করতে হবে! বা-বা-বাঃ, টাকায় কি না হয় ছাখ।—চুপ, কে আবার শুনে ফেলবে

কোন্ দিক থেকে। উল্টো মার খাবি শেষকালে। হাশ্ একটু সবুর কর্, অন্যায় কি আর চিরকাল টি*কে থাকে রে ভাই? দেখতেই ত পাচ্ছিস, এসব মুখোসধারী লোকদের ধূর্তামি ধরার জন্যই ভগবান তাঁর রাজত্বে দিন-কে-দিন ধুরন্দরদের সংখ্যাই বাড়াচ্ছেন শুধু।...

দীননাথ আর চারু অসম্ভব কৌতূক নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে 'লেন তাড়াতাড়ি। বাইরে এসে কিছু শুনলেন না তাঁরা, কিছু দেখতেও পেলেন না।

একটা রিক্শা ডেকে নিয়ে বসলেন ওঁরা তুজন। অনেকটা পথ এগিয়ে গেলে মনে বিস্তর সন্দেহ নিয়ে চারু জিজ্ঞেস করেন: 'আচ্ছা দীননাথবাবু বলুন ত এই মহাকালীব্যাঙ্কের সেভিংভল্টে যে আমি আমার যাবতীয় অলংকার রেখেছিলাম—ঐ সব কি খোয়া যাবে নাকি?'

চারুশীলা সামন্ত শিশুবিভাগের একজন প্রবীণাশিক্ষয়িত্রী, শিবানীর মা বিন্দুবালা ঘোষের প্রায় সমবয়সী। তাই জন্য শিবানীও তাঁকে বেশ সমীহ করে। এই কথা মনে রেখেই দীননাথ তাঁকে সাহস দেন: 'আরে না না। আজ ত পেলেন কিছুটা, বাকীটাও পেয়ে যাবেন ধীরে ধীরে। তাছাড়া শিবানীদি যখন আছেন এরমধ্যে তখন আপনার ভয়টা কিসের! কিন্তু—' একটু থেমে আশপাশ দেখে নিয়ে দীননাথ নীচুগলায় বলেন: 'আমাদের যজ্ঞেশ্বরবাবুর নিজের ব্যাপারটা যেন বেশ ঘোরালো হয়ে পড়েছে।'

'কি করে আপনি টের পেলেন?' চারুর এই প্রশ্ন শুনে নৈরাশ্যের হাসি হাসলেন দীননাথ, বলেন: 'জানেন না বোধহয়, আমাদের স্কুল-কমিটি থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবার হুকুম হয়েছে উপরওয়ালাদের।"

'তাই নাকি!' আতংকিত নয়নে চারু আরো জানতে চান: 'তারপর?'

'কাজেই জানাজানি যখন হয়েই গেছে একটা উঁচু রকমের বিশিষ্টমহলে, তখন ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হলেও, অন্যান্য ফেইল-যাওয়া ব্যাঙ্কের মত, এখানে রাতারাতি কিছু করা তাঁর পক্ষে বেশ কঠিন হবে। সে কথা যাক। তবে হ্যাঁ, আমাদের মহাকালীব্যাঙ্ক থেকে আপনার একটা পয়সাও মারা যাবে না, বুড়োর একথা আপনি বিশ্বাস করুন। 'খানিক থেমে দীননাথ ফের বলেন': 'বড় বড় ব্যাপারে ত গোঁজামিল হচ্ছে কোনো রকম। কিন্তু আমার যে অনেকগুলো টাকা যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাছে পাওনা, ওঁর মেজমেয়ে বিপাশাকে পড়িয়েছিলুম, তা এখন কী করেইবা উশুল করব ভাবছি।' দীননাথ চিন্তামগ্ন হলেন।

চারুশীলাও নীরব।

অনেকটা সময় নিস্তব্ধতার পর সহসা কৌতূহল জাগে চারুশীলার: 'আচ্ছা,

আমাদের অমিতলাহিড়ীর সঙ্গে কী রকমের টার্মস্ এই যজ্ঞেশ্বরবাবুর—কী জানি! উনি ত-দিব্যি ওঁদের সঙ্গে গাড়িতে করে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান।'

'ওই পর্যন্তই। ওঁরা নিজনিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অমিতকে টেনে নেয়। কৈ, আমাকে বা আপনাকে ত নিতে আসে না কখনও। এক্সপ্লয়ট্ কি আর কম করছে ওঁরা অমিতকে! এই অমিতের দৌলতেই বিয়ের বাজারে বিনতার আজ এত ওজন; —অথচ বিনিময়ে অমিতবাবু পাচ্ছে কি?' বলতে বলতে শীর্ণহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি নাড়লেন দীননাথ, আর যেন তাঁর হাবভাবে ধনীবড়লোকদের বিরুদ্ধে একটা জাতবিদ্বেষ ফুটে ওঠে।

'ঐ, তো!' চারু তাঁর বামাকণ্ঠে সুরেলাভঙ্গিমায় টেনে-টেনে জবাব দেন : 'আজ পর্যন্ত বিয়ে করেনি বলেই ভদ্রলোকের এই অবস্থা! বিয়ে করলে কি আর সে এ-ভাবে চলতে পারত? তখন দেখতেন, লোকটা সাবধান হত; বৌই তাঁকে চালিয়ে নিত অন্যপথে, —তাঁর নিজেরও কদর বাড়ত অনেক।'

'উহুঁ, সব জায়গায় আপনার এই থিয়োরি টেকে না কিন্তু' দীননাথ বলেন: 'তবে অমিত যে নিজেকে বড় চীপ্ করে ফেলে এ-কথা ঠিকই। যেখানে-সেখানে যার-তার সঙ্গে মিশে যায় যখন-তখন। ···সে আবার প্রায়ই দার্শনিকতত্ত্ব আওড়ায় কিনা, বলে ভারীসুন্দরসুন্দর কথা: গাছেরগোড়া কেটে দিলে, গাছ কি শুধু শূন্যেতে থেকে বড় হতে পারে দীননাথদা? মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তার রাখতেই হয়, অন্তত নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। আমরা মানুষেরদল বুদ্ধির অহংকারে মাটিকে বাদ দিয়ে আকাশে ভাসবার হাস্যকর চেষ্টা যতই করিনা কেন, তবু কি শেষপর্যন্ত ঐ মাটিতেই গড়াগড়ি দিতে হয় না প্রত্যেককে? —এরপরে আর তর্ক চলে কি, এই লোকটার সাথে, বলুন?'

'এসব ত সে শুধু মুখে বলেনা, কাজেও করে যে! তাইজন্যে কথাগুলি বোধকরি তাঁর মুখে শোভা পায় আরো বেশি।' উৎসাহিতকণ্ঠে চারু বলেন: 'আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন কি? লোকটা অমনিতে বেশগম্ভীর নিঃসঙ্গপ্রিয় —আমরা যে-সব সাংসারিক আমোদআহ্লাদের আলোচনা খুব প্রয়োজনীয় মনে-করি, তাতে সে ভুলেও আগ্রহ দেখায় না কোনোদিন। কিন্তু মাঝেসাঝে গায়ে পড়ে আড্ডাবাজদের মত এত অনাবশ্যক কথা বলে সবাইকে জমিয়ে রাখে —সে কি বলব! উফ্!'

'আর সেই কারণেইত আপনারাও ওঁকে ভাল না-বেসে পারেন না!' দীননাথ বিজ্ঞের মত বলেন: 'আপনি ভেবে দেখুন চারুদি, স্বার্থপর যারা—তারা কি কখনো অনাবশ্যক কথা বলতে পারে? এটা অমিতের চরিত্রের একটা বিশেষগুণ

বলেই জানবেন। তবে যাই বলেন না কেন, আই লাইক্ হিম্ ভেরিমাচ্। এই ত আমাদের স্কুলের ব্যাপার নিয়েই আজকে সে গেল ইউনিভার্সিটিতে। প্রথমে কিছুতেই যেতে চাইছিল না। এর ভিতরে যে কী গোলমাল তা ত জানতাম না আমি। শেষে শিবানীদি আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গোপনে বললেন, অমিতের কোনো দোষ নেই—উনি নিজেই গাফিলতি করেছেন এই ব্যাপারে। আরো দু-দিন আগেই নাকি ওঁকে নিয়ে যাবার কথা ছিল, এখন অমিত এ-সব সহ্য করবে কেন? একটা বিশৃঙ্খলা থেকে আরো দশটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়—এ ত জানা কথা। অমিত তাই আইনমাফিক স্পষ্ট শুনিয়ে দিয়েছে: অশোকাদিকে নিয়ে যান, তিনিই ত স্কুলের অ্যাসিস্টেণ্ট হেড্‌মিষ্ট্রেস্। আমি এখন গিয়ে লজ্জায় পড়ব নাকি! এ-নিয়ে আর কিছু আমাদের বলারই বা স্কোপ্ কোথায়? হিসাব করে দেখুন, আপনার চিঠির ম্যাদ ত শেষ হয়ে গেছে—ইত্যাদি কথা অমিত এত জোরে খোলাখুলি বলল, যে, শিবানীদিও আমাকে সব না বলে পারলেন না। অথচ অমিতকে নাকি সঙ্গে না-নিয়ে গেলেই নয়। তাছাড়া আজ রাত্রের এক্সপ্রেস্ গাড়ীতে ওঁদের পুরী যাবার কথা ঠিকঠাক। শিবানীদির কেন জানি বড় ভয়, অমিতের যা মেজাজ—যদি আবার সে এখন পুরী যাওয়াও বাদ দিয়ে বসে! কাজেই শেষ পর্যন্ত আমিই মধ্যস্থ হয়ে একরকম জোর করে ওঁকে পাঠালাম শিবানীদির সঙ্গে। আমার অনুরোধটা কিন্তু রাখলও।' রীতিমত গর্বিত হলেন দীননাথ, আরো বলেন: 'আমার অনেক ভরসা ওঁর উপর। যাকগে, অমিতবাবু ফিরে এলে ধরতে পারব'খন—হাওয়াটা কোনদিকে বইছে।'

'এই যে এসে গেছি জগুবাবুর বাজার'—রিক্‌শাওয়ালা হঠাৎ ওঁদের কথার মধ্যেই বলে উঠল: 'আপনারা এখানেই নামবেন ত?'

॥ ১০ ॥

'আরে মাষ্টারমশাই যে—আসুন আসুন।' দরজা খুলে অনেকদিন পর অমিতকে দেখতে পেয়ে দিবাকর সোল্লাসে হাত বাড়ালেন: 'খবর কি বলুন।'

'শিবানীদি কোথায়?' —খোঁজ করল অমিত।

'উনি ত বাড়ি নেই। এই কাছে কোথাও গেছেন হয়ত, আসবেন এক্ষুণি। আপনি ভিতরে এসে বসুন।' দিবাকর সঙ্গে সঙ্গে চাকর বৃন্দাবনকে ডাকলেন দু-পেয়ালা চা নিয়ে আসতে, তারপর জিজ্ঞেস করেন: 'কি হল আপনাদের? উমরবাবুর ওখানে যাবার কথা শুনছিলাম, গিয়েছিলেন নাকি?'

'হাঁ গিয়েছিলাম।' —কিন্তু সে ত অনেক আগে! তাই এতদিন পর দিবাকরের প্রশ্নে অমিত অবাক হল : 'কেন আপনি তা জানেন না!'

'না আমার সাথে আর দেখা হয় কোথায় আপনাদের শিবানীদির!' দিবাকরের এমনতর সংলাপে রীতিমত ঝাঁজ টের পেল অমিত, নরমগলায় বললে : 'কিন্তু আমি ত শুনলাম, আপনিই নাকি আমায় ওঁর সঙ্গে যেতে বলেছিলেন!'

দিবাকরের হাসিমুখ তক্ষুণি কালো ও গম্ভীর হয়ে উঠল, অস্ফুটে বললেন : 'তাই নাকি!'

অমিত যতদিন পেয়িংগেস্ট্ হয়ে শিবানীর ওখানে ছিল, ক্বচিৎ দিবাকরের দেখা পেয়েছে সে। তাতে আশ্চর্য হয়নি। কেননা, হরিতকীবাগান ছেড়ে আসবেন কেন তিনি! ওঁদের নিজেদের প্রকাণ্ড বাড়ি সেখানে। আর, শিবানী চাকরি করে বলেই না থাকে আলিপুর। এ-রকম স্বামীস্ত্রীতে পৃথক বসবাস ত আর বর্ত্তমানযুগের ভদ্রসমাজে তেমন নূতন নয়, অসম্ভবও নয়। ... কিন্তু দিবাকরবাবুর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কত বেশি যে গ্লানিকর তা অমিত আজ এই সাক্ষাৎকারেই প্রথম জানতে পারল। যদিও ব্যক্তিগতব্যাপার, তবু কেন জানি দিবাকর তা একে-একে আবেগের বশে অমিতকে আনুপূর্বিক প্রায় সব শুনিয়ে দিয়ে সেই মুহূর্তে নিজেকে হালকা করে নিয়েছিলেন অনেকটা। বলাবাহুল্য অমিতও ঐ অবকাশে তাঁর ভারী অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। দিবাকর বলছিলেন : 'আপনাদের শিবানীদির চলার পথটা আজকাল বিশেষ সুবিধার নয়, সোজাও নয়।' তারপর একটু থেমে : 'ভেবে দেখুন, কোনো প্রকারের ভুলত্রুটি না পেলে কেউ কি কারো বিরুদ্ধে নালিশ করে কখনও? করে না— সে কথা যাক্। কিন্তু য়ুনিভার্সিটি যে একটা অর্ডার দিয়েছে—তা তো স্কুলের ভালোর জন্যই! সেই ওর্ডার সময়মত ক্যারিআউট্ না করাটাই ত একটা অপরাধ। এই হক্ কথাটা বলেছিলুম বলেই না মশাই কী কাণ্ড! রেগেমেগে আমায় শাসালেন,—আমি দেখা করব নটবরবাবুর সঙ্গে, অমিতবাবুকে নিয়ে যাব উনি সাক্ষী থাকবেন। তাঁকে তোমার নাম করে আমি জানিয়ে রেখেছি। —বাঃ বেশ বেশ বেশ, যা খুশি কর,—এই পর্যন্তই আমার বলা। আর কি বলতে পারি বলুন?'

অমিত অনেককিছু বুঝে নিল এর মধ্যে। অনুযোগ তুলল মৃদুস্বরে : 'তাহলে আমায় কিছু জানান নি কেন আপনি?'

'জানাতাম! কিন্তু আমি যে এখানে ছিলাম না অমিতবাবু।' অত্যন্ত

অপরাধীর মত বললেন দিবাকর। এই ত তর্শু দিন তিনি বেনারস থেকে ফিরেছেন মাত্র। আজকাল সেখানেই থাকেন বেশি সময়,—তাঁর মা আছেন সেখানে—অদিতিকেও নিয়ে গেছেন। বেনারসেও নাকি তাঁদের বিষয়সম্পত্তি আছে, দিবাকরকেই এসব দেখাশুনা করতে হয়।

বৃন্দাবন চা নিয়ে এল।···চা খেতে-খেতে দুজনের মধ্যে আলাপ আরো জমে ওঠে। দিবাকর জানান: 'দেখুন না, এই নটবর বাড়ুয্যে মশাই আমার ছোটমামার সহপাঠী, তাই আমায় একটু স্নেহ করেন। আজ এই সুযোগ নিয়ে পরিচয়ের অপব্যবহার করাটা কি ভাল হচ্ছে, বলুন দিকিন?' একটু থেমে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর আবার শুরু করলেন: 'নাঃ দ্যাট্‌স্ ডেফিনিট্‌লি আন্‌ফেয়ার মাষ্টারমশাই। অথচ এভাবেই আপনাদের শিবানীদি যাচ্ছেন সকলের দুয়ারে-দুয়ারে! মুখে চুনকালি দেবার আর বাকি রাখলেন কি!' ক্ষোভে, বিতৃষ্ণায় মুখটা বিকৃত হল তাঁর।

অমিতের মনে পড়ে যায়,—যখন সে প্রথম শিবানীর স্কুলে যোগ দেয়, প্রায় তখনই ত গান্ধীজী এসেছিলেন কলকাতায়; থাকতেন বেলেঘাটা সোদপুর ঐসব দিকে। সেই সময় দেশের ভিতর সাম্প্রদায়িক গোলমাল কখন চলছে কখন বা থামছে। ঐ অশান্ত পরিস্থিতিতেও শিবানী প্রায়ই সময় করে দিবাকরবাবু আর অমিতকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে চলে যেত গান্ধী-দর্শনে। গান্ধীজীর প্রতি তার এহেন আনুগত্য ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করে অমিত অভিভূত হত। একদিন গান্ধীজীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল শিবানী—সেই পুণ্যস্মৃতি অমিত সযত্নে আগলে রেখেছে। এখনও তা ভাবলে ঐজন্যে শিবানীর প্রতি তার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। আজ বস্তুতঃ দিবাকরের দীর্ঘ বক্তব্য শোনার পর তার বলবার কিছু ছিল না, তবু শিবানীর পক্ষ নিয়ে একটু ওকালতী করল অমিত: 'শিবানীদি যদি কোনো চাকরি না করতেন তাহলে হয়ত তাঁকে এভাবে কারুর কাছে যেতে হত না, দিবাকরবাবু।'

'রীয়্যালি এইটেই যে হয়েছে মস্তবড় কাল! তা কি সংসারে এত দেখেশুনেও কেউ সহজে বুঝতে চায়?' চা খেয়ে দিবাকর একটু চাঙ্গা হয়ে বলেন: 'শুধু আপনাদের শিবানীদি বলে নয়,—যে কোন মেয়েছেলেরই এইধরনের কাজকর্ম আই ডু নেভার অ্যাপ্রীশিয়েট্‌ অমিতবাবু। আপনারা যাই বলেন না কেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, ওরা আবার বহির্জগতের কী অর্গেনাইজ্‌ করবে, বলুন ত? লেখাপড়া শেখে, শিখুক—তার অবিশ্যি একটা পৃথক মূল্য আছে। তাই বলে, পুরুষদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের সঙ্গে

পাল্লা দিয়ে কোনরকমের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা—তার মধ্যে যে কতরকমের ঝকমারি মেশানো থাকে এসব কি মেয়েদের পোষায়? যারা করে, তাদের মধ্যে সফ্ট্ ফাইনার্ সেন্টিমেন্ট্ বলে কিছুই থাকেনা। এর দৃষ্টান্ত ভুরিভুরি দেখতে পাবেন চোখের সামনে।' এই পর্যন্ত বলে হাসতে হাসতে বক্তব্যটাকে হালকা করতে চান দিবাকর, বলেন: 'বিয়ে করেননি ত কোনো রোজগারী চাকরিওয়ালী মেয়েকে—কী বুঝবেন, আপনি এর মাধুর্য! যদি করতেন তাহলে দেখতেন, তাদের সঙ্গে বাস করা আর লোহাকাঠের কারখানায় শুয়ে জীবনযাপনে কোন ফারাক নেই।'

অমিত হাসে আর ভাবে, সেও একটা কাউন্টার্ লেক্চার্ সুন্দর করে শুনিয়ে দেবে নাকি দিবাকরকে! নাঃ থাক্গে। কারণ সমস্ত জগতের বিবাহিত লোকদের ত সে এখনও দেখেনি—আর এমনও ত হতে পারে, যে, বিবাহিতরা অনেকে এমনিকরেই মুখোশের আড়ালে বসে থেকে দিন কাটাতে সুখ পান! আসল কথা, এ লাইনে তার নিজেরই বা অভিজ্ঞতা কোথায়, যে, সে অন্যকে কিছু শোনাবে! কাজেই লেক্চার্ দেবার লোভটা অমিত আপাতত সংবরণ করল।

কিন্তু একি! দিবাকর যে আরো কাছে এসে বসলেন অমিতের! তারপর, 'একটা কথা শুনবেন অমিতবাবু? আপনাকে বলতে আমার কোন বাধা নেই।' বলেই যেন নিজের বুকের পাঁজর ভেঙ্গে তিনি তাঁর মনোবেদনার নগ্নছবি, অনেকটা সময় নিয়ে এখানে ক্রমশ যা পেশ করলেন, তা সংক্ষেপে এই:

···যজ্ঞেশ্বরবাবু সম্পর্কে কৃষ্ণপদর মুখ থেকে দিবাকর অতি হালে যা যা শুনেছিলেন তা অকপটে অমিতের কাছে আজ বলে দিলেন সব। আরো বললেন, কোন এক জোয়ার্দার আজকাল শিবানীকে উসকাচ্ছে খুব। লোকটার প্রচুর টাকা—জৌলস আছে বটে, উপরতলায় প্রতিপত্তিও তেমনি,—এমনকি যজ্ঞেশ্বর-বাবু পর্যন্ত নাকি তার কাছে নানাসূত্রে বাঁধা। এ সমস্ত খবর বিশ্বস্তসূত্রে বেনারসে বসেই তিনি পেয়েছেন। অথচ শিবানী এদিকে, তাঁর কাছে, সব গোপন রেখে লুকোচুরি খেলছে শুধু।···এই ত আজ দুদিন হতে চলল, তিনি এখানে এ-বাড়িতে এসে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছেন—শিবানীর দেখা আর পাচ্ছেন কোথায়? বৃন্দাবনও কোনো ঠিকানা জানে না।···দিবাকর থামলেন।

অমিত সব শুনতে শুনতে যেন জমে গেল পাথরের মত!

নিস্তব্ধ ঘরে বসে আছেন দিবাকর আর অমিত।···একটি লোক এসে সংবাদ দেয়, শিবানীর অনেক জায়গা ঘুরে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হবে।

'দেখলেন ত?' দিবাকর ব্যগ্র হয়ে পড়লেন: 'আপনাকে এই সন্ধ্যেবেলায়

আটকে রেখে আমি অনেকটা সময় নষ্ট করলাম আপনার মাষ্টারমশাই।'

'তা'তে কি হয়েছে! আমার কাজের কোন ক্ষতি হয়নি।' অমিত আশ্বাস দিয়ে বলল: 'বরং আপনি যদি চান আমি আরো অনেকক্ষণ বসতে পারি।'

'তাহলে বসুন'—খুশি হলেন দিবাকর: 'আরেক কাপ চা হোক, কেমন?'

বৃন্দাবন দু-কাপ চা ও দুটো প্লেটে খাবার সাজিয়ে আনল এবার।

চা খেতে খেতে দিবাকর জের টানেন তাঁর আগের কথার: 'ভাল আছেন অমিতবাবু,—এখন অবধি বিয়ে করেন নি আপনি।'

'হঠাৎ এই অভিনন্দন কেন?' কপাল কুঁচকে স্মিতমুখে তাকাল অমিত।

'ঈর্ষা! আপনাকে দেখে ঈর্ষা হয়, তাও বোঝেন না?' জবাব দেন দিবাকর, তারপর একটা চাপানিঃশ্বাস ছেড়ে: 'তবে, কার কপালে যে বিধাতা কি লিখে রাখেন কেউ তা বলতে পারে না মাষ্টারমশাই। তবু বলছি, ভালবেসে কখনও যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে আমার অনুরোধ,—শুধু শুধু মেয়ের বাইরটা দেখেই বিয়ে করবেন না। মেয়ের পারিবারিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের খবরাখবর সব ভাল করে জেনে নিয়ে তারপর কাজে এগোবেন।' এতটুকু বলে দিবাকর অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, দৃষ্টিটা দূরে ছেড়ে দিয়ে আপন মনেই বলতে থাকলেন: 'যুক্তি দিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বোঝাতে চান, আবার তর্কও করেন। কিন্তু আমি ও-সব বুঝি-টুঝি না; আমি পরিষ্কারভাবেই বলি, ভালোবেসে বিয়ে করাটা যেন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন বাঙালী গৃহস্থসমাজে ভদ্রজনদের পক্ষে রীতিমত একটা মহাবিড়ম্বনা।'

অমিত আর কিছু বুঝতে পারুক বা না-পারুক এটা ঠিকই বোঝে যে, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় এমনি ধরনের মতামত প্রচারের অধিকার যেমন সকলের আছে তেমনি আছে দিবাকরেরও। তবু এর উপর একটু হাস্যরস ছড়িয়ে সে বললে: 'তার মানে, আপনি ধারণা করে রেখেছেন, আমাদের সমাজটা এখনও তেমন পাকা হয়ে ওঠেনি!'—উড়িয়ে দিল দিবাকরের মনের গুমটভাব, পিছনে যোগ করল আরো কিছু: 'অজানা অচেনা নবীন প্রেমিক প্রেমিকা, কারুকে মধ্যস্থ না-মেনে সরাসরি একে অন্যকে ভালকরে জানবে, চিনবে—এককথায়, পূর্বরাগ জমাবার মত কোনো স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নেই আমাদের এই বাঙালী সমাজে—একথাটাই ত বলতে চান আপনি, না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন।' সহাস্যে হাত বাড়ালেন দিবাকর, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলেন: 'বিয়ে না করলে কি হয়েছে মাষ্টারমশাই,—আপনি ত দেখছি যথার্থ সত্যদর্শী।

'কিন্তু, আপনি যে প্রত্যক্ষদর্শী দিবাকরবাবু।'

হো-হো করে এবার দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। এমনিকরে নানা কথাবার্তায়, হাসিতামাসায় সেদিনের আবহাওয়া শেষের দিকে অনেকটা লঘু হয়ে উঠেছিল ওদের।

বাড়ি ফিরে এল অমিত। রাত্রে শুয়েশুয়ে ভাবছে সে:

মানুষের চাওয়ার শেষ নেই। যার কিছু নেই সে ত চাইবেই; আবার যার আছে সেও চায়। যার অনেক আছে স অনেক বেশি পেতে চায়। দু-হাত যে ভরে উঠল তবু আরো চাই আরো চাই। হায়রে, অনেকে যে আবার জানেই না—কী চায় সে, ভিক্ষারথলি নিয়ে জীবনভোর হা-হুতাশ করে—সে-থলি আর পূর্ণ হয় না! এই বোধহয় জগতের রীতি। ···শিবানী পেয়েছে অনেক—তবু আরো পেতে চায়, কিসের অভাব তার? —অমিত নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল হঠাৎ একটা অন্ধকারের মাঝখানে: কিন্তু এমনতর মনোবৃত্তিই বা কেন শিবানীর? যার অঙ্গে অঙ্গে এতো দীপ্তি, এতো লাবণ্য, এতো আকর্ষণ! ···হুড়হুড় করে জিজ্ঞাসার চাকাটা যেন ঘুরে গেল অমিতের চোখের সামনে। এই সবই কি তাহলে একটা ভোজবাজী?

আর দিবাকরবাবু? ·ওঁর জীবনের অভিজ্ঞতা কটু হতে পারে, তিক্ত হতে পারে, বিষাক্ত হতে পারে—কিন্তু অবহেলা করে একে উড়িয়ে দেবে কে শুনি? ···বিশ্বের দরবারে কি এমনি অসুখী দম্পতির আবির্ভাবই চিরন্তন? একেই কি বলে সংসার?

অমিত হুশিয়ার হল।

শিবানী এ-সবের কিছুই জানল না। অমিতের বাড়ি এসেছিল সে পরের দিন সন্ধ্যাবেলা গান শুনতে, —তারপর কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করলে: 'শকুন্তলার সঙ্গে আর কোন আলাপ হয়েছিল আপনার, ঐ বিষয়ে?'

'আপনি বললে পর মিস্ ত্রিবেদী নাচতে পারেন হয়ত।' অমিত নির্লিপ্তের মত জবাব দেয়: 'আপনি ওঁকে নিজেই বলুন না। আর ওঁকে ডাইরেক্‌শন্ দেবার ভার ত রইল আমার উপরেই—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

শিবানী উৎসাহিত হয়ে বললে: 'নাচের ব্যাপারে আপনাকেই কিন্তু সব ভার নিতে হবে মনে থাকে যেন। আমার ত এখন সময় অল্প জানেনই—এদিকে তেমন মন দিতে পারব না।'

সেবারই অমিত আর শকুন্তলার উদ্যোগে স্কুলের মেয়েরা কলকাতার এবং

মফস্বলের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে নৃত্যনাট্য অভিনয় করে এল কয়েকরাত, সুখ্যাতি পেল প্রচুর। টাকাও উঠল তেমনি।

কিন্তু,—সেই টাকা মহাকালীব্যাঙ্কে জমা দিতে গিয়ে গোলমাল পাকাল শিবানী। প্রথম গোলমালের সূত্রপাত গার্ডিয়ান্‌দের ঘরে ঘরে—সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট মহলে। ক্রমশ এই নিয়ে যখন বাইরেও জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ প্রকাশ পেল, তখন আর ব্যাপারটা গোপন থাকে কী করে! অনেকে ত কাগজে কাগজে খুব জোর লিখলেনও : যে-ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে কেন স্কুলের টাকা রাখতে যাবে শিবানী? এটা 'পাব্লিক্‌মানি' না? ইত্যাকার যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উঠল নানাদিক থেকে। অমিতের কানেও বিশ্বস্তজন মারফৎ শিবানীর এমনতর অপ্রীতিকর কাজের রিপোর্ট গেল দেদার।

বলাবাহুল্য য়ুনিভার্সিটির ব্যাপারটাও এখন অমিত ভালকরেই বুঝতে পারছে। তাই একদিন বৃদ্ধ দীননাথের কাছে পরামর্শ চাইছিল : 'এখানে ক্রমশঃ যা ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছি, কি করি বলুন ত?'

'স্কুলের ব্যাপারে বলছেন? আপনি সেজন্য ভাববেন না।' ভরসা দেন দীননাথ : 'যতদিন আমি আছি কোন ভয় নেই আপনার।'

'আমি নিজের জন্য ভাবি নাকি, দীননাথদা?' সুধিয়েছিল অমিত।

'না তা নয়।' নিজেকে শুধরে দীননাথ বলেছিলেন : 'আপনি ভাবছেন এ-ভাবে মুখোশ এঁটে কদিন কাটবে শিবানীদির! এইত? তা ও-সব চিন্তা বাদ দিন। এবার তিনি নিজেকে যে প্যাঁচে ফেলছেন সে ভারী শক্ত প্যাঁচ। ইউনিভার্সিটির এই টাল সামলানো সোজা কাজ নয়।'

অন্যদিকে, দিবাকরবাবুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে অমিত অ্যালার্ট হয়ে আছে। স্কুলকে এইমুহূর্তে ত্রুটিমুক্ত করা যাবে না, ভাবে অমিত : তা করতে হলে শিবানীর সঙ্গে সাধ্যমত সদ্ভাব রেখেই তাকে কাজ করতে হবে, খোঁচাখুঁচি করে নয়। একদিন সে বললে : 'আপনি ব্যাঙ্কসংক্রান্ত জনগণের কুৎসা নিয়ে আমাকে যা বোঝাতে চাইছেন এসবে আমি ইণ্টারেস্টেড্‌ নই, শিবানীদি। আমার একটা আবেদন, মিস্‌ ত্রিবেদী যখন আজকাল স্কুলে নাচ শেখাচ্ছেনই এবং এতে তাঁর এফিশেন্সিও লক্ষণীয় তখন তাঁকে এজন্য আলাদা দক্ষিণা দেবার বিষয়টা আপনি একটু দরদ দিয়ে বিবেচনা করুন—কেমন?' অমিতের এই অনুরোধ শিবানী রেখেছে। অমিত খুশি থাকলে শিবানীর দুর্ভাবনা নেই। আর শিবানীর তৈরি হিসাবের খুঁটিনাটি পর্যন্ত যখন সে যাচাই করতে চায় না বলছে, তখন অমিতের প্রতি শিবানী ত স্বভাবতই কৃতার্থ হয়ে থাকবে।

অমিতও কিন্তু এ যাত্রা শিবানীকে চিনল আরেকটু, এবং দিবাকরবাবুর সন্তসাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করে মুখবুজে শান্ত হয়ে রইল শুধু।

অনেকদিন পর……

সুললিতা বটব্যাল আবার স্কুলের কাজে এসে যোগ দিয়েছে।

টিফিনের ছুটিতে টিচার্সকমনরুমে, অমিতের অনুপস্থিতিতে, সব টিচাররা যখন প্রতিদিনকার মত বিশ্রান্তালাপে জমায়ৎ তখন এরমধ্যে হঠাৎ সুললিতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'একটা খবর পেলাম শিবানীদি, নিখিলবঙ্গীয় নারীশিক্ষা-সমিতি মেয়েদের স্কুলে মেল্‌টিচার্ না রাখার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং এটা য়ুনিভার্সিটিতে চালু হয়ে গেলে আমাদের খুব সুবিধা হবে কিন্তু।'

আলাপটা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর। সকলেই এতে ক্ষুণ্ণ ও বিস্মিত হবার কথা। বিশেষত মেল্‌টিচার্স এখানে থাকায় শিবানী পড়ে গেল এক অকওয়ার্ড পজিশনে এবং এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ থামাবার উদ্দেশ্যে গম্ভীরমুখে বললে : 'সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। আর, এই নিয়ম যদিও বা চালু হয়, পুরানো টিচার্স সব স্কুলে যে যেমন আছেন তেমনি বহাল থাকবেন। হয়ত নূতন মেল্‌টিচার আর নেওয়া হবে না, —এইমাত্র।'

খানিকবাদে সুললিতা আবার বলে : 'আমার সঙ্গে সেদিন শেফালির দেখা হয়েছিল, বি-এ পাশ করে বসে আছে বাড়িতে। তাকে কি আমাদের স্কুলে আনা যায় না? আপনি ত শুনেছেন শিবানীদি, কেমন চমৎকার গান করে সে। যদি আসে, তাকে দিয়ে আমরা গানের ক্লাশও করাতে পারব।'

শিবানী নিঃশব্দে ভাবছে, —এবার এসে অবধি সুললিতা এ-বিষয়টা তার কানে আরেকবার তুলেছে সকলের অসাক্ষাতে, কোন জবাব পায়নি। শিবানী একাই জানে, যে, সুললিতার আক্রোশ অমিতের ওপর। সেই আক্রোশ মেটাবার উদ্দেশ্যেই সে তার সহপাঠী ডঃ দীপালি ভৌমিকের বোন শেফালির জন্যে কোমর বেঁধে তদ্বির করছে, যুক্তি টানছে এই বলে যে, শেফালিকে সাধারণটিচার হিসাবে নিয়ে গানের ক্লাশ করতে দেওয়া হলে স্কুলের খরচ বাঁচে অনেক। তখন আর অমিতলাহিড়ীরই বা দরকার কি—ইত্যাদি।

শিবানী মনেমনে হাসল, বলে : 'তোমার শেফালি আগে আসুক, দেখা যাবে খন'। কিন্তু ভুলে যেও না বিউটি, গান-শেখানো আর বই-পড়ানো একজিনিস নয়। ছাত্রছাত্রীরা বই পড়ে, কেননা না-পড়ে উপায় নেই ওদের; কানমলা খেয়েই পড়তে হয়। কিন্তু গান যে অন্য জিনিস, এখানে কানমলা একটিবার খেলে পর গান কারুর গলা দিয়ে বেরুবেই না,—আশেপাশে যারা দেখবে তারাও ভিরমি খাবে।'

শিবানীর মুখের দিকে উপস্থিত শিক্ষকশিক্ষিকারা স্তব্ধমুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এই সুযোগে শিবানী আরো বলতে থাকে: 'বিষয়টা, চোখের সামনে বরাবর প্রত্যক্ষ করেও, আমরা বড় কেউ বুঝতে চাইনা। কিন্তু বোঝা দরকার, যে, গান-শেখা আর লেখাপড়া-শেখার মধ্যে তফাৎটা কিসের? যেমন ধরুন, এখানে সবাই টিচার্স—লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। দেখবেন, এমনসব ছাত্রছাত্রী আছে তারা গোড়ায় বেশ কাচা, অনর্গল ভুল করছে এখানে-সেখানে। কিন্তু পরীক্ষায় অ্যাগ্রিগেট-এ পাস্‌মার্ক পেলে ওদের প্রমোশন আটকে থাকে না এবং এ-ভাবে বি-এ, এম্‌-এ পর্যন্ত দিব্যি উৎরে আসে ওরা। তারপর আর কে ওদের বিদ্যা যাচাই করতে যায়? আর যাএকটু বিদ্যা কষ্টেসৃষ্টে ওরা আয়ত্ত করেও-বা—সেটুকুও যদি কালচক্রে ভুলে বসে থাকে, সেজন্য কোনদিক থেকে কোন মর্যাদার হানি ঘটে না কারুরই। আমরাও ঐ ভুলত্রুটি সহ্য করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু গান শিখবার বেলায়? ঐ যে অতিসাধারণ সার্গমের মাত্র সাতটা স্বরকে ভাল ও নির্ভুলভাবে গলায় তুলতে না পারলে কারুর বিদ্যা এক তিলও এগোবে না। পরীক্ষা-পাসের সার্টিফিকেট্‌ ত এখানে প্রায় একটা ফার্স বা প্রহসনের ব্যাপারই বলা যায়। কারণ গানের পরীক্ষা গায়কগায়িকাদের, সে তাঁরা নূতন শিক্ষার্থী কিংবা অতি পুরানো ওস্তাদই হোন না কেন, প্রতি মুহূর্তেই দিতে হচ্ছে, যে মুহূর্তে গান গাইছেন সেই মুহূর্তেই—শ্রোতাদের সামনে, সমালোচকদের সামনে, আনাড়িদের সামনে—এক্ষেত্রে তাঁদের ভুলত্রুটি সামান্যতম হলেও কেউ সহ্য করে না। কাজেই এ-বিদ্যা চর্চার শেষ কোথায়? জীবনভোরই ত চলতে থাকে এর সাধনা!' একটানা এতখানি বলে শিবানী হাঁফছাড়ল, ফের বলে: 'এ সম্বন্ধে বলবার অনেক আছে। কিন্তু বড়দুঃখিত, আপনাদের কাছে এক্ষুনি সব কিছু গুছিয়ে সুন্দর করে বলতে পারলাম না আমি। তবু এরপরেও আপনারা ভাবুন, —গান ভালকরে শিখে নিয়ে সেই শিক্ষা আমরণ কাজে লাগাতে না পারলে গীতার্থী কিন্তু একেবারে দেউলে হয়ে বসেন, সামান্য গাইয়ে হিসেবেও তার কোনো স্বীকৃতি মেলে না। এটা গাইয়েদের জীবনে মস্তবড় এক ট্র্যাজেডি নয় কি!' শ্রোতারা সকলেই চুপ।

'মিউজিক বড় ডিফিকাল্ট্‌ সাবজেক্ট, বিউটি!' সুললিতার দিকে চেয়ে শিবানী বলে: 'তাছাড়া আমাদের এ-সব জেনারেল স্কুলে বিচিত্র ধরনের বেসুরো বেতালাদের নিয়ে গানের ক্লাশ ম্যানেজ করার মধ্যে যে কী ঝক্‌মারি, সেটা ত তুমি তলিয়ে দেখছ না! অ্যাবাভ্‌ অল্‌ উয়ীশুড্‌ নেভার ফরগেট্‌ দ্যাট্‌ আওয়ার স্কুল ইজ নট্‌ এস্কুল্‌ অব্‌ মিউজিক—স্টিল্‌ দেখতে পাচ্ছ ত আমাদের স্কুলের কত

ডিম্যাণ্ড শুধু এই মিউজিকেরই জন্যে। এমনটি কলকাতায় আর কোথাও আছে, দেখাতে পার?'

এবার শ্রোতাদের মাঝ থেকে দু-একজন শিক্ষক শিক্ষিকাও বলবার সুযোগ পান, সোৎসাহে বলেন: 'সত্যি শিবানীদি, এ কাজে কিন্তু আমাদের অমিতবাবুর ক্ষমতা অদ্ভুত, অসম্ভব—এটা মানতেই হবে।'

'এই ত আপনারা বোধ হয় অনেকে দেখেছেন, না দেখলেও শুনেছেন নিশ্চয়' —শিবানী ঢোক গিলে নিয়ে নবউদ্যমে বলতে থাকে: 'অমিতবাবুর নামটা যখন তুললেনই তখন এখানে বলি, তিনি আসবার আগে প্রায় একবছর সময়ের ভিতরই ভাল পাশ করা গানের মাষ্টার দুজন এসেছিলেন আমাদের স্কুলে।'

শিবানীর এই কথার মধ্যেই সুললিতা স্বীকার করল, এটা তার মনে আছে।

'ওঁরা কি পেরেছিলেন ক্লাস নিতে?' প্রশ্ন তুলেই শিবানী বলে যায়: 'একদিন কি দুইদিন ক্লাস নেবার পর আমায় বললেন, মেয়েরা বড্ড হট্টগোল করে, সকল মেয়েদের নিয়ে এ-ভাবে গানের ক্লাস হয় না। সুর-চর্চার জন্য আরো স্থিরতা ও নির্জনতা দরকার; তাই বেছে-বেছে শুধু সুরেলা-সুকণ্ঠীদের নিয়ে তাঁরা চাইছিলেন ক্লাশ করতে!' একটু থামল শিবানী: 'হাঁ তাঁদের এই কথা যুক্তিযুক্ত হলেও স্কুলকমিটি কিন্তু তা মানলেন না। কমিটি অন্যদিক থেকে বিচার করে বললেন, গান ত সকল মেয়েই শিখবে—এখানে আবার বাছাবাছি করতে যাব কেন? মিউজিক-স্পেশালিষ্ট-টিচার যদি একাজে অসুবিধা মনে করেন তাহলে আপনারা নিজেরাই তা সেরে নিন। সব স্কুলেই ত তাই হচ্ছে।—কী করি, অগত্যা ঐ মিউজিকটিচারদের আমি বললাম: Community song ই না-হয় শিখিয়ে যান মেয়েদের। এ প্রস্তাবে তাঁরা মনে মনে ক্ষুন্ন হলেন, আমাকে বোঝালেন নানাভাবে, যে, গান-শেখানো আর গান-গাওয়ানো—এক জিনিস নয়। গান শেখাতে হলে তার জন্য বিশেষ রকমের স্বাস্থ্যকর ও উপযোগী পরিবেশ সর্বাগ্রে তৈরি করতেই হবে যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহজে অবাধে ঐ বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হবার সুযোগ পায়। আর, গান গাওয়াতে হলে? তারজন্যে ভাববার তেমন কিছু বড় প্রয়োজন আসে না। কারণ গান যখন-তখন গাওয়ানো যেতে পারে যাদের কণ্ঠে সামান্যতম সুর আছে তাদের ডেকে নিয়ে—যে-কোন পরিবেশে, ইত্যাদি—প্রাসঙ্গিক অনেক মূল্যবানজ্ঞাতব্য কথা বললেন তাঁরা। তা থেকে এটুকু বেশ বোঝা গেল, যে, এঁরা যেমন সঙ্গীতশিক্ষক তেমনি মনেপ্রাণে সঙ্গীতের পূজারীও—সঙ্গীত এঁদের পূজার নৈবদ্য। এ জিনিস ত যেমন তেমন ভাবে যেখানে-সেখানে তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন না—এতে যে

তাঁদের শাস্ত্রের অপমান হয়। আর বস্তুত তাঁদের এই সেন্টিমেণ্ট্‌কে আমিই বা অশ্রদ্ধা করি কী করে! কিন্তু আমাদের কমিটি সেদিকে নজর দিলেন না, আমিও চুপ করলাম। তারপর ত আপনাথেকেই স্কুল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন ওঁরা।'

ঘটনাটা সত্যি, সুতরাং এ নিয়ে কিছু বলার নেই কারো।

"অথচ, দেখুন ত"—শিবানী সবাইকে যেন আবার সাক্ষী মেনে বলে: "এই অমিতবাবু আমাদের স্কুলে প্রথমদিন এসেই বলেছিলেন, গানের ক্লাশে কোন বাছাবাছি তিনি পছন্দ করেন না। তাঁর মুখ থেকে এইসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কত সুন্দর-সুন্দর কথাই না শুনেছি, 'গান যারা গায় তারা সকলেই যে গাইয়ে হয়ে ওঠে তা ত নয়, কিন্তু এতে ওদের আনন্দের একটা শক্তি বেড়ে যায়, সেটাতে মানুষের কম লাভ নয়। তাছাড়া গান ত বাইরের মধ্যে হাততালি পাবার জন্য নয়, গান ঘরের মধ্যে মাধুরী পাবার জন্যই।' —অবশ্য উপরোক্ত সঙ্গীতবিদ্-শিক্ষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বিচার করতে বসি, তাহলে কবিগুরুর এই উক্তি-গুলির মধ্যেও বিতর্কের অবকাশ আছে—কবি নিজেও তা প্রকারান্তরে স্বীকার করে গেছেন, তা আপনারা রবীন্দ্রসাহিত্য পড়লে নিশ্চয় জানবেন। যাক্ সে সব অন্য কথা। তবে আমাদের অমিতলাহিড়ী যে ভারতীয়সঙ্গীতে বিশেষ নিষ্ঠাবান —এ ত সর্বজনস্বীকৃত কৈ তাঁর মধ্যে ত কোনো প্রকারের গোঁড়ামি দেখিনে আমরা। তিনি যোগ্য-অযোগ্য সবাইকে এ-বিদ্যা শিখিয়ে নিশ্চয় সঙ্গীতশাস্ত্রের অপমান করছেন না! আসলে হল, অন্তরে শিক্ষাদানের আস্পৃহা থাকা চাই! অমিতবাবু কী অক্লান্তভাবে হাসিমুখে প্রায় হাজারের ওপর এত সব মেয়েদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, আজ কত বৎসর হতে চলল, কোন অনুযোগ নেই তাঁর মুখে। সর্বোপরি, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, আমাদের স্কুলের যত সুখ্যাতি আজকাল—তা ঐ গানের জন্যই।"

'শুধু গান কেন, নাচও তো।' শিক্ষকদের মাঝ থেকে অবনী ঘোষাল মন্তব্য করলেন: 'আপনি হয়ত জানেন না শিবানীদি, আশেপাশে কত প্রতিষ্ঠান ওৎ-পেতে বসে আছে,—নানাসূত্রে সুযোগ খুঁজছে অমিতবাবুকে নেবার জন্য। কত প্রলোভন পর্যন্ত দেখায় ওঁকে!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও নিজের কানে শুনেছি'—এবার কথা বলেন চারুশীলা: 'এই তো সেদিন বালিগঞ্জ পূর্ণিমা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ওঁকে বললেন, দ্বিগুণ সুযোগ সুবিধা দিতে তিনি প্রস্তুত যদি অমিতবাবু তাঁর ওখানে যান।'

'জানি আমি, সবই জানি।' উপস্থিত সকল টিচারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

শিবানী এখানে তার জোরালো অভিমত রাখে : 'অবনীবাবু, চারুদি এঁরা কিন্তু ঠিকই বলেছেন।'

বর্তমান আলাপের শুরু থেকেই শিবানী চেষ্টা করছিল অমিতের প্রসঙ্গ যাতে এখানে না-ওঠে। কিন্তু সে-চেষ্টা টিকিয়ে রাখতে পারল না। আপ্না থেকে ঐ প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়েছে তখন এই অবকাশে শিবানী আরো জানিয়ে রাখতে চায়, প্রবল উৎসাহ নিয়ে বলে : 'অমিতবাবুকে নেবার জন্য অনেক জায়গা থেকেই বড় বড় অফার্ এসেছে। ঐ সম্পর্কীয় চিঠিপত্র সব আমার চোখে দেখা। যাঁরা অফার্ নিয়ে সশরীরে এসেছেন তাঁদের কাছেও বলতে শুনেছি অমিতবাবুকে : অর্থসঞ্চয় ত আমার জীবনের মুখ্যউদ্দেশ্য নয়। আমি চাই—সাধারণের মধ্যে আমার শিক্ষালব্ধ বিদ্যার প্রচার, এবং সেজন্য এইস্কুলের কাছে আমি বহুলাংশে ঋণী। এ স্কুলকে হাতে-গড়ে তোলা আমার পক্ষে স্বচ্ছন্দ ও সম্ভব হয়েছে কারণ এখানে না-চাইতেই আমি পেয়েছি অনেক! এখন বেশি টাকার লোভে এ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া আমার কখনও উচিত নয়। আর, সংসারের হাটে বসে দাম বাড়িয়ে নিজেদের কেনাবেচা করার উপলক্ষ্যেই যদি বিধাতা আমাদের পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন, সেই ধর্মেও আমার কোন মতি নেই। আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন। —ব্যস্, থ বনে যান ওঁরা, নিরাশ হয়ে ফিরে যান সবাই। …তাহলে দেখুন দিকি আমিও বলি—অমিতবাবুর এই ত্যাগের মূল্য আমাদের তরফ থেকেই বা কতটুকুন দেওয়া হচ্ছে!!' এতটা বলে হাতঘড়ির উপর নজর পড়তেই শিবানী সহসা তার আলাপের মোড় ফেরালো : 'ভালোকথা আপনারা শুনুন, আমায় শকুন্তলা বলছিল গানের একটা থিয়োরেটিক্যাল ক্লাস খোলাবে অমিতবাবুকে দিয়ে—'

'দ্যাট্স্ গুড্ আইডিয়া'—প্রস্তাবটা লুফে নিলেন অবনী ঘোষাল, বলেন : 'তাহলে আমাদের মত গলায় যাদের সুর নেই তারা অন্তত গানের বিষয় কিছু-না-কিছু জানতে পারবেন এই সুযোগে। কোথায় শকুন্তলাদি?'

শকুন্তলা তখন ঐখানে ছিল না। তাকে এই মুহূর্তে সামনে পেতে উৎসুক হলেন সবাই। এবং বস্তুত তার এইকাজে উৎসাহ ও সমর্থন এল উপস্থিত আরো কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও।

শিবানী এ সব দেখে শুনে বেজায় উৎফুল্ল, বললে : 'এ নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা করা যাবে খন পরে অমিতবাবু আর শকুন্তলার সামনেই।'

তক্ষুনি টিফিন-পিরিয়ড শেষ হওয়ায় সব টিচাররা যার-যার ডিউটিতে বেরিয়ে পড়লেন। থাকলেন শুধু চারুশীলা, কারণ এখন তাঁর কোন ক্লাশ ছিল

না ; সতৃপ্তিতে বললেন : 'এই শকুন্তলা মেয়েটি কিন্তু সবকাজে উদ্যোগী এবং ভারী ডিউটিফুল, না, শিবানী ?'

'হ্যাঁ আপনি তাহলে লক্ষ্য করেছেন'—শিবানী বলে : 'সত্যি, ও কাজে জোয়েন্ করার পরই স্কুলটাকে একটা সুন্দর শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে এসেছে। সেদিন শুনলেন ত কী সুন্দরভাবেই না বলল আমাদের সবাইকে,—মেয়েদের মন আজও ঢের সংকীর্ণ—এই মন নিয়ে ওদের ছলাকলার কাজ চলে, চলে আসছে সৃষ্টির আদি থেকেই ; কিন্তু এই ভ্যানিটিকে আঁকড়ে ধরে শিক্ষকতা হয় না। অনেক স্যাক্রিফাইস্, অনেক বড় মন না-হলে টিচার হওয়া অসম্ভব। এরও একটা ট্র্যাডিশনেল্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড চাই বৈকি ! —হ্যাঁ আমিও জিজ্ঞেস করি চারুদি, শকুন্তলার এ-সব কথা কি আমরা কেউ খণ্ডন করতে পারি ? বলুন !'

শিবানীর এই কথাগুলিই সুললিতা ক্লাশে যেতে-যেতে শুনে গেল।

ছুটির পরে সবাই বাড়ি চলে গেলে, সে ধরল শিবানীকে : 'আপনি অত্যন্ত বেশি সরল মন নিয়ে সব কিছু বিচার করেন শিবানীদি। এই শকুন্তলার মধ্যে এমন কি পেলেন, আমি ত খুঁজেই পাচ্ছি না ! তাঁকে বড় আশ্‌কারা দিয়ে উপরে তুলছেন আপনি, অথচ'—হিংসায় ফেটে পড়ে সুললিতা, তার গোলগোল চোখবাঁকিয়ে নীচুগলায় বলে : 'আরেকটা দিক দেখছেন না ! আমার খুব বিশ্বাস, শকুন্তলা অন্যদলের মানুষ।'

'তাতে হয়েছে কি ?' শিবানী ঠাণ্ডাগলায় বোঝায় : 'আমাদের হল কাজ নিয়ে কথা। যার কাছ থেকে ভাল কাজ পাব, তাকেই রাখব। থাক্‌না যে-কোন দলের লোক সে। তবে তুমি ভয় পেওনা বিউটি। আমার নজর কিন্তু আছে সবদিকেই।'

ক্ষনিক নীরবতার পর সুললিতার জিবে আসল কথাটা ফুটে বেরুল : 'অমিতবাবু সম্বন্ধেও আমি এবার যা রিপোর্ট পেয়েছি, —বিশেষ সুবিধার নয়।' কিছু না ভেবেই মনের জ্বালায় বলে ফেলল : 'লোকটার চরিত্র সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।'

শিবানী এবার হাসি চাপল, কিছু বলল না। সুললিতা তবু শোনাতে থাকে : 'মানুষটা কারুকেই গ্রাহ্য করেনা একদম। বিশেষত সকল মেয়েদের সঙ্গে গায়ে-পড়ে কথা বলে—'

'কেন, তোমায় কিছু বলেছেন নাকি এবার ?'

'ঈশ্। ভারী ত, —আমি ওর দিকে তাকাই-ই নি। আমায় দেখে ও-ই জিজ্ঞেস করেছিল, ভাল আছেন ত মিস্ বটব্যাল্ ? বড্ড রোগা হয়ে গেছেন

দেখছি। বলেই না, কী হ্যাংলার মতো আমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিলে, তারপর যেতে-যেতে বেহায়ার মত আরো বললে, তবে গায়ের রংটা আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্রাইট অ্যাণ্ড্ অ্যাট্র্যাক্‌টিভ্ মনে হচ্ছে।'

আর কিছুতেই হাসি আটকাতে পারল না শিবানী।

'আপনি হাসছেন শিবানীদি! আজকাল বেশি মোটা হয়ে গেছি, শরীরের ওজনও বেড়ে গেছে, আর গায়ের রংটা একটু কাল্‌চে হয়ে গেছে বলেই ত এভাবে ঠেস্ দিয়ে কথা বলল আমাকে' —বলতে বলতে সত্যই দুঃখ অভিমানে স্থললিতার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে আসে, চোখ ওঠে ছলছলিয়ে।

শিবানী তখনও মুখে রুমাল চেপে হাসছে, ঐ হাসি সংবরণ করে বললে: 'বেশ ত, তুমি আর অমিতবাবুর ওদিকে যেও না। কেউই ত বড় একটা যান ওঁর চেম্বারের দিকে।'

'সেইজন্যই ত বলছিলাম'—স্থললিতার গলায় এবার আহ্লাদে রস উথলে ওঠে: 'নারীশিক্ষাসমিতির প্রস্তাবটা য়ুনিভার্সিটিতে চালু হয়ে গেলে আমাদের কত স্থবিধা হত। মেল্ টিচারদের সরিয়ে দিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বেশ থাকতে পারতুম। তাছাড়া আপনাকে বোধহয় বলিনি' —থেমে স্থললিতা খুব ভাবগম্ভীর মুখে জানাল, গতকাল রাত্রে তার বাবা মিঃ বটব্যালের কাছে একজন নূতন ব্যারিষ্টারকে নিয়ে এসেছিলেন যজ্ঞেশ্বরবাবু। ওঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, স্কুলের বর্তমান পরিস্থিতিতে মেল্‌টিচারদের সরিয়ে দেওয়াই নাকি নিরাপদ। স্থললিতা বলতে-বলতে হাসে: 'এঁনারা যদি আমাদের মুখের কথায় আপনা থেকেই সরে যান ত ভালই। তা নৈলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে দিয়ে যে কোন রকমেই হোক অর্ডার করিয়ে নিতে হবে একটা।'

রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করে, স্থললিতাও তেমনি আচ্ছন্ন করল শিবানীকে।

…কিন্তু শিবানী যে অমিতকে বাদ দিয়ে কিছুতেই কিছু ভাবতে পারে না।

এই ত বছরের শেষে স্কুল-কমিটি পুনর্গঠন সম্বন্ধে আবার য়ুনিভার্সিটি থেকে একটা রিমাইন্‌ডার্ এল; —তাই নিয়ে শিবানী ছুটল অমিতের কাছে।

শিবানী তাদের আগের অর্ডার মত এতদিন কিছু করেনি, বরং অর্ডারটা অমান্য করারই চেষ্টা করেছে। অমিত তা'তে খুব বিরক্ত হল, কিন্তু বিরক্তি চেপে রেখে শান্তগলায় জবাব দেয়: 'আমি আপনার অধীনস্থ সামান্য একজন কর্মচারী মাত্র। এ সব বিষয়ে কোন পরামর্শ আপনি আমার কাছে আশা করেন কেন শিবানীদি? আই ডু রিকোয়েস্ট ইউ টু ফর্‌গিভ্ মী দিস্ টাইম্।'—দুই হাত জোড় করেই বলল কথাটা।

খাঁটি কথা। শিবানী নীরবে বেরিয়ে আসে।

সে নিজেই যখন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্ এবং সেক্রেটারি তখন এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ত তারই ওপর। কর্তৃপক্ষ হুমকি দিয়েছেন, অর্ডার অমান্য করলে এবার নির্ঘাৎ নূতন বৎসরের প্রথমে স্কুল ডিস্‌অ্যাফিলিয়েটেড্ হবেই হবে। এই ক্ষেত্রে শিবানী নির্ভাবনায় বসে থাকতে পারে না। লীগ্যাল্ অ্যাড্‌ভাইসারদের নিয়ে অবিলম্বে একটা ঘরোয়া মিটিং বসালো সে যজ্ঞেশ্বরবাবুর অফিস্-বিল্ডিং-এ।

'আমায় এবার ছেড়ে দিন মিসেসমুখার্জি। আর কেন টানছেন এ-সবের মধ্যে!' একটু কাতর ভাবেই অনুরোধটা প্রকাশ করেন যজ্ঞেশ্বর।

'না, আপনাকে ছাড়তে পারিনে কিছুতেই।' শিবানী গোঁ ধরল: 'হোক্ স্কুল ডিস্‌অ্যাফিলিয়েটেড্; আপনার জিনিস আপনারই ত সব। আপনাকে বাদ দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। ওরা হুকুম দিল বলেই কি সেই ভয়ে ছেড়ে দেব আপনাকে? কী যে বলেন আপনি!'

এটর্নী, ব্যারিষ্টার, অ্যাড্‌ভোকেট্‌রা বসলেন।

সাব্যস্ত হল: য়ুনিভার্সিটিকে জব্দ করতে হবে। আইনের সাহায্যে নূতন একটা সমিতি গড়ে নিয়ে তা যথানিয়মে রেজিস্ট্রী করিয়ে নেবেন এই উপস্থিত আইন-বিশারদ্‌গণ। সমিতির নাম দেওয়া হবে, সোসাইটি অব্ গার্লস্ ওউন্ একাডেমি। যাঁদের বাদ দিয় স্কুলের নূতনকমিটি গঠনের নির্দেশ য়ুনিভার্সিটি দিয়েছিলেন, তাঁরাই বিশেষভাবে এই নূতনসমিতির সদস্য থাকবেন; বাইর থেকেও দু-একজন লোক নেওয়া যেতে পারে এরমধ্যে। দি আলিপুর গার্লস ওন্ একাডেমির সকল রকম শুভচিন্তা করবেন এই নূতন সোসাইটি। মোটকথা, সাধারণ উদ্দেশ্য যা, তা সমস্তই সময় ও প্রয়োজনমত কাগজেপত্রে ছাপিয়ে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে সোসাইটিব মুখ্য এবং প্রধান উদ্দেশ্যটাই থাকবে গোপনে, অলিখিতাবস্থায়;—সেটা হল: গার্লস্-ওন্-একাডেমির যাবতীয় সম্পত্তি আইনের কৌশলে উক্ত নবগঠিত সমিতির নামে ট্রান্সফার করিয়ে নেওয়া। এই পরিকল্পনা সফল হলে কর্তৃপক্ষের আদেশ রক্ষা করা এবং যজ্ঞেশ্বরবাবু প্রমুখ অমনোনীত হিতৈষীদের প্রকারান্তরে স্কুলের সংস্পর্শে রাখা—দুই কাজই সিদ্ধ হবে।

কার্যতঃ হলও তাই।

য়ুনিভার্সিটি এ-সমস্তের কিছুই জানল না—শিবানীও নিরুত্তর।

তারপর,—প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই এক সন্ধ্যায় শিবানী আবার অমিতের বাড়ি না গিয়ে পারল না থাকতে। খানিকক্ষণ গানবাজনার পর চায়ের টেবিলে বসে ঘটনাটা গল্পকরে শোনাল অমিতকে;—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই বলে ফেলল সব।

তা শুনতে শুনতে অমিত যেন এক ভৌতিকস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যায়, বিমর্ষ দৃষ্টি মেলে শুধু এটুকু বলতে পারে: 'কাজটা বোধহয় ভাল হল না শিবানীদি।'

শিবানী তখন ভিন্ন স্কেলে তার স্বর বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু অমিতের মন যে তার বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন যাবৎ সন্দিহান হয়ে আছে,—সে খবর ত শিবানী রাখে না। কাজেই তার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়াতে ইদানীং অমিতের চেহারায় যতই বিষণ্ণতা ফুটে উঠুক না কেন ও সবের উপর কোন গুরুত্ব দিল না শিবানী। উপরন্তু অমিতকে উৎসাহিত করার চেষ্টা নিয়ে বোঝালো, যে, শুধু সততার মধ্যে কোনো উন্নতির আশা নেই, উন্নতির জন্য যুগোপযোগী পথ অবলম্বন করাই বর্তমান জগতে বুদ্ধিমানের কাজ। সঙ্গে-সঙ্গে নজিরও টানতে যাচ্ছিল। সেখানে বাধা দিল অমিত, বললে: 'কিন্তু এই যে য়ুনিভার্সিটির অজ্ঞাতসারে স্কুলের বেনামাভাবে একটা কমিটি বা সমিতি যাই বলুন, আপনারা গঠন করলেন— এটা কি খুব ন্যায়সঙ্গত হল শিবানীদি? ইস্কুলের অভ্যন্তরীন কার্যকলাপ সমস্তই ত য়ুনিভার্সিটি একদিন তদন্ত করতে আসবে, তখন যে ভূরি-ভূরি মিথ্যাকথা বলতে হবে আপনাকেই।'

'আরে রাখুন। য়ুনিভার্সিটির আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। এ-করতে গেলেই ত এক্‌সট্রা কাজ বাড়বে ওঁদের! একটা স্কুলের খবর নেবার জন্য এত ঝক্কি পোহাবে ওঁরা,—তবেই হয়েছে! দেখবেন, আমি বলে রাখছি এসমস্ত স্রেফ চাপা পড়ে যাবে। আর যদিও বা দৈবাৎ তদন্ত করতে কেউ এসে পড়ে কোনদিন, তখন অবস্থা বুঝে কি আর ব্যবস্থা করতে পারব না? সভ্যজগতে এরও ত নানারকমের উত্তম ঔষধ আছে।' একটু থেমে শিবানী দৃঢ়তার সঙ্গে বলে: 'আজও বলি, আপনি নিতান্তই ছেলেমানুষ। তবে একথা মনে রাখবেন মাষ্টারমশাই, ঠিক আইনমত চলতে পারলে কিন্তু অনেকসময় অনেক অন্যায় কাজ করেও উৎরে যাওয়া যায়। তারপর'—নীচুগলায় শান্তভাবে হঠাৎ এক নূতন সংবাদ দিল শিবানী: 'স্কুলগুলোও আর বেশিদিন হয়ত থাকছে না য়ুনিভার্সিটির আণ্ডারে—তা জা'নন?'

শিবানী এতসব বলে যাচ্ছে—একান্তভাবে বিশ্বাস করেই ত বলছে। তাই ভেবে তার উপর কোথায় যেন একটু মমতা হল অমিতের। মমতার সঙ্গেসঙ্গে দুর্বলতা আসেই আসে, সুতরাং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিবানীর প্রতি কোন কঠিন বিরূপ ভাব দেখতে না-পেরে সে কৌতুককরে বলে বসল: 'আপনি যে আমায় এসব কথা বললেন শিবানীদি,—জানেন ত, শিক্ষাবিভাগের বড় বড় কর্তাদের আমার এখানে নানাসূত্রে প্রায় নিত্যি আনাগোনা। এখন যদি গোপন না থাকে?

'আজ্ঞে সেটা ভাল করে জেনেই বলেছি।' জবাবটা অমিতের প্রশ্নের পিঠপিঠ শিবানী দিল, আর ঐসঙ্গে ঘাড় বাঁকিয়ে কটাক্ষে এমন নিবিড় হাসি হাসল যাতে মুনিঋষিদেরও ধ্যানসাধনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়—কণ্ঠস্বরেও তেমনি মধুরতা এনে বলল আরো: 'আপনাকে দিয়ে এসব কাজ হবে না, ককৃখনো হতে পারে না। আপনার মত লোকের মন যদি ঐসবের দিকে ঝোঁকে তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাত্ত্বিকরূপ টিকে থাকবে কিসের জোরে,—বলুন দিকিন?'

মর্ত্যের মানুষ ত ছাই, এমনতর স্তুতির কাঙাল ত স্বর্গের দেবতাগণও।

অমিত শিবানীর কথার প্রত্যুত্তরে চলতি নিয়মে একটুখানি প্রসন্নহাসি ছড়াল বটে, কিন্তু তার মন ভরে ওঠে এক অজানা আতংকে: শিবানী কি তাকে সত্যিসত্যি ছলেকৌশলে এজগতের যুগোপযোগী মানুষ গড়ে নিতে চলেছে কিনা—তাই বা কে জানে! যাইহোক অমিত এখানেও আরেকটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেল নিজেকে সতর্ক করে রাখবার?

অমিতের দিক থেকে কোন জবাব না পেয়ে শিবানী চায়ের কাপ নিঃশেষ করে পরমুহূর্তে একটা শোভন ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়াল এবং সামনেই টেবিলের ওপর ঝোঁকে অমিতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে: 'এত নোংরাকাজ করবেন আপনি! পারবেন আমার বিরুদ্ধে কারো কাছে নালিশ করতে?'

'যদি কখন করে ফেলি;—সঙ্গ দোষে?'

'আ-হা-হা! আপনাকে বুঝি আর চিনিনে আমি?' এবার নিঃসন্দেহের হাসি হেসে বলল বাকীটুকুন: 'তাহলে আর, আপনাতে এবং অতি সাধারণ লোকেতে তফাৎ রইল কোন জায়গায় মাষ্টারমশাই?'

এর পরে উত্তর দেবার আর কোন ভাষা জুটল না অমিতের।

শিবানীও রাশিপরিমাণ রহস্য আর হেঁয়ালির ধুয়া ছড়িয়ে রেখে ধীরে-ধীরে নিজেকে অদৃশ্য করে নিল একসময়।

…এর পর কয়েকটা মাস কেটে গেছে।

শিবানী যত সহজ ভেবেছিল, কাজটা কিন্তু তত সহজে মিটল না।

স্কুলের মধ্যে যখন পাব্‌লিকের স্বার্থ আছে তখন এ-নিয়ে নাড়াচাড়া পড়বেই—দুইদিন আগে নয়ত দুইদিন পরে—এই যা। মনে পড়ল শিবানীর, অমিতও এরকমের কথাই বলেছিল তাকে। কাজেই একটা ধামাচাপা দেবার কাজে শিবানী ব্যস্ত হয়ে পড়ল বড় বেশি। তবে একটা সংবাদে সে আশ্বস্ত (যদিও আগে থেকেই জানত কিছু-না-কিছু) যে, স্বাধীনতালাভের পর নাকি দেশের শিক্ষাবিভাগগুলিতেও আইনকানুনের কড়াকড়ি আদালতের মতই সক্রিয়

হয়ে উঠেছে। ঠিকমত খরচপত্র করতে জানলে সেখানেও কোন কাজ আটকে থাকে না আর। স্কুল-কমিটির লীগ্যাল্অ্যাড্ভাইসার হলেন সুললিতার বাবা এটর্নী কে-পি বটব্যাল। তাঁর কাছে শিবানী গেল। কিন্তু কেন জানি একটুও মনঃপূত হল না তাঁর উপদেশ। তাই রাগ করে বেরিয়ে এসেছিল। বৃদ্ধ বটব্যাল্ তবুও পিছন থেকে ডেকে বলছিলেন ওকে: 'এসবের মধ্যে তোমার আর না-গেলেও চলত কিন্তু।'

কে কার কথা শোনে? শিবানীর সুবিধা হল। কুশলী আইনজীবীদের কি অভাব আছে কলকাতায়? খুঁজে নিয়ে তাদের সঙ্গেই শলাপরামর্শ করবে স্থির করল সে। হোক না স্কুল কামাই—তাতে কি!

শুরু হল শিবানীর প্রায় এক নূতন কর্মধারা।

কিন্তু তার আগে একবার যজ্ঞেশ্বরের কাছে ত যাওয়া চাই।…যজ্ঞেশ্বরবাবু তখন খিদিরপুর 'যজ্ঞধামে' চিন্তামগ্নাবস্থায় অর্ধশায়িত। এই যজ্ঞধাম তিনি নূতন বানিয়েছেন শিবানীরই জন্য, তা শিবানী ছাড়া কেউ জানে না—ছয়তলা বাড়ি, অটোলিফ্‌ট্ আছে ভিতরে। বাড়ির কাজ চলছে এখনও।

'কী এত ভাবছেন বলুন দিকিন?' শিবানী কাছে বসে জিজ্ঞেস করল।

'বলে আর হবে কি!' একটা নৈরাশ্যের নিঃশ্বাস ছাড়েন যজ্ঞেশ্বর। শিবানী আরও ঘন হয়ে বসে যজ্ঞেশ্বরের ডান হাতখানা তুলে নেয় তার কোলের ওপর।

যজ্ঞেশ্বর অনুভব করেন ঝড় বইছে রক্তস্রোতের উপর, সর্বাঙ্গে তাঁর পুলক সিঞ্চিত হচ্ছে। নীরবে ভাবেন: কয়েক লাখ টাকা আগাম নিয়ে গিয়েছিল ওম্প্রকাশ জোয়ার্দার। বলেছিল 'যজ্ঞধাম' তৈরির কাজ কম্প্লিট হয়ে গেলে পর, বাকী টাকা নেবে। কিন্তু ফুরসৎ দিচ্ছে কোথায়? এই ত আবার পাঠিয়ে দিয়েছে তার ছেলে রাধাবল্লভকে। বলে, টাকা চাই। প্ল্যানে যা আছে তা এখন কম্প্লিট্ করতেই হবে, নৈলে 'যজ্ঞধাম' বিক্রী করে দেবে। ঐটে তো প্রায় বন্ধকই ওর কাছে। এই সুযোগে এক-একট্রিপে এসে প্রায় হুমকি দিয়েই লাখ-লাখ টাকা বের করে নিচ্ছে। আর, তা না-দিয়েই বা যজ্ঞেশ্বরের রেহাই কোথায়! চারদিকে হরেকরকমের মামলামকদ্দমা ঝুলছে তাঁর, এ অবস্থায় যদি ওম্প্রকাশ জোয়ার্দারের মত একটা লোক আবার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়—তাহলে? এসব মনের কথা শিবানীর কাছে প্রকাশ না করে যজ্ঞেশ্বর শুধু বললেন: 'রাধাবল্লভ এসেছে এখানে, দেখেছেন বোধহয়।'

শিবানী চাপাহাসিতে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। যজ্ঞেশ্বর তা লক্ষ্য করে বলেন: 'ওর কি ইচ্ছা জানেন? কলকাতায় নাকি আরেকটা বিজ্‌নেস্ সেণ্টার খুলবে!

সেদিন দেখি কিনা আমাদের স্কুল থেকেই যেন বেরুচ্ছে রাধাবল্লভ!' যজ্ঞেশ্বর তাঁর মনের সন্দেহ গোপন রাখতে পারলেন না, গম্ভীরকণ্ঠে বললেন: 'আপনার সঙ্গে বুঝি দেখা করতে গিয়েছিল সেখানে, না?' প্রশ্ন শুনে শিবানীর মুখ আরক্তিম হল। চোখটা নামিয়ে নিল সে, কিছু বলল না। যজ্ঞেশ্বরও চুপ করলেন। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করেন: 'আপনার স্কুলের মেয়েটিচাররা না হয় আপনি যা বলেন তা-ই বিশ্বাস করে যান;—কিন্তু পুরুষ টিচাররা?'

'কেন এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন আপনি?' শিবানী ভাবনায় পড়ল।

'আমার মনে হয়'—যজ্ঞেশ্বর অসহায়ের মত ভীতকণ্ঠে বলেন: 'রাধাবল্লভের সঙ্গে অনেক মেলটিচারের আলাপ পরিচয় হয়েছে। এখন ভাবছি, সেখানেই না সব বেফাঁস হয়ে যায়!'

'আমি ওঁদের ঠিক বুঝিয়ে দেব খন।' সান্ত্বনা দিয়ে শিবানী বলে: 'আর রাধার সঙ্গেও দেখা করব আমি। সে আমার হাতের বাইরে যাবে না, আপনি নির্ভাবনায় থাকুন।' কটাক্ষে মৃদুহেসে মুহূর্তে নিজের শরীরটার উপর অত্যন্ত নিপুণভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে যখন টের পেল, যজ্ঞেশ্বরও তারই দিকে লোলুপদৃষ্টিতে নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন তখন মধুময়কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করল: 'আপনি ভয় পান কেন এতো?' সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য মহামায়ার সুপরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধহাসি ছড়ালো শিবানী: 'আমার কি কোন মূল্য নেই ওঁদের কাছে? বলুন?'

এরপর যজ্ঞেশ্বর আর বলবেন কি! এই নারীজাতিই যে তাদের সম্মোহনী শক্তিতে পুরুষদের মনে বিপদে-আপদে সাহস জোটায়—এমন জাগতিক সত্যকে অমান্য করবার অলক্ষুণে পৌরুষ এত বড় ভূমণ্ডলে ক-জনেই বা পারেন দাবী করতে? অন্তত সেদিন কলিকাতাবাসী বিপুল ধনপতি যজ্ঞেশ্বরবাবু তা পারেন নি। তাই তিনি সেইমুহূর্তে শিবানীর নরমহাতের মুঠিটা নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে অনাবিল সুখ অনুভব করতে-করতে পরমনির্ভরতার সঙ্গে কেবল এ টুকুই পেরেছিলেন বলতে: 'তাও তো বটে!'

শিবানী টের পেয়েছিল সব, আর সুবিধা বুঝে তক্ষুনি এটর্নী বটব্যালের ব্যবহারটা বর্ণনা করে বলেছিল: 'কেন? কি জন্যে আমার উপর তাঁর এতো দরদ? লোকটা নিশ্চয় বদ্‌মআশ,—চরিত্রে ওঁর দোষ আছে। এ-রকম কন্‌ডাক্‌টের লীগ্যাল অ্যাড্‌ভাইসারের দরকার নেই স্কুলে।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

যজ্ঞেশ্বর সপুলকে হেসে উঠেছিলেন: 'যা হবার তা হয়ে গেছে। ওসব ভুলে যান। জানেন ত মিসেসমুখার্জি, উকিলদের চটালে অনেক ফ্যাসাদ। তাহলে ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা না আবার জানাজানি হয়ে পড়ে।' শান্তগলায় বোঝাচ্ছিলেন

আরো : 'তাছাড়া, আপনার প্রতি একটুখানি দুর্বলতা ত তাঁর থাকবেই, আপনাকে কি আর আর্থিক সাহায্য কম করেছেন ঐ মিঃ বটব্যাল ? আপনার মুখেই ত শুনেছি, আপনার মায়ের অসুখের সময় না হাজার-হাজার টাকা জলের মত দান করলেন উনি !'

'হুঁম্—তাইবলে সে সুযোগ নিয়ে আমার গায়ে হাত দেবে ? কী যে বলেন আপনি !' সাপের মত সুন্দর নিটোল ফণা তুলল শিবানী : 'দেখেন নি ত, আমাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে আটকে রাখতে চেয়েছিল ঐ বুড়ো। কতদূর আস্পর্দ্ধা ওঁর !'

যজ্ঞেশ্বর লক্ষ্য করলেন, শিবানীর ছলছল চোখদুটো যেন রাগে-দুঃখে ফেটে বেরুচ্ছে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শিবানীর হাত চাপলেন তিনি : 'নেভার মাইণ্ড্, খুব যদি বেশি অস্বস্তি মনে হয়'—বলতে বলতে সোল্লাসে নিজের পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দেন : 'হিসাব করে ওঁর প্রাপ্য সব কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিন মিসেস্ মুখার্জি। দেরী করবেন না আর।'

শিবানী চাবিটা সযত্নে শাড়ির আঁচলে বাঁধতে-বাঁধতে নিজের দেহের উপর চিত্তাকর্ষক চপলতার সুস্পষ্ট ভঙ্গী এনে তৃপ্তিসুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখে নিকটস্থ টেবিলের ওপর রেডিয়ো-সেট্‌টা খোলার জন্য উঠে দাঁড়াল একটুখানি ;—বস্ত্রাবৃত রূপকে যেন ঐ সঙ্গে আরো আশ্চর্য রকমের ইঙ্গিতময় করে তুলল সে।

যজ্ঞেশ্বর সেদিকে অর্ধনিমিলিতনেত্রে তাকিয়ে রইলেন।

॥ ১১ ॥

একদিন ন্যাশন্যাল্ লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছিল অমিত। রাস্তায় শিবানীর ড্রাইভার লছমনসিং-এর সঙ্গে দেখা। খালি গাড়ি নিয়ে ফিরছে, বললে : 'উঠে আসুন মাষ্টারসাব্। পা-দল্‌কে কেন যাচ্ছেন ?'

উঠে বসল অমিত সামনের সিটে লছমনসিং-এর বাঁপাশে। এটা-সেটা আলাপ করতে গিয়ে জানল, শিবানীকে এইমাত্র কোথায় পৌছে দিয়ে এসেছে ড্রাইভার। সেখানে নাকি রোজই শিবানী যায় নিজের গাড়িতে করে, বাড়ি ফিরে অন্যের গাড়িতে। ঠিকানাটাও জেনে নিল অমিত, খিদিরপুরের ঐদিকে গঙ্গারধারে অভিনব প্যাটার্ণে বিরাট 'যজ্ঞধাম' তৈরি করিয়েছেন যজ্ঞেশ্বর, সেখানেই নাকি প্রতিদিন দিদিমণির সঙ্গে মিটিং হয় তাঁর।

অমিত নীরবে শুনছিল সব। মনে পড়ছিল তার,—এরইমধ্যে কবে জানি বিনতা এসে সন্দিগ্ধমনে তাকে জানিয়েছিল, শিবানী আর যায় না তাদের বাড়িতে,

তবে তার বাবার সঙ্গে রোজই অন্য কোথাও দেখা হয় এটা সে ঠিক অনুমান করতে পারে। এমন্তব্য শুনে অমিত বুঝিয়েছিল ওকে : 'পারিবারিক আলোচনা বাইরের লোকের সঙ্গে করতে নেই বিনতা। যতই বল না কেন, আমি ত আর তোমাদের পরিবারের কেউ নই।' বিনতা এযুক্তি মানতে চায়নি, বরং উল্টো তর্ক করেছিল : 'পরিবারের কেউ না হতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে আপনি আমার পর হতে যাবেন কেন? কোন্ আইনে—শুনি?' সেদিনই সে আরো বলেছিল : 'আপনি ত সবই জানেন, মাষ্টারমশাই। বাবা এত করলেন, বললেন যে এস্কুলের সঙ্গে কোন সংশ্রব আর তিনি রাখতে চান না, বিশেষকরে যখন এটা জনসাধারণকেই দিয়েছেন উৎসর্গ করে। তাহলে বর্তমানকমিটি থেকে তাঁর নামটা সরিয়ে দিলেই বা ক্ষতি কিসের! অথচ কী আশ্চর্য! শিবানীদি ওঁকে ছাড়ছেন না কিছুতেই। আর ঐ কারণেই ত স্কুলটা এত গোলমেলে হয়ে পড়েছে। শুনছি নাকি অ্যাফিলিয়াশান্ থাকবে না ওর,—তখন কি হবে?'

'কী আর হবে!' অনাসক্তভাবে জবাব দিয়ে প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইল অমিত।

বিনতা তবু পরমবিজ্ঞের মত বলতে থাকে : 'কিন্তু একটা ডিস্অ্যাফিলিটেড্ হাইস্কুল ভাল করে চালাতে গেলে যে অনেক টাকার দরকার মাষ্টারমশাই। অবশ্যি গবর্ণমেণ্ট থেকে খানিকটা এড্ পাচ্ছে—তাহলেও এই এড্ নিয়েও ত গোলমাল বাধার সম্ভাবনা, যদি স্কুল এভাবেই চলতে থাকে। আর আমার ত মনে হয় এর জন্যে দায়ী —শিবানীদির যত সব বাজে হুয়িম্‌স্।'

'আঃ! তুমি এ সব নিয়ে ভাবছ কেন অত?'

'বারে :। উপরের ক্লাশের মেয়েরা যারা বেশ খরচ করতে সমর্থ তারা তখন এখানে পড়তে আসবে কোন ভরসায়? আর তারা না এলে স্কুলের ছাত্রীসংখ্যাও কমে যাবে অনেক,—সেদিকে খেয়াল আছে আপনাদের?'

'তা কমবে বৈকি?' পূর্ববৎ অলসভঙ্গীতে জবাব দিতে গিয়ে, আর বিনতার কথায় এমনতর মুরব্বিয়ানা দেখে অমিত হেসে ফেলল হঠাৎ। তাতে বিনতা কপাল কুঁচকে অমিতের দিকে তাকায়, বলে : 'কী! আপনি শুধু শুধু বিদ্রূপ করছেন!' দৃষ্টি তার শুকনোম্লান, কিন্তু কণ্ঠস্বরে তীব্র উত্তেজনা, জিজ্ঞেস করে : 'কেন, আপনি কি বলতে চান, এই স্কুল গড়ার কাজে আপনার কোন হাত নেই? আপনার জীবনের শুদ্ধ-নিষ্কাম চিন্তা, ভালবাসা, স্বপ্ন—সবই যে এর মধ্যে মাষ্টারমশাই—তা সকল মানুষ না জানুক, ভগবান ত জানেন। তাঁর কাছ থেকে কি কখনও এ দুনিয়ায় কিছু সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারবেন আপনি?' এই কথাটুকুরই অনুভূতিতে ততক্ষণে অবাধ্যঅশ্রুধারায় উপচে উঠছে বিনতার দুটি

আয়তচোখের কোল। তা দেখে অমিত তৎক্ষণাৎ বিমূঢ়ের মত কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল: 'তুমি কাঁদছ বিনতা! কী, কি হয়েছে তোমার বল দেখি।'

'নাঃ আপনাকে আর আমি পারব না বোঝাতে, আপনি কিচ্ছু বুঝতে চান না' —বলতে বলতে তড়িৎগতিতে দূরে সরে গিয়ে মুখ ফিরে দাঁড়িয়েছিল বিনতা। ...বিনতার সঙ্গে সেদিন কথায়বার্তায় অমিতের এই বোধটুকু নিশ্চিত জেগেছিল, যে, সম্প্রতি স্কুলের কাজে শিবানীর ঔদাসীন্য তথা খেয়ালীপনা সাময়িক হলেও তা বরদাস্ত করা অমিতেরপক্ষে যেমন অনুচিত, তেমনি অসম্ভব।

আজও লছমনসিং-এর মুখ থেকে 'যজ্ঞধাম' সম্পর্কিত রিপোর্ট পেয়ে বিনতার কথাগুলিই অমিত অনেকক্ষণ গভীরভাবে ভাবল, স্থির করল, শিবানীর খামখেয়ালীর জন্যে এতবড় স্কুলটার সর্বনাশ হতে দেবে না সে কিছুতেই। স্কুলের ভালমন্দের উপর তারও সমান অধিকার আছে বৈকি।

বাস্তবিক কয়টা দিন যেতে না যেতেই দেখা গেল, স্কুলের অফিসঘর এবং স্থানাভাবে গেট পর্যন্ত দখল করে দাঁড়িয়েছেন ছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা। তাঁদের মধ্যে এক চাপা উত্তেজনা: স্কুল সম্পর্কে ইদানীং নানারকমের গুজব শোনা যাচ্ছে,—অনেক ইরেগিউল্যারিটি, কারচুপি ইত্যাদি কারণে এর অ্যাফিলিয়েশন্ নাকি আর থাকছে না—এ-কথার সত্যতা তাঁরা সরাসরি হেডমিস্ট্রেসের কাছ থেকেই জানতে এসেছেন।

শিবানী এই সময়টাতে বরাবরই তার চেম্বারে থাকে, কিন্তু আজ নেই। কাজেই জিজ্ঞাসাবাদগুলো, কোন সঠিক জবাব না-পেয়ে স্বভাবত ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছিল। ...ঐ গোলযোগের ভিতর দিয়ে শকুন্তলা এসে ঢুকলো স্কুলে। তাকে দেখে অন্য টিচাররা ডেকে নিয়ে গেলেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ হেড্-মিস্ট্রেসের চেম্বারের দিকে। সেখানেও প্রবীন-নবীন প্রায় সব শিক্ষক-শিক্ষিকারাই বসে আছেন মুখ কালো ও বেজার করে। খানিক আগেই তাঁদের মধ্যে এক প্রস্থ আলোচনা হয়ে গেছে: সত্যই কি—স্কুলটার কোন অ্যাফিলিয়েশন্ নেই নাকি? শিবানীদিই-বা এতটা চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন? অল্পদিনেই যেন কীরকমভাবে হঠাৎ অনেকটা বদলে গেছেন! আজকাল এত ঘন ঘন কোথায় যান, কি করেন—হেনতেন নানারকমের সন্দেহজনক প্রশ্ন ওঁদের।...

অন্যদিকে অমিত একা বসে আছে লাইব্রেরিতে। অবনীবাবু গিয়েছিলেন তার সঙ্গে কথা বলতে, মুখ গম্ভীর দেখে ফিরে এসেছেন। তার মিউজিক্-ক্লাশের কাজ ত সেই টিফিন্-পিরিয়ডের পরে—তা অনেক দেরি। এখন পরিস্থিতিটা অমিত নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছে শুধু। অনেক ঘাটেরই ত জল খেয়েছে, কিন্তু এ-ঘাটে এসে

জলের ভিন্ন স্বাদ পাচ্ছে যেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কি এইধরনের ঘাটে বসেই জীবনভোর শুধু চোখের জল ফেলেছিলেন আর বলেছিলেন: 'মানুষ বিস্তীর্ণ-মঙ্গলকে সৃষ্টি করে দীর্ঘকালের তপস্যার দ্বারা। ক্রোধ বা কাম এসে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে এবং তপস্যার ফলকে একমুহূর্তে নষ্ট করে দেয়। ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাকে নিশ্চেষ্টতা মনে করে, তাকে নিজের আশুউদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলে ঘৃণা করে'—এসব কথা স্বয়ং কবির শ্রীমুখ থেকেই একদা শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল অমিতের। তাই আজ অনেক কিছুর উপর তার ক্রোধ জেগে উঠলেও সে নিজেকে সংযমিত করল এবং মনের মধ্যে প্রশান্তভাবে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকল—গতকালের ঘটনারই এক ধারাবাহিক চিত্রমালা:

······আজকাল সব স্কুলগুলি, য়ুনিভার্সিটির হাত থেকে চলে এসেছে নবগঠিত এক শিক্ষা-সংসদের অধীনে।······স্বতন্ত্র এদের বিধিব্যবস্থা।

উক্ত সংসদঅফিসে স্কুলফাইন্যাল্ পরীক্ষার্থিনীদের সইকরা কাগজপত্র দিয়ে অমিতকে ফার্স্ট আওয়ারে পাঠিয়েছিল শিবানী। অন্য বহু কাজে ব্যস্ত থেকেও, জরুরী বিবেচনায় এই কাজটা কিন্তু সে খুবই তাড়াতাড়ির মধ্যে করে দিয়েছিল।

কলকাতা শহরের উত্তরপ্রান্তে শ্যামবাজার ছাড়িয়ে বেলগাছিয়ার ওদিকে ভারী মনোরম পরিবেশের মধ্যে বড় এক খোলামাঠে সংসদের নূতনবাড়ি।

সেখান থেকে বেরিয়েই শকুন্তলার সঙ্গে অমিতের দেখা।

অমিতের চেহারা খুবই মলিন বিষণ্ণ, সে জানালো: 'অবস্থা মোটেই সুবিধার নয় মিস্ত্রিবেদী।' তারপর নিজের বগলদাবা করা কাগজপত্র দেখিয়ে অবাককণ্ঠে বলে: 'এসব ত ওঁরা ফেরৎ দিয়ে দিলেন দেখছি!'

শকুন্তলা স্পষ্টতঃ কিছুই বুঝতে পারছিলনা, অনুরোধ করলে: 'চলুন না এই কাছে কোথাও গিয়ে একটু বসি। সেখানে আপনার কথা শুনব'খন।'

মাথার উপর সূর্য তখন ঝিলমিল করছে। ঐদিকে তাকিয়ে অমিত সকাতরে বলে: 'এখন আর বসব না মিস্ ত্রিবেদী, ইউ মাস্ট্ এক্স্কিউজ্ মী। আমাকে আবার এক্ষুণি স্কুলে ফিরে গিয়ে সমস্ত রিপোর্ট দিতে হবে শিবানীদিকে।' তারপর হাঁটতে-হাঁটতে হাতঘড়িটা দেখে অমিতের খেয়াল হয়: 'আপনি যে এই অসময়ে, এখানে? স্কুল কি ছুটি হয়ে গেল নাকি?'

শকুন্তলা বলে: 'হবে হয়তো। কিন্তু আমি আগেই চলে এসেছি।'

'তার মানে?' পায়ের গতি থামিয়ে অমিত সবিস্ময়ে তাকায়।

'মানে তেমন কিছু নেই, আর থাকলেও আপনি তা এই মুহূর্তে বুঝবেন

না। বেশ, আপনার বাড়িতেই যাওয়া যাক—কেমন?' বলে কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই শকুন্তলা সামনে থেকে একটা চলন্তট্যাক্সি ইশারায় ডেকে নিল। ···গাড়িতে বসে শকুন্তলা বলতে থাকে: 'আপনি ত শিবানীদি নাম করতে করতে অজ্ঞান! অথচ, উনি যে কি ষড়যন্ত্র করছেন—জানেন?'

অমিত নীরব অনুসন্ধিৎসুনয়নে তাকাল। শকুন্তলা তেমনি এক উত্তেজনার মাঝে গলার স্বরটা নীচু করে আবার প্রশ্ন তুলল: 'কি ঘটেছে বলুন দিকি! আপনার ওপর এত চটা কেন উনি?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে মিস্ত্রিবেদী!' অমিত কপাল কুঁচকে কি যেন মনে আনবার চেষ্টা করলে: 'তবে হ্যাঁ, আপনার কথায় আন্দাজ করছি একটু যেন মন কষাকষি হয়েছিল সেদিন,—সে তো ধর্তব্যের মধ্যে নয়। যাক্‌গে, ও-সব শিবানীদির কথা—তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। এখন আমার ভাবনা হচ্ছে শুধু স্কুলটার জন্য। এতগুলি মেয়ের কী দশা হবে বলুন ত, যদি পরীক্ষা দিতে না-পারে এবার? সংখ্যায় ত আর কম নয়; ৫৩টি মেয়ে এবার ফাইন্যালে অ্যাপিয়ার হচ্ছে আমাদের স্কুল থেকে!" এতটা বলে বস্তুত মহাদুর্ভাবনায় সে গাড়ির এককোণে শ্রান্তদেহে হেলান দিয়ে বসল।

'কেন, স্কুলটা বুঝি অ্যাফিলিয়েশন্ হারালো শেষ পর্যন্ত?'

অমিত অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন তোলে: 'কি করে জানলেন?'

'আ-হা! স্কুলের টিচাররা কেউ পড়াতে পারেন না, এঁদের দোষেই ক্রমশঃ ছাত্রীদের পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে, স্কুলের অ্যাফিলিয়েশন্‌ও শুধু ঐ জন্যই হয়ত রাখা যাবে না—এই ধরনের গাঁজাখোরী কেচ্ছা হেডমিস্ট্রেসের মুখে যখন-তখন শুনলে কে না টের পায় বলুন ত!' একটু থেমে শকুন্তলা বললে: 'আমি ত জানতাম, একমাত্র শিক্ষাবিভাগেই বদ্‌অভিসন্ধিওয়ালাদের কোনো জায়গা নেই; কিন্তু এখন দেখছি—এ ধারণা আমার টিকিয়ে রাখা শক্ত। আজ ত প্রায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামই করে এলুম শিবানী মুখার্জির সঙ্গে।'

অমিত নীরবে আড়চোখে তাকিয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।

শকুন্তলা হাঁপাচ্ছে তখনও, আর বলছে আপনমনে: 'আমি ওঁকে থোড়াই পরোয়া করি। ওঁর যা কোয়লিফিক্যাশান্, আমারও তাই।'

'আজ্ঞে না মহাশয়া,' —এবার সোজা হয়ে বসল অমিত, বলতে-বলতে হাসে: 'স্বগতোক্তিটুকু শুনে ফেলেছি। তবু অনুরোধ করি, খুব ভালো করে ভেবেচিন্তে বলবেন—পরীক্ষা পাশের কোয়লিফিক্যাশান্‌টাই কি সব!'

'হ্যাঁ এ কথাও ঠিক, পারব না বটে তেমন করে অসত্যকে সত্যের রূপ দিয়ে

দাঁড় করাতে সুন্দর নিখুঁতভঙ্গিমায়' —বলেই শকুন্তলা অকস্মাৎ অত্যন্তঘনিষ্ঠের মত আরো কাছে সরে এসে নিজের হাতখানা অমিতের হাতের উপর রাখলে : 'আমায় ছুঁয়ে একটি কথা সত্যি করে বলবেন আপনি?' আর জবাবের অবকাশ না দিয়েই বড় অনুনয় করে বললে : 'বলুন না, শিবানীদিকে আপনার কেমন মনে হয়? আমি আর কারুকে বলব না একথা।'

অমিত নীরব।

স্কুল-শিক্ষিকা হিসেবে শকুন্তলার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচুর। সে উচ্চশিক্ষিতা, এম্-এ, বি-টি, ডবল্ এম্-এ। তবু তার সর্বাঙ্গে রূপের অভাব নেই। অঙ্গের এইরূপ সকল মেয়েদের মত যত্ন করে রাখা নয়, প্রসাধনে মার্জিত নয়—এটা স্বাভাবিক। দেহের অন্তরালে তার মনটিও বোধহয় তেমনি—কেউই তার লাগাল পেত না। বিশেষ, ক্ষণস্থায়ী যৌবনটাকে কোন অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করত না শকুন্তলা; এইটেই মেয়েদের কাছে চরমবিস্ময় এবং ঈর্ষারও অন্যতম কারণ বটে। তাই তার বিরুদ্ধে দল বেঁধে গোয়েন্দাগিরিও করতেন অনেকে, —অমিত টের পেত। এ সমস্ত উপেক্ষা করা তার পক্ষে সহজ নয়, যদিও সমাজের ধার অমিত ধারে না তবু এর চালচলনের দিকে ত আর সে চোখ বোঁজে নেই। বিশেষতঃ পুরুষ-নারীর সম্বন্ধের প্রতি সামাজিক কড়াকড়ির প্রয়োজনীয়তা অনেক সময় সে অন্তর দিয়ে অনুভব করে, ভাবে, এটা চারদিকের পারিপার্শ্বিক-ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর মাত্র। কাজেই, শকুন্তলা মিশতে আসলেও অমিত বেশ কশাস্লি উভয়ের মধ্যে একটা লক্ষণীয় ব্যবধান রক্ষা করে চলত সবসময়। কিন্তু তা টিকল না বেশি দিন, শকুন্তলাই ভেঙ্গে চুরমার করলে। প্রথমেই সে অমিতের গানের ক্লাশে গিয়ে বসল তার ছাত্রী হিসেবে, তারপর ধরে নিয়ে গেল একদিন তাদের বাড়ি। আলাপ-পরিচয় হল সবার সাথে। অমিত জানল, শকুন্তলার বাবা ডাক্তার বিপ্রদাস ত্রিবেদী মশায় বৃদ্ধশিক্ষক দীননাথবাবুর সহপাঠী এবং বিশেষ বন্ধু। দীননাথ-বাবুরই চেষ্টায় ও উদ্যোগে শকুন্তলা এসেছে শিবানীর স্কুলে। শকুন্তলার মা'কেও দেখল অমিত; —তিনি উচ্চাভিলাষিণী এবং নিজে একজন সংগীত সাধিকা। তাঁর সুশিক্ষা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যেদিন অমিতকে বলেছিলেন : 'আমি কিন্তু আমার এ মেয়েকে আপনার হাতেই তুলে দিলুম মাষ্টারমশাই। বেশ নিজের মনের মতটি করে গড়ে তুলুন ত দেখি।' ...এই স্বচ্ছ পবিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিতে অমিত আর কিছুমাত্র দ্বিধা করেনি সেদিন। ফলতঃ শকুন্তলা ক্রমশঃ তার স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠল এবং মনে মনে অমিতের উপর একটা বড় রকমের আধিপত্যও বিস্তার করল সে।

'কৈ, চুপ করে আছেন যে!' অমিতের হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল শকুন্তলা: 'সত্যি কথা বলবার ইচ্ছা নেই নাকি?'

'আচ্ছা ভারি বিপদ ত!' মন্তব্য করতে গিয়ে হাসল অমিত: 'আপনার কাছে মিথ্যে বলব কেন, মিস্ ত্রিবেদী?'

আজকাল আর আগের মত ইচ্ছা থাকলেও অমিতের ওখানে শিবানী যখন-তখন যেতে পারে না—আসলে, তাঁর সময়েরই বড় অভাব। তবে দিনকয়েক আগে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিল সে। প্রথমে তা প্রকাশ করেনি; পরে প্রায় হঠাৎ বললে: 'আপনি শুনেছেন নিশ্চয়, আমরা কতকগুলো জিনিষ কিন্‌ছি স্কুলের জন্য।' 'কোথায়, আমি ত শুনিনি!'—যেন চলন্ত গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ল অমিত, তারপর শিবানীর দীর্ঘ বক্তব্য শুনে সদরদে বলেছিল: "খুবই ভালকথা, স্কুলের মিউজিক-ফাণ্ডে কোয়াইট্ এ গুড্ অ্যামাউন্ট্ অব্ মানি যদি উদ্বৃত্ত থাকেই তাহলে ঐটাকায় এইজিনিষ সব আপাততঃ না-কিনে টিচারদের মাইনে বাড়িয়ে দেন না কেন, শিবানীদি?' এই প্রশ্নে শিবানী প্রসন্ন হল না, বলল: 'স্কুলের আরো দুটো নূতন বিল্ডিং করাতে হবে, দেখুন, তাতে অনেক টাকার দরকার। টিচাররা সম্প্রতি যা পাচ্ছেন তা নিয়ে ত কেউ আর অসন্তুষ্ট নন, বরং অন্যান্য স্কুলের তুলনায় আমার স্কুলের টিচারদের মাইনে বেশি নয় কি, মাষ্টার মশাই?' অমিত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়: 'তা হলই বা! যেখানে নিতান্ত অপ্রয়োজনে কতকগুলো জিনিষ কিনে নিয়ে আমরা ঘর বোঝাই করতে পারি সেখানে প্রয়োজনমত কর্মীদের পারিশ্রমিকটা কিছু বাড়িয়ে দিলে কি ভাল হয় না? আপনিই বলুন। তাছাড়া, টীচার্স আর অল্‌ওয়েজ্ ইল্-পেড্—এই বদনামটাও কেটে যায়।—বেশ ত, আমাদের স্কুলই একাজে অগ্রণী হোক না কেন, শিবানীদি?'—'ঠিকই বলেছেন। তবু আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না মাষ্টারমশাই,'—একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে শিবানী বলে আরো: "এই সমস্ত আমি স্কুলের নূতন রেজিষ্টার্ড করা সোসাইটির নামেই কিনে নেব ভেবেছি,—সোসাইটির টাকা দিয়ে। স্কুলের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কমই থাকবে।'… আবার সেই সোসাইটি!! তাছাড়া শিবানীর কথাগুলিই যেন কী রকমের বড় গোলমেলে মনে হচ্ছে। আর সেই গোলমাল ঢাকবার জন্যই সে টেনে আনছে যত সব কুটযুক্তি! …অমিত শুনতে চায় না এ-সব। তবু একটা লম্বা বক্তৃতা ও ফিরিস্তি দিল শিবানী। প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিল যে, এখান থেকে হাজার কয়েক টাকার জিনিস সে অমিতকেও দিতে চায়। আসলে, এ-সব জিনিসের

মালিক যজ্ঞেশ্বরবাবু ; তিনি কোনো কারণে সরিয়ে ফেলতে চান। এই প্রস্তাব শুনে আর সহ্য করতে পারেনি অমিত। নিদারুণ ঘৃণায় ভ্রূকুটি করে বলেছিল : 'আপনার অন্য কিছু বলবার থাকে ত বলুন। এ সব কথা আমার কাছে আপনি তুলবেন না আর কখনো।'

'কেন ?' হতাশভাবে প্রশ্ন করে হাসবার চেষ্টা করেছিল শিবানী।

অমিত এ-প্রশ্নের জবাব দেয়নি, পারে নি দিতে। কারণ ভাবনার স্রোত তার তখন বয়ে চলেছে ফল্গুর মতন ! তাকে তাই সম্পূর্ণ নিরুত্তরেই কালক্ষেপ করতে হচ্ছিল। তাছাড়া, সেদিনকারই ভোরের ডাকে, আবার সুপ্রিয়ার একখানা পত্র পেয়েছিল অমিত। ···যমুনা বিয়ে করে এলাহাবাদে এসেছে ; সেখানে সুপ্রিয়ার বাড়িতেই অতিথি ওঁরা। যমুনার স্বামী হাই রেংকের পুলিশ অফিসার,—বাঙালী। তাঁরাই গল্পচ্ছলে নাকি বলছিলেন, শিবানী মুখার্জির গতিবিধি কলকাতার পুলিশ রীতিমত লক্ষ্য করছে আজকাল। ···মস্ত লম্বা চিঠি। এখন এই শিবানীর স্কুলে যোগ দেবার জন্য অমিতকে উৎসাহ দিয়েছিল বলে সুপ্রিয়া খুবই দুঃখিত ; এই কথাটা সে সবশেষে জানিয়ে লিখেছে : 'যাই হোক, আপনি এ স্কুল এখন ছাড়বেন না কিছুতেই। নির্বিবাদে কাজ করে যান, তবে একটু সাবধানে চলবেন। আর যমুনা ত শিগগিরই কলকাতা যাচ্ছে, তার কাছে জানবেন সমস্তই।' ঠিক এই সঙ্গে দিবাকরবাবুর আলাপ আলোচনার ইঙ্গিতটাও সুস্পষ্ট মনে পড়েছিল অমিতের।··· 'কোথায়, কিছু বলছেন না যে মাষ্টারমশাই ?" অমিতের ভাবনায় বাধা দিয়ে নূতন করে ফের প্রশ্ন তুলেছিল শিবানী।—'আমার কিছু বলবার নেই শিবানীদি।' ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল অমিত : 'আমি এখনও বলব, যদি স্কুলের মিউজিক-ফাণ্ডে উদ্বৃত্ত টাকা থাকে তাহলে সেই টাকায় আপনি আগে স্কুল-টিচারদের মাইনে বাড়ান,—তারপর অন্য যা কিছু আমার কাছে বললেন, সেই বিষয় ইউ প্লীজ কন্‌সাল্ট্‌ ইওর হাজ্‌ব্যাণ্ড এবং তিনি যা বলেন সেই ভাবে চলুন।'

এই প্রসঙ্গে তার স্বামীর নাম উঠতে পারে না, তবু অমিত কিছুক্ষণ আগে গভীরভাবে দিবাকরবাবুর বিষয়ই ভাবছিল,—তাই নির্দ্বিধায় স্বচ্ছন্দে বলতে পারল এ-কথা। এতে শিবানীর পক্ষে ক্ষুণ্ণ হওয়া অসম্ভব নয়, তদুপরি অমিত যে এতটা এগিয়ে যাবে সেটাও সে কল্পনা করেনি। মোটেরউপর কথাবার্তাটা এখানেই কেমন একটা বিশ্রীভাবে যেন সেদিন থেমে গিয়েছিল।

সত্যই ক্ষুব্ধ হয়েছিল শিবানী—এ চাবুক সইবার ক্ষমতা ছিল না তার।

উপরোক্ত ঘটনার সংলাপগুলি অমিত অবাধেই শুনিয়ে যাচ্ছিল।

শিউরে উঠল শকুন্তলা। তার হাতের মুঠোয় অমিতের ডান হাতখানা ধরা ছিল বলেই অমিত তা টের পেয়ে সহাস্যে জিজ্ঞেস করলে: 'চমকাচ্ছেন কেন মিস্ ত্রিবেদী? নারী-চরিত্র বড় বিচিত্র,—নয় কি?'

'আবার সেই এক কথা।' —যেন ধমক দিল শকুন্তলা: 'আপনি কি সিরিয়াস্ হতে জানেন না নাকি?'—একটু থেমে মনে-মনে ভাবলে, আরো বেশি বিচিত্র ত আপনি নিজেই—আপনি অবোধ্য, নিজেকে নিয়ে শুধু ছিনি-মিনি খেলতে ভালবাসেন। ·· কিন্তু এসব কথা ত আর মুখে পারে না সে উচ্চারণ করতে! তাতে বোধকরি ভালই হল। কথার মূলসূত্রটুকু মুহূর্তের মধ্যে টেনে নিতে পারল শকুন্তলা, চোখ দুটো বড় বড করে বললে: 'উঃ দেখুন, কী মিথ্যাবাদী এই শিবানীদি। আজ দেখি কি না, মিউজিক হলের অর্ধেকটাই প্রায় কতকগুলো ফার্ণিচারে ভর্তি করে রেখেছেন উনি! —বিষয়টা লুকোচুরির মত মনে হচ্ছিল তাই জিজ্ঞেস করলাম, এ-সব কি? জবাব দিলেন, কী হবে এতটা ফাঁকা জায়গায়, নাচগানের ক্লাশ আরো কম জায়গাতেও চলে। এ কথা শুনে আমার গা-টা যেন জ্বলে উঠলো। শিবানীদি বলতে থাকলেন, এতসব জিনিস কিনলাম স্কুলের জন্যে। অমিতবাবুর বাড়িতে লোকজন নেই—প্রচুর জায়গা পড়ে আছে, বললাম, সেখানে নিয়ে কিছু রাখতে, তা আমার কথা তিনি কানেই নিলেন না। মানুষকে উপকার করলেই তারা ভুলে যায়। ···আরো অনেকে সামনে ছিলেন তখন। সেখানে আপনাকে খুঁচিয়ে শিবানীদির এমনতর কথা আদপেই সহ্য করা যায় না। জোর প্রতিবাদ করলাম: আপনি এমন কীই-বা উপকার করেছেন ওঁর—বরঞ্চ, অমিতবাবুকে তাঁর ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে তিলে-তিলে শোষণ করছেন আপনি! শিবানীদি ত রেগে-মেগে লাল, আমায় শাসিয়ে উঠলেন: তুমি সবকিছুতে কথা বলতে আস কেন, শকুন্তলা? জবাব দিলাম: আপনি কেন একজন ভদ্রলোককে মিথ্যা দোষারোপ করবেন শুনি? তিনি এই স্কুলের উন্নতির জন্য কি না করেছেন—জিজ্ঞেস করুন ত সবাইকে। ···উঃ দেখি কিনা, রাগের চোটে শিবানীদি আর কথা বলতে পারছেন না। আমিই-বা ছাড়ব কেন? জিজ্ঞেস করলাম ফের: আচ্ছা বলুন ত শিবানীদি, কোন লোককে তার অসাক্ষাতে আক্রমণ করার রুচিটা কি অভদ্রোচিত মনে হয় না আপনার? ···দেখলাম, আরো চটে গেলেন তিনি; বললেন: তোমার যদি ভাল না-লাগে, আমাদের এ স্কুল তুমি ছেড়ে চলে যেতে পার। ···সত্যি বলব, আমারও রাগ কম হয়নি, কিন্তু এবার হাসি পেল ওঁর কথায়।'

অমিত হেসে ওঠে, বলে: 'ভারী ইন্‌টারেস্টিং ত! তারপর শুনি।'

'না-বলে আর পারলাম না' —আগের কথায় যোগ দেয় শকুন্তলা: 'যদি অন্যায় মিথ্যা কিছু বলে থাকি, নিশ্চয় স্কুল ছেড়ে যাব। তার আগে, আরো দশজন টিচার ত এখানেই আছেন, এঁদের জিজ্ঞেস করুন, আপনার অনুযোগ সঙ্গত কি না। আর, অমিতবাবুর অসাক্ষাতে এসব কথা আলোচনা না-করে তাঁর সামনাসামনি বলুন দিকি, —বুঝব, কেমন আপনার মরাল কারেজ! কিন্তু আমিও জানিয়ে রাখছি শিবানীদি, আপনি তা পারবেন না কিছুতেই।'

'যাঃ এতো সব বলতে গেলে কেন?' বলেই অমিত দাঁত দিয়ে জিব কাটল: 'ঈশ্, একটা ভুল করে ফেললাম কিন্তু—'

'বেশ করেছেন। আর শোধরাতে হবে না।' স্মিতমুখে অভিমত জানায় শকুন্তলা: 'আপনি-আপনি করে কথা বলতে পারবেন না ককৃখনো আর। আমি আপনার অনেক ছোট মনে রাখবেন।' কিন্তু পরমুহূর্তেই চিন্তিতমনে জিজ্ঞেস করলে: 'এত সব ত ঝোঁকের মাথায় বলে এলুম। এখন, কাল স্কুলে গিয়ে কী করে যে শিবানীদির সামনে মুখ দেখাব—তাই ভাবছি।'

'ভাববার কিছু নেই।' অভয় দিল অমিত।

…তাদের ট্যাক্সি হাজরারোডের খালের 'পর বড় ব্রিজের ও-পাশে জেলখানা পেরিয়ে সোজা পশ্চিমে কিছুটা পথ যখন এগিয়েছে, অমিত সহসা বলে উঠল: 'ড্রাইভার থামো।'…শকুন্তলা চমকে সুধায়: 'কেন, বাড়ি যাবেন না?'

'যাব। তার আগে এ সব সমঝে দিয়ে আসি শিবানীদিকে।' হাতের কাগজপত্র দেখিয়ে অমিত বলে: 'স্কুল ত এই কাছেই। আমি হেঁটেই যাচ্ছি। তুমি বরং গাড়িতে সোজা চলে যাও আমার বাড়ি। জংবাহাদুর আছে ওখানে কোন অসুবিধা হবে না।' নেমে পড়ল সে।

বেলা প্রায় তিনটা হবে। —স্কুলে লোকজন কেউ নেই, এমনতর পরিস্থিতির কারণটা রহস্যজনক মনে হচ্ছে। দারয়ানও অতিরিক্ত হুশিয়ার। কেবল অমিত বলেই বাধা দিতে পারল না, বলল, সব আদমীই চলে গেছেন, কম্পাউণ্ডে আজ কারুর প্রবেশনিষেধ,—শিবানীদির নাকি স্ট্রিক্ট্ অর্ডার।

শিবানীর চেম্বারে তখন বৃদ্ধ কামাখ্যা পণ্ডিত এবং অপরিচিত আরেকজন। সেখানে ঢুকে বিনা ভূমিকায় অমিত তার ফেরৎ নিয়ে আসা কাগজের বাণ্ডিলটা শিবানীর সামনে টেবিলের উপর এগিয়ে দেয়। 'কী! ফেরৎ নিয়ে এলেন যে এসব?' বোধহয় অন্য কোনচিন্তায় মৌতাত ছিল শিবানী কিংবা তার অনুমতি না নিয়ে দারয়ান যে অমিতকে সোজা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে

সেইজন্যও হবে হয়ত;—শিবানীর কথার মধ্যে বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসৌজন্য ফুটল পরিষ্কার।

অমিতও তদোধিক বিস্ময়ে নির্বাক।…শিবানী ফের বলার সুযোগ নেয়: ‘আমি ত ভাবছিলাম, এই কাজটা না-সেরে আপনি কিছুতেই ফিরবেন না মাষ্টারমশাই।’ তারপর হঠাৎ আরো অসংযতভাবে, পার্শ্বে বসা কামাখ্যাপণ্ডিত আর ঐ কোন্ এক নবাগতের দিকে চেয়ে চেয়ে অদ্ভুত কটাক্ষ করে বসল সে: ‘একটা সামান্য কাজও আপনাদের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জো নেই!’

অসহ্য এ মন্তব্য!…অমিত তাল ঠিক রেখেই জবাব দেয়: ‘শিক্ষাসংসদের অফিসারবৃন্দ এসব কিছু গ্রহণ করলেন না বলেই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। তাঁরা অফিসের খাতাপত্র খুঁটিয়ে দেখে স্পষ্ট কথায়ই জানিয়ে দিয়েছেন, আমাদের স্কুল তাঁদের নূতন তালিকায় deleted হয়ে আছে। এবং তা খোদ য়ুনিভার্সিটির নির্দেশ-অনুসারেই।’

শিবানী তবু জোর প্রতিবাদ জানায়: এ তাঁরা বলতে পারেন না।

অমিত তাকিয়ে রইল নিঃশব্দে।…তার সংগৃহীত রিপোর্ট কি তাহলে মিথ্যে! এই নিয়ে সে কথা কাটাকাটি করবে শিবানীর সঙ্গে? ছিঃ। মনটা তার তখন ক্রমশঃ বিষিয়ে উঠছিল আরো অন্য কারণেও। তার প্রিয় মিউজিক্-হলে শিবানী যে বিশৃঙ্খলা এনেছে—সে-দৃশ্য এইমাত্র স্কুলকম্পাউণ্ডে ঢুকেই স্বচক্ষে যাচাই করে এসেছে সে—এর আগে শকুন্তলার বাচনিক ত শুনেছেই প্রাসঙ্গিক অনেক তথ্য। আশ্চর্য!! এ-সবের জন্য কি অমিতের পরামর্শ নেবার কোন প্রয়োজনই মনে করল না শিবানী? কৈ এখনও ত কিছু বলছে না কেন! অমিতও এনিয়ে নূতন প্রশ্ন তুলল না আর। বস্তুতঃ এই অবস্থায় কোনো প্রবৃত্তিই হচ্ছিল না তার, শিবানীর সঙ্গে কথা বলবার। কিন্তু তবু ফর্ দ্যা ইণ্টারেস্ট্ অভ্ দ্যা ইনষ্টিটিউশন্, শিবানীকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, সে কোন্ পথে চলেছে—এই ভেবে অমিত খুব ঠাণ্ডাগলায় বলিষ্ঠ ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল: ‘আমি নিজের চোখে সংসদের ছাপানো নূতন লিস্ট্ দেখে এসেছি। সেখানে আমাদের স্কুলের কোন নামগন্ধ নেই; তবে ডিফল্টারবৃন্দেরও একটা পৃথক তালিকা হয়েছে—তার মধ্যে আপনি এই স্কুলের নাম পাবেন। আমার ত মনে হয়, য়ুনিভার্সিটির অর্ডার যদি মেনে চলতেন তাহলে এটা আজ কিছুতেই হত না।’

‘আমি এক্ষুনি ফোনে খবর নিচ্ছি।’—বলতে বলতে ভয়ংকর এক তৎপরতার সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শিবানী, ভাবলও, অমিত যখন ভিতরের অনেক খবরই নিয়ে এসেছে তখন তাকে নিরালায় শান্তভাবে কিছু বোঝানো দরকার;

তাই পাশের রুমে ডেকে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললে : 'আপনি কি একটু যাবেন, আমার সাথে?' অমিত জানতে চাইল : 'কোথায়।'

'আপনার ত এই নূতন শিক্ষাসংসদে অনেকের সঙ্গে জানাশোনা আছে, চলুন না।' এবার শিবানীর কণ্ঠস্বর করুণ মিনতিতে আচ্ছন্ন।

'মাফ্ করবেন শিবানীদি'—অমিত হাতজোড় করল : 'এই সমস্ত ডিউটি আপনার, আপনি নিজে করুন।'

শিবানী হঠাৎ অত্যন্ত চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললে : 'আচ্ছা, আপনি আসুন।'

…অমিত বাড়ি ফিরে এসে শকুন্তলাকে নিয়ে যেই বারান্দায় বসেছে, অমনি তার বাড়ির সমুখের রাস্তায় মোটরের হর্ণ বেজে উঠল। শব্দ শুনে ঘরে যেয়ে লুকোবার জন্য শকুন্তলা প্রায় লাফিয়ে ওঠে, বলে : 'আমি পালাচ্ছি। নিশ্চয় এ শিবানীদির গাড়ি।'

'ছেলেমানুষি করো না।' অমিত তাকে বুঝিয়ে বলে : 'প্লীজ ডোণ্ট্ ফর্‌গেট্ দ্যাট্ ইউ আর্ এ টীচার্ অ্যাণ্ড্ মাই কলীগ্। তাছাড়া শিবানীদিকে ভয় পাবারই বা কি আছে!'

'তিনি এখানে আমাকে এখন দেখলে কী ভাববেন।' সন্ত্রস্ত হয় শকুন্তলা।

'বেশ ত, ভাবুন না। তিনি যেমন লোক তেম্‌নি ভাববেন—ঐ ভাবনার ওপর ত কারুর হাত নেই! কিন্তু ভয়ে যদি এখন পিছিয়ে যাও, নির্ঘাত তিনি তা টের পাবেন এবং তোমাকে পরে বেকায়দায় আক্রমণ করবেনই। **So you must face the devil.**'—এই বলে শকুন্তলাকে বসিয়ে রেখে অমিত এগিয়ে চলল বাইরে গেটের দিকে।

শিবানীর গাড়ি বটে, কিন্তু শিবানী আসেনি। শুধু তার ড্রাইভার লছমনসিং এক জরুরী চিঠি নিয়ে এসেছে। অমিত তা সঙ্গে সঙ্গে খুলে পড়ল, বলল : 'ঠিক আছে। তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি এক্ষুনি।' চলে আসছিল, আবার ফিরে জিজ্ঞেস করল : 'শিবানীদি এলেন না যে—তিনি কোথায়?' জবাব দিতে দ্বিধা করল না লছমনসিং। হাসিমুখে জানিয়ে দিলে, সে এইমাত্র দিদিমণিকে 'যজ্ঞধামে' ছেড়ে দিয়ে এসেছে।

ঘরে ফিরে এসে শিবানীর চিঠিটা অমিত পড়তে দিল শকুন্তলাকে।

কেবলমাত্র এই আসন্ন পরীক্ষার জন্যই দ্য আলিপুর্ গার্লস্ ওন্ একাডেমিকে স্পেশাল্ একটা পার্‌মিশান্ দিয়েছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, অন্যথায় এ স্কুল ওঁদের তালিকায় **deleted**-ই আছে। পরীক্ষার্থিনীদের সই করা কাগজ যাতে অফিসে

জমা নেওয়া হয় সেই উদ্দেশে শিবানী যে একখানা ছাড়পত্র যোগাড় করেছিল, সেটাই ড্রাইভার এখন নিয়ে এসেছে। কিন্তু, তা আগে শিবানী তাড়াতাড়ির মধ্যে দিতে পারে নি—সেই ভুল স্বীকার করেই পৃথক একপত্র লিখে অমিতকে অনুরোধ করেছে : 'আর কারো কাছে একথা প্রকাশ করবেন না যেন মাষ্টার-মশাই। আমি টের পেয়েছি, আমার ওপর আপনি বিরক্ত হয়েছেন এটা স্বাভাবিক এবং ঝোঁকের মাথায় কামাখ্যাপণ্ডিতের সামনে বলে ফেলেছেন অনেক কিছু। যাক্‌গে সেটা একসময় ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আজ বড় নিরুপায়, আমার এই সংকটে আর কার সাহায্য নেব বলুন ত ? আপনি ত সবই জানেন।'

'বাব্‌বাঃ, কী ডেঞ্জারাস্ লেডি!' চুটকি কাটল শকুন্তলা, তারপর সকৌতুকে জিজ্ঞেস করে : 'এ-ধরনের চিঠিও লেখেন নাকি আপনাকে ?'

অমিত মুচকে হাসে, বলে : 'কারো কাছে এ-সব বলতে মানা, দেখছ ত ? আমি কিন্তু এখনও কারোকে বলিনি কিছু,—মনে থাকে যেন।'

শকুন্তলা ও অমিত দুজনেই বিষয়টা নিয়ে হাসাহাসি করল খানিকক্ষণ।

অতঃপর অমিত সিরিয়াস্ হল, বললে : 'এবার চল দিকিনি, গাড়ি যখন শিবানীদি পাঠিয়েছেন, অফিস্‌টা একবার ঘুরে আসি। লাস্ট্ ডেট্ বলে আজ, শুনে এসেছিলাম, সন্ধ্যার পরেও অফিস্ খোলা থাকবে। এই মেয়েগুলোরও ত একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ওঠো শিগগির।'

'কিন্তু আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন ?' অবাকনেত্রে তাকায় শকুন্তলা।

'এক সাথে চল, সেখান থেকে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব আমি।'

'না-না-না'—শকুন্তলা বেঁকে বসল।

অমিত বলে : 'কেন, আপত্তি কিসের ?'

'ঐ গাড়িতে গেলে বাইরে জানাজানি হবে। শিবানীদিরও কানে যাবে।'

'ও-তাই!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করল অমিত : 'জানাজানি হলই-বা যত খুশি। এর মধ্যে ত আর কোন পাপকাজ করা হচ্ছে না তোমার!' তারপর প্রায় জোর করেই শকুন্তলাকে টেনে নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়ল সে। যেতে যেতে বলে : 'শিবানীদির কোয়লিফিকেশনের সঙ্গে এবার কম্‌পিটিশন্ চলুক না—তোমার কোয়লিফিকেশনেরও। মন্দ কি!' ..

এমনি করে লাইব্রেরিতে একলা বসে যখন কালকের ঘটনাগুলি অমিত একের পর এক মনের মধ্যে সাজিয়ে নিচ্ছিল, তখন একদল ছাত্রী এসে তাকে বললে : 'মাষ্টারমশাই, আমাদের মিউজিক-হলের ভেতর আজেবাজে যতসব জিনিস ঢুকিয়ে

নোংরা করে রেখেছেন শিবানীদি। আমরা এ সব সরিয়ে দেব নাকি?' বলতে বলতে কোমরে আঁচল জড়ালো ওরা।

অমিত ওদের কিছু বলল না, শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

ছাত্রীরা যে কী বুঝল, তারাই জানে।...বেরিয়ে যাচ্ছে, সামনে পেল তারা দারয়ানকে। হুকুম দিল: মিউজিক্-হল্ আগে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি করে দাও। এক্ষুনি চাই। দলের মধ্যে যজ্ঞেশ্বরবাবুর কন্যা বিপাশাকে দেখে, দারয়ান উঠে এগোল সঙ্গে-সঙ্গে। পাশেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ হেডমিস্ট্রেস্ অশোকামজুমদারের চেম্বার,—ঐদিকে উঁকি দিয়ে দাঁড়াল একটু।

...সেখানে মিলিত টিচারদের মধ্যে তখন এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। চিন্তামগ্নাবস্থায় অশোকা বলছেন: কিন্তু স্কুলের যে কী হল, ঠিক বুঝতে পারছি না!'

'কী আর হবে?' কে জানি আড়ালে টিটকারি কাটলেন: 'বাইরে ত এইনিয়েই গোলমাল হচ্ছে, অথচ হেডমিস্ট্রেস্ নেই চেয়ারে! বুঝতে পারছেন না? অ্যাফিলিয়েশন্টা গেছে আর কি! এখন এই স্কুলে কাজ করাটাই হয়ত ভবিষ্যতে ডিস্কোয়লিফিকেশন্ হবে আমাদের।'—কথাটা শুনে কোন কোন রসিক টিচার হেসে উঠলেন বটে, কিন্তু মনের মধ্যে সকলের ঐ একই আশংকা।

ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে টিচার্স পরিবৃতাবস্থায় এল শকুন্তলা। বুঝতে চাইল, ব্যাপারটা কি? চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, হেডমিস্ট্রেসই বা কোথায়? ঘড়ির দিকে তাকাল, ক্লাশ শুরু হবারও সময় হয়ে এসেছে। যাইহোক সে কাল অমিতের কাছ থেকে জেনেছে অনেক কিছু। তাই টিচারদের বর্তমান কাল্পনিক ভীতিজনক আলোচনায় সংক্ষেপে এইটুকু আশ্বাস দিয়ে রাখল: 'যতদূর শুনেছি, স্কুলের অ্যাফিলিয়েশন্ বোধ হয় যাবে না। কিন্তু—'

'আগে এখানে বস, তারপর সব শোনা যাবে'—অশোকার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই বললেন একথাটা। কারণ গতকাল অমিতের সঙ্গে শকুন্তলা যে সংসদ অফিসে পর্যন্ত গিয়েছিল শিবানীর গাড়িতেই—এ সংবাদ ইতিমধ্যে স্কুলে এসে রটিয়ে দিয়েছে সুললিতা। শকুন্তলা বসলে পর তাকে অশোকা বলেন: 'কাল ত তুমি অনেক ভালকথা ন্যায্যকথা সব শুনিয়ে দিয়ে দিব্যি কেটে পড়লে। তারপর এদিকে শিবানীদি এলেন আমার কাছে—সেই ছবি যদি দেখতে! যাকগে অনুরোধ করে গেছেন, তোমায় সব বুঝিয়ে বলতে। বোধকরি নিজের ভুলটা বুঝতে পারছেন এবার।'

সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার উদ্বেগের বোঝা হাল্কা হয়, উদ্দীপিত কণ্ঠে বলে: 'তাহলে আমি এক্ষনি একবার শিবানীদির অফিসটা দেখে আসব কি? তাছাড়া বাইরে

যে ক্রমশ গোলমাল অসম্ভব রকমের জমে উঠছে, অশোকাদি। তাঁদেরও ত একটা কিছু জবাব দেওয়া দরকার—'

'একটু দাঁড়াও দেখছি'—বলে অশোকা দারয়ানের উদ্দেশে বেল টিপলেন।

দারোয়ান ত তাঁর দরজার ও-পাশেই অপেক্ষা করছিল। সে এই ফুরসতে এগিয়ে তার প্রতি ছাত্রীদলের নূতন হুকুমনামাটা জানাতেই অশোকা একটু ভেবে বললেন: 'মেয়েদের জন্যই ত স্কুল। এদের যাতে সুবিধা হয়, সেটাই ত দেখতে হবে।' শিবানীর কাজের বিরুদ্ধে আর কি স্পষ্ট আদেশ দেবেন তিনি, কখনও দেনও নি। তবে দারোয়ানটি দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ। কথায়বার্তায় অনুমান করল, একটা অজানা সমস্যা যেন এসেছে সকলের সামনে; তাই অনাবশ্যক আলাপে সময় নষ্ট না করে সে নিজের বুদ্ধিতে তক্ষুণি ছুটল শিবানীর ওখানে, চেম্বারে নয়—সোজা বাড়িতে।

খানিক বাদেই দেখা গেল, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন হেড্ক্লার্কমশাই: অমিতবাবু আছেন এখানে? এখানে নেই—কোথায় তিনি? স্কুলে এসেছেন, না বাড়িতে?…তাঁকে কে জানি বলে দিল: 'যান, লাইব্রেরিতে পাবেন।' খুঁজতে খুঁজতে ক্লার্কমশাই দৌড়ালেন ঐদিকে।

কী ব্যাপার! — সকলের চোখে মুখে নীরব জিজ্ঞাসা।

টেলিফোনে শিবানী ডাকছে অমিতকে।…অমিত ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে শিবানীর কথা শুনলো এক তরফা, তারপর শান্তগলায় ধীরে ধীরে জবাব দেয়: একটু ভেবে দেখুন ত, শিবানীদি—সমস্ত ব্যাপারটাকে কি অদ্ভুত বিশ্রী রকমের কন্স্পিকিউয়াস্ করে তুলছেন না আপনি নিজেই? এখন এর মাঝখানে আমি যদি এগিয়ে কিছু বলি, এটা আরো জটিল ও সন্দেহ-জনক হয়ে উঠবে। এমনকি ছাত্রীরাও সব বুঝে নিয়ে ক্ষেপে উঠতে পারে। তখন এইদিক-সেইদিক কোনদিকই সামলাতে পারবেন না। আমার ত মনে হয়, আপনি নিজে এসে উপস্থিত গার্ডিয়ানদের সামনে দাঁড়ান—বলবার থাকে ত কিছু বলুন। দেখবেন আপসে সব ঠিক হয়ে যাবে।

শিবানী তাই করল। …ক্লাশ আরম্ভের ঘণ্টা বাজতেই এসে উপস্থিত,—নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে, খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছে তাকে। গেটের সামনে কিছুটা থেমে হাসিমুখে আগন্তুকদের কী বলল যেন। জানা গেল, ওঁরা সবাই সেদিনের মত সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন।

আবার সেদিনই স্কুলের শেষ ঘণ্টায়।

সুললিতা বটব্যাল শিবানীর চেম্বারে বসে গম্ভীরভাবে বোঝাচ্ছে: 'আপনি

শুধু কম্‌প্রোমাইজিং টিউনে কথা বলেন শিবানীদি, আমার ও-সব ভাললাগে না। শকুন্তলাকে সরিয়ে দিন একটা নোটিস্ দিয়ে। কালকে সবার সামনে কি কড়াকড়া কথা আপনাকে শুনিয়ে গেল, তা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন আপনি! কত বড় ইম্‌পার্টিনেন্ট্ মেয়েটা, দেখেছেন? আর কী হ্যাংলার মতই না অমিত লাহিড়ীর পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। আপনার গাড়িতে করে ওঁর সঙ্গে কাল যায় নি? —আপনি একবার লছ্‌লনসিংকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন ত।'

আগুনের মত সহনশীল শিবানী কিংবা বলা যায় সহ্যের এক নিস্তব্ধ প্রতিমা! চোখ তুলে মিষ্টি হাসি হাসল একটু, তারপর: 'চল, এসব ভেবে দেখব 'খন। কিন্তু'—নরম গলায় সতর্ক করে দেয়: 'অমিতবাবুকে ঘাটানো তোমার ঠিক হচ্ছে না, বিউটি।' সঙ্গে সঙ্গে হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে তাগিদ দিল: 'তোমাদের বাড়ি হয়ে আমাকে ফের যেতে হবে অন্য জায়গায়। চল যাই, টাইম্ হয়ে গেছে।'

পরের দিন।···

সবাই দেখলে, অমিত লাহিড়ীর মিউজিক্ হল্‌টা আগের মতই আবার ঠিক করে নিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়ে গেছে; —কিন্তু তার মন? আগুন একবার ধরে গেলে কি আর সহজে নেভে, তার উপর যদি দুরন্ত হাওয়া বইতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে! বাতাস আর থামল কোথায়?······

তবে, শিবানীর এই ধরনের অনিয়মতাতেই যেন সকলে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে পড়তে থাকলেন; —অন্তত বাইরে থেকে কোন উচ্চবাচ্য শোনা গেল না আর। অর্থাৎ এমনিভাবে শিবানী যে এরপরেও বেশ সুদীর্ঘকাল সময় কোন রীতিতে তার স্কুলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল—এর কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না—আর সেটা খোঁজাও নিষ্প্রয়োজন। কেননা, এ-পাতাগুলো ত আর ইতিহাসের নয়—উপন্যাসের।······

তাই হঠাৎ একদিন এমনতর পরিস্থিতির ভিতরেই য়ুনিভার্সিটির পূর্বাদেশ refer করে রাজ্যের স্কুলবিভাগীয় উধ্বর্তনকর্তৃপক্ষ শিবানীকে যখন লিখিতভাবে জানালেন: আমরা অ্যাড্‌হক্ কমিটি তৈরী করে দিচ্ছি, সেই কমিটি আপনাদের স্কুল পরিচালনা করবেন। যদি এ-সর্তে রাজি হন, তাহলে স্কুল ফের অ্যাফিলিয়েশন্ পেতে পারে।···তক্ষুনি পত্রখানা আর সুললিতা বটব্যালকে সঙ্গে নিয়ে সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে বেরিয়ে পড়ল শিবানী। অমিতের কাছে আর গেল না। সুললিতা বোঝাল, দরকার নেই ওঁকে সঙ্গে নেবার। তাছাড়া যেখানে এবার যাচ্ছে, সেটা বিশেষকরে সুললিতাদেরই পরিচিত জায়গা।

মাধবী গেছে বেড়াতে হাজারিবাগ,—বাপের ওখানে।

তাঁর স্বামী ব্যারিষ্টার হৃষীকেশ গাঙ্গুলী কলকাতায় একা,—সেদিন কোর্টে যান নি। তিনি সানন্দে শিবানী আর সুললিতাকে তাঁর বাড়িতে স্বাগত জানালেন এবং স্কুল সম্পর্কীয় সমস্ত বিবরণ শুনে তাদের অভয় দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে টেলিফোন করলেন শিক্ষাসংসদ অফিসে।

জবাব এল: 'ও মিষ্টার গাঙ্গুলী? আপনি নিজে যখন এই ব্যাপারে ইণ্টারেস্টেড্ বলছেন তাহলে ত আমাদের কোন সন্দেহেরই কারণ থাকতে পারে না। আপনাকেই আমরা তার প্রেসিডেণ্ট আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটার করে দিচ্ছি, কেমন?" এ-দিকে তেমনি কায়দা করে মিঃ গাঙ্গুলী সশব্দে স্বীকৃতির হাসি হাসলেন। তারপর খানিকক্ষণ ব্যক্তিগত কথাবার্তার পর অপর প্রান্তের বক্তা কৃতার্থ হয়ে উঠলেন এবং বললেন: 'হ্যাঁ বাই দ্য বাই—ঐ স্কুলসংক্রান্তেই আরেকটু বলে নিই, এর কমিটির জন্য মেম্বার ছয় জন আপনিই কাইণ্ড্লি ঠিক করে নেবেন স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সাথে পরামর্শ করে।'

কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। শিবানীই তার বিশেষ পরিচিত আরো ছয়জনকে মেম্বার হিসাবে মনোনীত করে নিলে। স্কুলের সেক্রেটারি থেকে গেল সে নিজেই।

ব্যস্, হয়ে গেল অ্যাড্‌হক্ কমিটি গড়া।

কেবলমাত্র শিক্ষাসংসদের জনকয়েক কঠোরনীতিবাদী এই কাজের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: প্রভূতবিত্তশালী পিতার আদুরে নন্দন ব্যারিষ্টার হৃষীকেশ গাঙ্গুলীকে কলকাতা শহরে কে না চেনে! বিশেষকরে যে কারণে তাঁর অখ্যাতিকর চরিত্রের কথা প্রচারিত—তা ত কারুকে বলবার নয়। সুতরাং এহেন ব্যক্তিকে একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট মনোনয়ন করা অনুচিত।

এ সব আপত্তি টিকল না শেষ পর্যন্ত। ভোটে হেরে গেলেন তাঁরা।

···এদিকে স্কুলে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করল শিবানী। সকল টিচাররা খেতে বসলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল: স্কুল পরিচালনার জন্যে অ্যাড্‌হক্ কমিটি গড়া হয়েছে নূতন,—স্কুলের অ্যাফিলিয়াশন্ নষ্ট হয়নি।

'অ্যাড্‌হক্-কমিটি আবার কেন, শিবানীদি?' মোলায়েম করে প্রশ্ন তুলল শকুন্তলা, ঠোঁটে-চোখে তার রহস্যময় চাপাহাসি। কোন দোষ-ত্রুটি খুব গুরুতর না হলে যে অ্যাড্‌হক্-কমিটির দরকার হয় না, এ কথাটা গোপন রাখতে শিবানী বোধকরি আনন্দের আবেগে ভুলেই গিয়েছিল। এবার শকুন্তলার প্রশ্নে সপ্রতিভ হয়ে সকলের অলক্ষ্যে নীরব ভ্রূকুটি করলে, মিথ্যা কোন মনগড়া কৈফিয়ৎ দিল না আর। জবাবটা এভাবে নির্বিঘ্নে এড়িয়ে গেল এ-যাত্রা।

অশোকা তাঁর চেম্বারে বসে দীননাথকে বললেন: 'এই ব্যাপারে ত আজ

অমিতবাবুকে দেখলাম না মোটেই, তিনি যেন বাড়ি চলে গেলেন। শুনছি, শিবানীদির সঙ্গে নাকি এনিয়ে ওঁর মতান্তর ঘটেছে।' 'ঘটবেই ত'—দীননাথ সবিক্রমে জবাব দেন : 'এই অমিতলাহিড়ীই মিঃ গাঙ্গুলীকে প্রেসিডেণ্ট করার বিষয়ে জোরাল আপত্তি তুলেছিল। তাঁকে নাকি তাই শিবানীদি বলেছেন, আপনারা টিচাররা এসবে কোন মতামত দেবেন না ; আমি যা ভাল বুঝি তাই করব।' একটু থেমে দীননাথ বক্তব্যকে স্পষ্ট করেন : 'আমি ত জানি অশোকাদি, আপনারাও নিশ্চয় দেখে থাকবেন, নিজের মান-অপমানের তোয়াক্কা রাখে না অমিতবাবু কখনও, কিন্তু সমগ্র টিচার জাতটাকে এত তাচ্ছিল্য এত অপমান—তা সে সইবে কেন? শিবানীদির মুখের উপরেই পরিষ্কার শুনিয়ে দিয়েছে : তাই নাকি! আচ্ছা আমিও দেখব। —সাবাস ছেলে আমি বলি এই অমিত লাহিড়ীকে। বাস্তবিক রাগ অভিমান কি আর থাকতে পারে না! রক্তমাংসে গড়া মানুষ ত সেও! তাঁর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কবে নাকি তাঁকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শিবানীদি—মিথ্যা বলবেন না, অন্যায় কিছু করবেন না —আরো কতকি! অথচ এসব শিবানীদি মানছেন কোথায়! সে জন্যই সে ছুটি নিয়ে চলে যাচ্ছে দেওঘর।'

'তাই নাকি। কবে ফিরে আসবেন, জানেন কিছু?'

'ছুটি চেয়েছে একমাসের।' দীননাথ জবাব দেন : 'তবে শকুন্তলার মুখে শুনলাম, ওঁকে শিগ্‌গির ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন শিবানীদি। কেননা, নাচগানের নাটক একটা আর্দ্ধেক তৈরি হয়ে আছে। অমিত না-এলে এ কাজ এগুবে না। তাছাড়া বাইরে আমোদ-অনুষ্ঠানাদি করে মানুষের মনেতেও ত বিশ্বাস জাগিয়ে রাখতে হবে যে, স্কুলটা স্বাভাবিকভাবে চলছে—কোন গোলমাল নেই এতে। ঐ সবের দিকে শিবানীদির নজর আছে ঠিকই।'

…চার পাঁচদিন পর।

'কাজটা ভাল হবে না বিউটি।' বাধা দিয়ে শিবানী বললে : 'অমিতবাবু ফিরে এলে পর এ-সমস্ত তাঁর কানে উঠবেই। আর মনে রেখো, তাঁর ক্লাশ চালাবার ভার শকুন্তলাকে দিয়ে গেছেন তিনি।' তবু যখন স্নলিতা স্কুলে ডেকে আনাল শেফালিকে, তখন গত্যন্তর না দেখে শিবানী তাকে মৃদুকণ্ঠে সুধায় : 'তুমি কি পারবে অমিতবাবুর ক্লাশটা নিতে? কিছুদিনের জন্য তিনি ছুটি নিয়েছেন।'

শেফালির ত চক্ষুস্থির! অমিতের মত ক্লাশ নেওয়া? অসম্ভব তার পক্ষে।

'পারবে তুমি গানের ক্লাশ নিতে?' আবার জিজ্ঞেস করল শিবানী।

শেফালি বিনতভাবে জানায়, গানেরক্লাশ নেবার তার সময় হবে না। দরকার হলে পড়ানোর কাজ সে করে দিয়ে যেতে পারে।

এখানেও সুললিতার প্রতিবাদ: 'কেন, তুই না লখনৌ মিউজিককলেজ থেকে পাশ করে ডিপ্লোম্যা নিয়েছিস্!'

'তাইবলে কি গলাটাকে যেখানে-সেখানে নিয়ে দিনরাত চরকিবাজি খেলাব?' শেফালি সন্তুষ্ট না হয়ে বলে অকপটে: 'তোমাদের স্কুলে এতসব মেয়েদের সঙ্গে চেঁচিয়ে আমার গলার মাথা আমি খেতে পারব না কিছুতেই।'

'কিন্তু তোর দিদি যে বলল, তুই পারবি।' সুললিতা যেন তেড়ে ওঠে।

'কি?' কপাল কুঁচকাল শেফালি: 'দিদি ত তোমারই বন্ধু, সে কি গান গায় নাকি? তাঁকে দিয়ে মেরেকেটেও গান গাওয়ানো যায় না। তবে হাতের কাছে সুরে বা বেসুরে বাঁধা যে-কোন-রকমের একটা হার্মোনিয়াম পেলে দেখবে সে রাতারাতি ওস্তাদ! সে ত ভাবে, শুধু সে কেন—তাঁর মতো তোমরা অনেকেই ভাব, যে ঐ রকম একটা হার্মোনিয়মের সাথে সাহস করে কোনক্রমে পোঁ ধরতে পারলেই বুঝি গান গাওয়া হয়ে যায়—এতে গলার ব্যবহারের কোন আয়াস নেই। এই-ই যাঁদের ধারণা তাঁরা গলার মর্ম বুঝবে কি? বেশ, হার্মোনিয়ম্ বাদ দিয়ে গান কর, তাহলে ত টের পাবে তোমার কণ্ঠস্বরের স্বরূপটুকু, সৌন্দর্যটুকু! এবং তা টের পেলে, যত্ন নিয়ে ঐ-রূপ ঐ-সৌন্দর্যকে বাড়াবার উৎসাহটও আসবে মনের ভেতর—বুঝবে তখন গলা কী জিনিস। আসলে গান শিখতে হলে পরিশ্রম করতে হয় অর্থাৎ এর ভিত তৈরী করার জন্যও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন যা নাকি গীতার্থীদের কণ্ঠচর্চা নিয়েই কাটে বেশি—এই প্রিলিমিন্যারি বোধটাই আমাদের অনেকের মধ্যে আজও বেশ আশ্চর্যরকমে অনুপস্থিত! তার উপর বিশেষত হার্মোনিয়মের সঙ্গে গানাভ্যাস করলে, ওই বোধটি গীতার্থীর মনে জাগার সুযোগ আসে ক্বচিৎ, এবং বললে ভুল হবে না, কেবলমাত্র এই কারণে আমাদের প্রায় অনেকের উপর কায়েমী হয়ে আছে হার্মোনিয়ম্ যন্ত্রের প্রভুত্ব। কবিগুরুর ভাষায় বলতে পার, আমরা 'কলটেপা সুরের গোলামি' করেই চলেছি এবং এতেই আমরা আত্মহারা! যাক্ সে সব অন্যকথা।—কিন্তু এখানে বলছিলাম, তোমাদের এটা যদি গানের স্কুল হত, আমি সানন্দে যোগ দিতাম। কারণ ঐ জায়গায় শিক্ষকরা একজন আরেকজনকে পূর্ণসহানুভূতিতে বিচার করেন, গানের ব্যাপার বোঝেন তাঁরা প্রত্যেকেই। আর এ-সব জেনারেল স্কুলে সঙ্গীত-শিক্ষক ত হলেন, হংস মধ্যে বকোযথা! কোন টিচারের হঠাৎ খেয়াল চাপল তিনি গানের টিচারকে ফরমাশ

দিয়ে বসলেন : অমুক গানটা শিখিয়ে দিন না মেয়েদের, কী সুন্দর শুনলাম সেদিন অমুক সিনেমায় অমুকে গেয়েছেন। প্রতিবাদ করলে উনি ক্ষুণ্ণ হন। অথচ অমুক গানটা আয়ত্ত করার আগে যে আরো কত বৎসর ঐ সিনেমার অমুক গাইয়েকে আপ্রাণ খাটতে হয়েছে, শিখতে হয়েছে আরো কত কিছু, নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু কাজের দাবী অগ্রাহ্য করে—এ জ্ঞান ঐ টিচারকে দেবে কে? গানের শিক্ষা কিংবা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছু বোঝাতে যাও, সেটুকু শোনারও ধৈর্য নেই ওঁর। অথচ এমনতর আব্দার জানিয়ে মিউজিকটিচারের কাজে অব্‌স্ট্যাক্‌ল্ সৃষ্টি করতে কেউ লজ্জাবোধ করেন না। এতাদৃশ অভিজ্ঞতা আমার সঞ্চিত আছে কিছু-কিছু। কিন্তু কৈ, পড়ার ব্যাপারে কি কেউ এ বলে আব্দার ধরেন যে, ক্লাস ফাইভের মেয়েকে ক্লাস নাইনের বা টেন্-এর বিদ্যাটা শিখিয়ে দিন! যারা স্কুলে পড়ে তাদের আগাম কলেজের পড়া সব শিখিয়ে দিয়ে রাতারাতি বিদ্বান করে তুলুন!' একটানা এত কথা বলতে বলতে শেফালি ক্লান্ত হয়ে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয় : 'না না, ওসব আমার দ্বারা হবে টবে না। তোমরা অন্য লোক দেখ।'

মুখটিপে হাসে শিবানী। ভাবে, বাঁচা গেল। কিন্তু সুললিতা বড় জেদী, জিজ্ঞেস করে আবার : 'স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে গান করলে গলা নষ্ট হয়ে যায় তুই ত বললি। তাহলে অমিতবাবু এখানে গান শেখান কি করে, শুনি?'

শেফালি বিরক্ত হয়ে উঠল : 'হ্যাঁ আমি চিনি অমিতবাবুকে। তাঁর কাছে বসে মামুলি প্রথায় গান কারুকে শিখতে হয় না। তিনি এমন সুন্দর এক নিপুণতার সঙ্গে ঐ বিদ্যা দান করেন যে, গ্রহীতাদের অজ্ঞাতেই তা তাদের অন্তরে স্থান পেয়ে বসে। গানের শিক্ষক হিসাবে অমিতবাবুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে বৈকি। সকলের ত তা হতে পারে না। তিনি আমার নমস্য। আর ছ্যা, তুমিই বা এভাবে টিচারদের তুলনা কর কোন বুদ্ধিতে অন্যের সাথে!' একটু থেমে কি ভেবে আবার বলে : 'আজকাল একটা হাওয়া বইছে, বোধহয় পশ্চিমের অনুকরণ করেই আমাদের শিক্ষাবিদ্‌রা বলছেন, সকল ছেলেমেয়েদের গান শেখাতে হবে। সেজন্য টিচার চাই স্কুলে-স্কুলে, কলেজে-কলেজে। এই বিজ্ঞাপন ছড়িয়েই ওঁরা খালাস। কিন্তু কৈ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি তা কখনও দরদ দিয়ে দেখেন, সব দিক থেকে? না ওঁদের দেখবার কিংবা বোঝবার কোন জ্ঞানগম্যি আছে এ সব ব্যাপারে!' বলেই শেফালি একটা বিদ্রূপের বাঁকা হাসি হাসল।

'সকলে যদি গান শেখে, তা'তে আপত্তি কি?' শিবানী জানতে চাইল।

'আপত্তি নেই, শিবানীদি। গান যদি শিখতে পারে, ভালই ত।' ঠাণ্ডাগলায় বলে শেফালি : 'কিন্তু কিছু না বোঝে, না জেনে পশ্চিমকে অন্ধভাবে অনুকরণ

করতে যাওয়াটাও ত খুব গৌরবের কথা নয়। পশ্চিমের শিক্ষিতসমাজটাকে দেখেছেন আপনি? প্রত্যেকটা শিশু পৃথিবীতে জন্ম নেবার পর মায়ের কোল থেকে আরম্ভ করে জীবনযাত্রার প্রতিমুহূর্তে প্রতিকাজে তারা কেমন তালবোধ, মাত্রাবোধ, ছন্দবোধ নিয়ে বেড়ে উঠছে,—সেখানে সুরটা চাপিয়ে দিন; আহা! কী সর্বাঙ্গ সুন্দরই না হয়ে ওঠে ওদের সব কিছু! আর, আমরা?'

শিবানী মুগ্ধ। সুললিতা বোবাদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

'কিছু বুঝতে পারছ, আমি কি বলছি!' শেফালি এই সুযোগে সুললিতাকে বিশেষভাবে প্রশ্ন করে: 'গানের টিচারদের কথা বাদই দিলাম। এই যে স্কুলে স্কুলে আমাদের এত সব টিচার আছেন, এঁদের বাছাই করার জন্য প্রত্যেক স্কুলেই সিলেক্‌শান্ বোর্ড থাকে। এ-সব বোর্ড কাদের নিয়ে তৈরি হয় শুনি? সত্যি জবাব দেবে,—ভাল চিন্তাশীল নির্ভীক দরদী লোক কি এর ভিতর থাকেন কেউ?'

'কেন থাকবেন না?' সুললিতা ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলছিল।

'উঁহু,'—জোর করে থামিয়ে দিয়ে শেফালি বলে: 'এক জনও নেই। যদি থাকতেন তাহলে দিনে-দিনে কেবল আদর্শহীন গরীব, অসহায়, নিস্তেজ শিক্ষকদের সংখ্যা এঁরা বাড়াতেন না নিশ্চয়ই। দেশের ছেলেমেয়েগুলো যাতে অপদার্থ হবার সুযোগ না পায় সেদিক বিবেচনা করে সুস্থ সবল নির্ভীক শিক্ষকসম্প্রদায় গড়ে তোলার দিকেই দৃষ্টি দিতেন বেশি। আসলে হল, ওঁরা সব পাক্কা মৎলববাজ। নানা কূটবুদ্ধি দিয়ে শিক্ষকদের সমাজে দাবিয়ে রেখে নিজেদের যোগ্যতাহীন শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করাই এঁদের মৎলব। অস্বীকার করছ আমার কথা?' —এবার রীতিমত চেপে ধরল শেফালি: 'আচ্ছা বলত, কোনো মা বাবা কি আমাদের দেশে কখনও আশা করেন, যে, লেখাপড়া শেখার পর তাঁদের ছেলেপিলেরা স্কুল টিচার হোক? বেশ, আপনিই বলুন না শিবানীদি, আপনার ছেলে মিহিরকে পাঠিয়েছেন বিলেত, সেখান থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে ফিরে এলে পর, তাকে দেবেন আপনি স্কুলমাষ্টারি করতে?'

শিবানী টের পেল, শেফালি যে-সে মেয়ে নয়। কেঁচো টানতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত না সাপ টেনে বের করে সেই ভয়ে কৌশল করে কথাবার্তাটা এখানেই থামিয়ে দিয়ে শেফালিকে বিদায় করল সে কোন রকম।

…রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শিবানী যখন বিছানায় শুতে যাচ্ছে তখন টেলিফোন এল, যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞেস করছেন: 'শুনলাম অমিতলাহিড়ীর একই গাড়িতে নাকি রাধাবল্লভও ট্র্যাভেল্ করেছিল সেদিন?'

ভ্রূ কুঁচকাল শিবানী: 'কৈ, আমি ত জানিনে এসব।'

'খবরটা একটু ভাল করে জেনে নেবেন কালই।' যজ্ঞেশ্বর নির্দেশ দিলেন।

শিবানী বললে: 'আচ্ছা।' তারপর আলোটা নিভিয়ে চিন্তিত মনে শুয়ে পড়ল সে। ঐ শোয়াই সার, চোখে ঘুম এল না তার অনেক রাত অবধি।

॥ ১২ ॥

খুব ঘটা করে বিয়ে হল বিনতার। এই বিয়েতে তার নিজের মত ছিল না। জোর করে বিয়ে দিলেন যজ্ঞেশ্বর তাঁর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থে,—পাত্রপক্ষের কেউবা মন্ত্রী, কেউবা জজ, কেউবা হাকিম—এই শ্রেণীর জেনেই। কিন্তু মেয়ে তার পরেও যেতে চায়নি শ্বশুরালয়ে, বেদম কান্নাকাটি করেছিল, তবু যেন ধাক্কা দিয়ে সবাই মোটরে তুলে দিলেন ওকে।

এক গভীর অন্ধকারে পৃথিবীর বুকে হারিয়ে গেল বিনতা।

এরপর এক সপ্তাহও কাটল না। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, অতিপ্রত্যূষে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়ি পুলিশের দল ঘেরাও করেছে। পুলিশ মাত্র ঘণ্টা দুয়েক উপর উপর যে কী খানাতল্লাশ করল, বাইরের লোক বুঝল না কিছুই। শুধু দেখা গেল, একাধিক লরি বোঝাই কাগজপত্র নিয়ে পুলিশরা বেরুচ্ছে এবং যজ্ঞেশ্বরবাবুকেও গ্রেপ্তার করেছে।

সংবাদটা পরদিন খবরের কাগজে খুব সংক্ষেপে বেরুল: সম্প্রতি চল্লিশ হাজার টাকার জামিনে খালাস পেয়ে ঘরে ফিরেছেন যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক, আর বাকী সব অস্পষ্ট।

স্বভাবত এ নিয়ে স্কুলের ভিতর শুরু হল কানাঘুষা। শিবানী এসে বোঝাল সবাইকে: 'এ সমস্ত বাজে মিথ্যে কথায় কান দেবেন না কেউ। যজ্ঞেশ্বরবাবুর টাকা আছে, ঐদিকেই সকলের নজর। তাইজন্যে তাঁর ওপর শত্রুতা, হিংসা করে কলকাতার কতকগুলি কাগজ মিথ্যা সংবাদ রটাচ্ছে।' ······কিন্তু বুদ্ধিমান বিচক্ষণ প্রাজ্ঞ যাঁরা তাঁরা এ-কথায় বিশ্বাস করবেন কেন? ফৌজদারীতে অপরাধী সন্দেহ না করলে যজ্ঞেশ্বরের মত একজন বিশেষ মানীব্যক্তিকে কি পুলিশ কখনও গ্রেপ্তার করতে আসে নাকি! এও তাঁরা বুঝলেন যে, এবার মামলা যখন রুজু হবেই তখন আর যজ্ঞেশ্বরের ভাবনা কিসের! শুনানির তারিখে নূতন-নূতন কৈফিয়ৎ দিয়ে সময়ের জন্য দরখাস্ত পাঠাবেন তাঁর নামজাদা উকিলরা। তারিখের পর তারিখ ঘুরবে, মামলাও তেমনি ঘুরবে সেরেস্তা থেকে সেরেস্তায়। এ তো শুধু টাকার খেল! টাকার কি আর অন্ত আছে যজ্ঞেশ্বরের? ব্যস্, তার জোরেই গড়িয়ে যাবে অনেকগুলো তারিখ, তেমনি কত দিন, কত মাস,

কত বছর কে জানে! ততদিন আসামী বেঁচে থাকলে তবে তো তার বিচার!

এদিকে সত্যসত্যই যজ্ঞেশ্বর হাসিমুখে বুক ফুলিয়ে চলছেন। ইতিমধ্যে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন কলকাতার সব সেরা ধনপতিদের। আজকাল যেন তাঁর কারবার আরো ফেঁপে উঠল! লোকে বিস্ময় নেত্রে তাই দেখছে। টাকার জন্য আজ আছেন কলকাতা, কাল চলেছেন বোম্বাই, পুর্শ দিল্লী। ভেলকীই ত, বিরাট ভেলকী! কিছুদিন আগে যে পুলিশের উপদ্রব ঘটে গেল এসব কিছু সত্য নয়—সেটাই অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করতে বসেছেন যজ্ঞেশ্বর। এইসঙ্গে শিবানীরও উল্লাসের অবধি নেই। তার হাতে আছে বিরাট 'যজ্ঞধামে'র দলিলপত্র—এটা যে যজ্ঞেশ্বরবাবু শিবানীর নামেই করে রেখেছেন। তাই সে পরমানন্দে যজ্ঞেশ্বরের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ছে—স্কুলের কাজে তেমন মন দেয় না আর। সেখানে অফিশিয়েটিং সাজিয়ে রেখেছে সুললিতাকে। মোটেরউপর শিবানীর সহযোগিতায় যজ্ঞেশ্বরবাবুর বহ্বাড়ম্বরটা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

দেওঘর থেকে ফিরে এসে অমিত এ-সব দেখল। শুনল, স্কুলের সব টিচার্স বলাবলি করছেন, পুলিশ নাকি মিছামিছি হয়রান করিয়েছে যজ্ঞেশ্বরবাবুকে। তিনি অ্যাব্‌সলুট্‌লি ইনোসেন্ট্‌ এবং পুলিশের বিরুদ্ধে শিগগিরই মানহানির মামলা রুজু করছেন। কিন্তু এ যে সেরেফ্‌ একটা দলগত মৌখিক প্রচার! কারণ ইতিমধ্যে অমিতের সঙ্গে দেখা করে যমুনা এই সম্পর্কীয় সঠিক সংবাদ তাকে জানিয়ে দিয়ে গেছে, বলেছে: একাধিক মামলা দীর্ঘকালযাবৎ যজ্ঞেশ্বর-বাবুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে জমা হয়ে আছে। সেগুলির শুনানি না হওয়া পর্যন্ত এই বর্তমানের পুলিশ-কেসটা যাতে মুলতবী রাখা যায় সেইজন্যে একটা আবেদন পাঠিয়ে তা মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন যজ্ঞেশ্বর, আর 'বণ্ড্‌' সহি করেছেন, পুলিশকে না জানিয়ে কলকাতার বাইরে যাবেন না কখনও।

...মাস কয়েক বাদে অমিতের কাছে অকস্মাৎ বৃন্দাবন এসে উপস্থিত। তার চেহারাছবিতে এবার সুস্পষ্ট প্রমোশনের ছাপ। একগাল হেসে বললে, শিবানীর সেই বিয়ের পর থেকেই তাঁর আণ্ডারে রান্নার কাজ করে এসেছিল একটানা—আর ভাল লাগে না। গাড়ি চালাবার লাইসেন্স আছে বৃন্দাবনের। তাই রান্নার কাজ ছেড়ে দিয়ে সে আজকাল থাকে চন্দ্রাবলীর ওখানে, তাঁদের বাড়ির মোটর-ড্রাইভার। সুললিতাকেও নাকি গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে সে।...

...জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই সুললিতা তার মা যোগমায়াকে হারিয়েছিল। যোগমায়ার কোন বিশেষ প্রলুব্ধকর রূপ ছিল না। তাই কালিপদ বটব্যালের মন প্রথম যৌবনে বাড়িতে আটকা থাকত কচিৎ! উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতেন

তিনি এখানে সেখানে। এসব কথা আজ হয়ত নিজে ভুলে গেছেন, অন্তত বাইরের লোকেরা ভুলেছে নিশ্চয়। ভুলিয়েছেন এই চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, সুন্দরী, আধুনিকী। এটর্নী কালিপদ রীতিমত বৃদ্ধ হয়েছেন, অথচ চন্দ্রাবলী যে এখনও পথহারা থমকে দাঁড়ানো এক স্রোতস্বিনী,—কন্যা সুললিতার প্রায় সমবয়সী কিংবা ছোটও হতে পারেন। কালিপদ তাই বহু ব্যস্ততার মধ্যে অনেক কিছু ভুলে ঐ মুখের দিকে মাঝে মাঝে মুগ্ধ তন্দ্রালুলোচনে চেয়ে থাকেন।

চন্দ্রাবলী জিজ্ঞেস করেন: 'তুমি শিবানীকে একটু সাবধান করে দাও না কেন?' প্রশ্ন শুনে কালিপদ চমকে বলেন: 'খুব যে দরদ দেখছি শিবানীর জন্য! কেন, মাখামাখি সুরু করেছ নাকি আজকাল ওর সঙ্গে আবার?'

'আমি মাখামাখি করতে যাব কী জন্যে?' অভিমানে চন্দ্রাবলীর কণ্ঠস্বর বিগড়ে ওঠে, বলেন: 'তোমার মেয়েই ত সবসময় ওর কথা শোনায় এসে!'

'হুঁঃ আমার মেয়ে! ওর মাথা ত তুমিই খেলে! বিয়েটা হয়ে যেত অল্প বয়সে, তা তখন বাধা দিলে তুমি। শিবানী হল ওর টিউটরেস্, আর তার বুদ্ধিতেই স্কুলে-কলেজে ঢোকালে বিউটিকে। কী হল এসব পাস্ করে? ঘরের কাজকর্ম শিখেছে? জানে কিছু? বয়স ত আর ওর নীচের দিকে যাচ্ছে না, ত্রিশ পেরিয়ে গেছে কবে জানি! তুমি আবার শিবানীকে দিয়ে ওদের স্কুলের অমিত লাহিড়ীর পেছনে লাগিয়েছিলে বিউটিকে,—না? সে খবরও আমার কানে এসেছে; বাট্ দ্যাট্ ওয়েজ্ নট্ প্রপার্।' রীতিমত বিরক্ত হয়ে কালিপদ বলতে থাকেন: 'তাছাড়া এখন যেন সীমার বাইরে চলে গেছে ও। আজকাল কোর্টে যেয়ে শুনি, আমাদের চ্যাংড়া ব্যারিস্টার হৃষীকেশ গাঙ্গুলীর বাড়িতেই সুললিতা থাকে বেশিক্ষণ!'

'গাঙ্গুলী যে গো ওদের ইস্কুলের নূতন প্রেসিডেন্ট্।'

'তা তুমি ত সবই জান।' কালিপদ উঠতে উঠতে বলেন: 'যাক্ সকালবেলা এসব কথা বাদ দাও। দেখি, আমার পথ ছাড়. কাজ পড়ে আছে অনেক।'

'কিন্তু আমি যা বললাম, ভাবলে কি কিছু শিবানীর বিষয়?'

'ও আবার কী ভাবব!' তাচ্ছিল্য দেখান কালিপদ, তারপর বলেন সামান্য হেসে: 'প্রায় চার লাখ টাকা একসাথে পেয়েছি যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাছ থেকে, আরো ত পাব। এখন তাঁকে এভাবে বফাঁস করে দিলে ধর্ম সইবেন না। তাছাড়া, আমি যে ওঁর লীগ্যাল্ অ্যাড্ভাইসর্ এ তো সবাই জানে।'

'তাহলে কি হবে শিবানীর?' চন্দ্রাবলীর গলায় হতাশের ছোঁওয়া।

'কী আর হবে! আমি ত অনেককাল আগেই কৃষ্ণপদকে দিয়ে বলিয়েছিলুম। সেও দিবাকরকে সবই বলেছে,—ঠোঁট কাটা স্পষ্টবাদী, বাদ দেয়নি কিছু। কিন্তু শিবানী যখন তার স্বামীর কথাই বিশ্বাস করে না, আর শখ করে চুলোয় যেতে চায়,—তা যাক! আমি কী করব?' এবার পা চালান কালিপদ। তাঁর পিছন চলতে চলতে চন্দ্রাবলী ফের জের টানেন: 'কিন্তু ভেসে যাবে যে মেয়েটা।'

'আরে, ও রকমের মেয়ে ভাসে না কখনও গিন্নী।' আড়চোখে তাকিয়ে বিষাদ কণ্ঠে জবাব দেন কালিপদ: 'তোমার মত ঘরকুনো স্বভাবের রূপবতী হলে ভাবনা ছিল। কিন্তু এ বিন্দুবালার কন্যা, মাভৈঃ ঘাট চিনে নিয়ে নঙ্গর ফেলতে জানে নিজেই।' এ কথাগুলি বলতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর নিজের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল,—একটা ব্যথাও পেলেন যেন। কিন্তু এসব ভাবতে গেলে আবার সময় নষ্ট হবে। আর অপেক্ষা করলেন না তিনি, ঘরের দুয়ার দ্রুত পেরিয়ে এলেন।

···সেদিন কিংবা তার পরের দিনই দুঃসংবাদ এল একটা: বিনতা বিধবা হয়েছে। বিনতার মা কান্নাকাটি করলেন খুব। লোক পাঠিয়ে মেয়েকে আনাতে পারলেন না কিছুতেই। মেয়ে বলে দিয়েছে, যাবে না সে স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও—এতে স্বামীর আত্মার অকল্যাণ হবে তার। এই সঙ্গে শিবানীর বিরুদ্ধেও কী একটা মারাত্মক রকমের সতর্ক ইঙ্গিত জানিয়ে দিয়েছে বাপের বাড়ির সবাইকে।

যজ্ঞেশ্বর সুরাপান করতে-করতে শুনলেন এ সব। মাত্রাটা খুবই অতিরিক্ত হয়েছিল। হঠাৎ হাতের গ্লাসটা ছুঁড়ে মারলেন একটা কিছু লক্ষ্য করে। কাচ ভাঙার শব্দ হল। ···সবাই ছুটে এসে দেখে, তাঁর স্ত্রীর কপালের অনেকটা জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে।

···অমিত যেন এতক্ষণ এক উপন্যাসের পৃষ্ঠা শুনছিল বৃন্দাবনের মুখ থেকে।

বৃন্দাবন ফের সুরু করে: 'তাহলে দেখুন ত মাস্টারবাবু, এই সমস্তকিছুর মূলেই আছেন শিবানীদি। শেষকালে লাগলেন কি না এই অধম বৃন্দাবন মণ্ডলের পিছনে, শাসালেন, মাইনে দেব না। যা তুই আদালতে গিয়ে কেস করগে। কথায় কথায় কেসের দেমাক আসে কোত্থেকে? আমরা লেখাপড়া কম জানি বলে কি আর বুঝিনে কিছু? আমি কেস্ করলেই ত উনার পোয়াবারো! যাক্‌গে, সেখানকার চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে কি খারাপ করলাম, বলুন ত?'

অমিত বোবার মত নিষ্প্রাণ চেয়ে আছে; কী আর বলবে! তবু বৃন্দাবন নূতন উৎসাহে শুনিয়ে যায় চুপিচুপি: 'আরেকটা ব্যাপার আপনাকে ত বলিনি,—

উনার ওখানে থেকে এ-সব বলা চলে না। আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, আমাদের জামাইবাবু যে উনাকে একেবারে তালাকই দিয়েছেন।'

'কে? দিবাকরবাবুর কথা বলছ?' অমিত ভুরু কুঁচকালো।

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু, আপনি ত জানেন না শিবানীদির স্বভাব! বিয়ের আগেই ভালবাসতেন আরেক জনকে। কথাবার্তা ঠিক ছিল, বিয়ে হল না সেখানে। শিবানীদির মা-ই নাকি তা ভাঙ্গলেন। তবু দেখুন দিকি, জামাইবাবু দেবতার মত লোক—তাঁকে কী ফাঁকি ঝুঁকি দিয়ে শিবানীদি ঘুরে বেড়াতেন ঐ সুরঞ্জন-বাবুর সঙ্গে। দার্জিলিং ত বিয়ের পর ওঁর বাড়িতেই গিয়েছিলেন। এই নিয়ে জামাইবাবুর মায়ের কী রাগারাগি—'

'যাও, যাও—ও-সব পরের হাঁড়ির খবর আমি শুনতে চাইনে।' এই বলে বৃন্দাবনকে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিল অমিত।

॥ ১৩ ॥

স্কুলের ভিতর অপ্রত্যাশিতভাবে পিওন এসে হাজির।

কেবলমাত্র কামাখ্যা আর দীননাথ ছাড়া সকল মেল্‌টিচারের নামেই সমন নিয়ে এসেছে। কোর্টের সমন,—স্টেটের পক্ষ হয়ে তাঁদের সাক্ষ্য দিতে হবে স্কুলের এক্‌স্ প্রেসিডেন্ট যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিকের বিরুদ্ধে।··· টিচার্স অবনী ঘোষাল, হরি মল্লিক, শশাংক সেন, অমিত লাহিড়ী এই চারজনকে ডেকে গোপনে মিটিং বসাল শিবানী। সেখানে নানা বিষয় আলোচনার ফাঁকে নিজ বুদ্ধি মত বললে: 'আপনারা যদি কোর্টে গিয়ে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে কিছু বলেন, তাহলে আমার স্কুলে আর আপনাদের হয়ত রাখতে পারব না।'

সকলেই ত ভয়ে কম্পমান, চাকরির মায়া কি নেই! এই নাটকীয় দৃশ্য দেখে অমিত হাসল, বললে: 'শিবানীদি বুঝি ছাঁচে ঢেলে সাক্ষী গড়ছেন?' একটু থেমে গম্ভীরভাবে জানায়: 'স্কুলের সঙ্গেই বা এর কি সম্বন্ধ, আমি ত বুঝতেই পাচ্ছি নে। যাক্‌গে, ইউ নীড্‌ নট্‌ ওয়ারি, শিবানীদি। বিশেষত আপনার স্কুলের টিচাররা কেউ নাবালক নন, অশিক্ষিতও নন—তা আপনি ভাল করেই জানেন।' এই এক কথায় ভেঙ্গে দিল সে শিবানীর মিটিং।

ভুল বুঝল শিবানী। আগুন জ্বলল তার বুকে—অদম্য সে বহ্নিশিখা! এত বড় আস্পর্ধা অমিতের! ভাবতে ভাবতে শিবানী যেন জ্ঞানহারা হয়ে পড়ল।

সুরু হল এর প্রতিক্রিয়া।······

অতিষ্ঠ হয়ে একদল শিক্ষয়িত্রী, পেছনে শকুন্তলাও, গিয়েছিলেন পরের দিন

অমিতের চেম্বারে। প্রচণ্ড বিক্ষোভের প্রকাশ তাঁদের চোখে মুখে প্রতি অঙ্গে। তাঁদের সব কথা শুনে অমিত জিজ্ঞেস করল: 'আপনারা দল পাকিয়ে স্কুলের মেয়েদের ক্ষেপিয়ে তোলার ব্যবস্থা করছেন কেন?'

'আপনি কী বলেন, অমিতবাবু!' সমস্বরে জবাব আসে ওঁদের: 'যাচ্ছে তাই করবেন শিবানীদি, আর আমরা তা সহে যাব?'

'না, সইবেন কেন? অন্যায় সহা ত উচিত নয়।' অমিত বোঝাতে চেষ্টা করে: 'স্কুলে খবরেরকাগজ নিয়ে আসতে আপনাদের বারণ করেছেন শিবানীদি, কারণ যজ্ঞেশ্বরবাবুর লেটেস্ট্ সংবাদটা সবাই জেনে যাবে এই তাঁর আশংকা। কিন্তু ওঁকে বুঝিয়ে বলুন, এ ধরনের অর্ডার যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। শোধরাবার সুযোগ পেলে উনি শোধরেও ত যেতে পারেন। আপনারা ধৈর্য ধরুন একটু।'

'হুঁ:, শিবানী মুখার্জি আবার শোধরাবেন!' কে জানি টিপপ্‌নী কাটলেন আড়ালে: 'সাপ তার ধর্ম ভুলে কখনও?' তা শুনে অমিত মৃদু হেসে বলল: 'একটা জন্তু যতই হিংস্র হোক্ না কেন তাকে খাঁচায় আটকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারাটাই বা কী রকমের বাহাদুরী? তাছাড়া শিবানীদি এখন বড় বেকায়দায় পড়েছেন, সেটাও ত ভেবে দেখবেন আপনারা!'

‥ শিবানী কিন্তু অন্যদিকে এগিয়ে যাচ্ছে ধাপে ধাপে।

অমিত ঐ সব জানে না, -বোধকরি এতটা ভাবতেও পারে নি। সেই যে সে গোপন মিটিং ভেঙ্গে দিয়েছিল, ঠিক তৎক্ষণাৎ মনে অদম্য উষ্মা আর উত্তেজনা নিয়ে একাই চলে গিয়েছিল শিবানী, বলেছিল: 'আপনি যখন যজ্ঞেশ্বরবাবুর পক্ষের ব্যারিস্টার তখন অপোনেন্ট্ পার্টির সাক্ষীদের স্কুল থেকে এক্ষুনি সরান। কেন পারবেন না?'‥ অহো, কী দৃপ্তভঙ্গী শিবানীর। তার ঐ তাৎক্ষণিক বিলোল কটাক্ষে কাতর হয়ে অল্প বয়স্ক প্রেসিডেন্ট গাঙ্গুলী দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছিলেন; ব্যারিস্টারী বুদ্ধি তাঁর আচ্ছন্ন হয়েছিল। স্কুলের সঙ্গে যে এর কোন সম্পর্কই নেই এই সহজ সামান্য যুক্তিটুকুও তাঁর মাথায় তখন আসেনি। এলেও সুযুক্তির পরোয়া করেন নি। পাইপ্‌টা টানতে-টানতে রাশভারীচালে বলেছিলেন: 'আচ্ছা আমি দেখছি। আপনি মিস্ বটব্যালকে একবার পাঠিয়ে দেবেন এখানে।' ভাবছিলেন, একটা স্ট্যটেবিলগ্রাউণ্ড্ তো সাজানো দরকার।

···সেদিনই বিকেলের দিকে স্কুল ছুটির পর শকুন্তলা গেল অমিতের বাড়ি। বড় বেশি রকমের শ্রান্ত খিন্ন দেখাচ্ছিল তাকে। যেন পথে ঝড় ডিঙ্গিয়ে এসেছে।

'আপনি ত খুব ভাল ভাল কথা শুনিয়ে বোঝা দিয়ে এলেন ওঁদের সবাইকে! কিন্তু'—শকুন্তলা বলে অমিতকে: 'হিংসার জগতে অহিংসার নীতি ছড়ানোর

কাজটা কি অনেকখানি বানরের গলায় মুক্তোর হার পরিয়ে দেওয়ার মত নয় ?'

অমিত স্মিতনয়নে খানিকক্ষণ তাকিয়ে হতাশকণ্ঠে বলে : 'সকলেই যদি বানর সাজতে চান, তাহলে আর কী করি !' —একথার বিরুদ্ধে শকুন্তলা যুক্তি টেনে অমিতকে শোনালো অনেক কিছু।

অমিত অবশ্যি বিনা প্রতিবাদে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল সব। কিন্তু এর পর যখন চোখের জল আর আটকাতে না পেরে শকুন্তলা প্রায় ফোঁপানোস্বরে বলতে থাকে : 'শিবানীদি যদি এ-ভাবে স্কুলের ভিতর জোরজবরদস্তি চালান, তাহলে কি করতে পারি আমরা বলুন ত ?' তখন বড় অপ্রস্তুত হয় অমিত, সদরদে সুধায় : 'আবার নূতন কি করলেন তিনি, শুনি ?'

শকুন্তলা ঘটনা বিস্তৃত করে : সুললিতা নাকি স্কুলের নূতন প্রেসিডেন্ট মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ঐদিন দুপুরেই পরামর্শ করে এসেছে। তিনি বলেছেন, অমিত যখন স্কুলের একজন পুরনো-পার্মানেন্ট্-পপুলার-টিচার তখন তাঁকে একলা সরিয়ে দেওয়া মুশকিল। শিবানী তাই শলা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনো মেল্‌টিচারই তাহলে রাখবে না তাঁর স্কুলে। তাই দরজা বন্ধ করে ইতিমধ্যে সব শিক্ষিকাদেরই হুকুম দিয়ে দিয়েছে, মেল্‌টিচারদের কাজে খুঁত ধরে একটা রিটন্ কমপ্লেন্ তৈরি করে রাখতে। এ-সব সাজানো কমপ্লেন্ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাতে আর স্কুলে মেল্‌টিচার না রাখা হয় সেই চেষ্টা করবে শিবানী।

অমিত ত হতবাক। শকুন্তলা বলে যাচ্ছিল আরো : 'আমাকে যদিও শিবানীদি সরাসরি কিছু বলতে পারছিলেন না, তবে শুনিয়ে শুনিয়ে জোর গলায় বলছিলেন, মিউজিক্ হলের মাঝখানে নাকি পাকা-পার্টিশান করে দেওয়া হবে, অন্যান্য ক্লাস নেবারও বন্দোবস্ত হবে সেখানে। আমরা যেন তাতে কোন আপত্তি না করি। আর জানেন, স্কুলের ছোট-বড় সব মেয়েদেরও সেইভাবে ইন্‌স্ট্রাক্‌শান্ দিতে হবে —এই অপ্রিয় কাজ সাধন করার দায়িত্বটিও পড়েছে আমাদের স্কন্ধে।'

অমিত রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল এবার, বললে : 'ছেলেদের স্কুলের কোন এক হেড্‌মাষ্টার যদি তাঁর অধীনস্থদের সঙ্গে এই ধরনের পরামর্শ চালাতেন, তাহলে তাঁর অবস্থা আজ কি হত জানো ? এখানেই বোধকরি কোনো অর্গ্যানিজেশানের ব্যাপারে মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের তফাৎ ! যাক্‌গে সে-সব'—থেমে কথার সুর বদলাল অমিত : 'তাহলে তোমরা আগে যা প্ল্যান্ করেছিলে সেভাবেই চল,—উপায় কি আর !'

ক্ষণেক নিস্তব্ধতার পর শকুন্তলা বলল অমিতকে : 'দিন্ না আমায় অন্য কোথাও একটা কাজের ব্যবস্থা করে, এই স্কুলটা তাহলে ছেড়ে দিই।' এরপর

স্বগতভাবে বলে : কোনো মেয়েটিচার যে এবার সহজে হেডমিস্ট্রেসের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াবেন তেমন ভরসা খুব কমই দেখছি। অমিতকে তবু নিরুত্তর দেখে শকুন্তলা পুনশ্চ বিনম্রকণ্ঠে তার অনুরোধ জানালে অমিত জিজ্ঞেস করে : 'আবার কি এই স্কুল-মাষ্টারিই করবে,—এই কলকাতা শহরে ?'

'তাছাড়া আর কি করতে বলেন ?'

'তোমার বাবা-মা এঁদের কি ইচ্ছা ?' প্রশ্ন তুলে অমিত অলসভাবে জানায় : 'ওঁরা ত সেদিন আমায় বলছিলেন—'

'আহ্'—বাধা দেয় শকুন্তলা : 'আপনি এখন প্লীজ্ ঠাট্টা করবেন না।' একটুক্ষণ থেমে বলে : 'আমি তাহলে চললাম।' তারপর শকুন্তলা যেন রাগ করেই চলে যেতে উদ্যত হয়। তা' দেখে অমিত হাল্কা হাসিতে বলে : 'ডোণ্ট্ বী সিলি ! এতে টেম্পার্ হারাচ্ছ কেন ? শান্ত হয়ে বস।'

শকুন্তলা বসলে অমিত জিজ্ঞেস করে : 'আচ্ছা বলত, হোয়াট্ ইজ্ দ্যা এম্ অভ্ ইওর লাইফ্ ?'

কঠিন প্রশ্ন বটে। কিন্তু শকুন্তলা কোন বিশেষ চিন্তা না করেই জবাব দেয় : 'কেন, এই শিক্ষার লাইন নিয়েই আমি থাকতে চাই।'

'হুঁম্'—অমিত বলে : 'এই লাইন নিয়েই ত আছেন শিবানীদেবী, সুললিতাদেবীর মতন মহীয়সীরা ! তুমি কি তাঁদের বাদ দিয়ে নতুন কোন স্পেশাল নারী-সম্প্রদায় গড়তে চাইছ নাকি ?'

শকুন্তলা টের পেল, অমিত তার সদ্যলব্ধ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এ-সব বলছে—এবং এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, মিথ্যাও নয়। তাই একটু ভেবে শান্ত গলায় পাল্টা প্রশ্ন তোলে : 'আপনি কি তাহলে বলতে চান, মেয়েরা উচ্চ আদর্শ নিয়ে শিক্ষাদানের কাজে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে পারে না ?'

'নিশ্চয় পারে। পারে শুধু সেই সমাজের মেয়েরা—যে সমাজ সর্বাঙ্গীন সুস্থ, উন্নত ও প্রশস্ত। কিন্তু'—বলতে বলতে দুঃখ জানায় অমিত : 'আমাদের সমাজের গঠন যে একেবারে স্বতন্ত্র, শকুন্তলা। এখানে যাঁরা বিদুষী তাঁরা সকলে যে আজও জলচল হয়ে ওঠেননি—একথা তুমি ভুলে যেও না।'

'আপনার এই আলোচনায় আমি নিশ্চয় যোগ দেব'—করপুটে শকুন্তলা বলল : 'কিন্তু আজ বড় ক্লান্ত। শিবানীদির মতিগতিটা যে কোন দিকে বইছে ঠিক ধরতে পাচ্ছি না, মনটাও সেই জন্যে বড বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।'

সেদিন আর কোন বিশেষ কথাবার্তা হল না।

…কিন্তু এর দিন কয়েক বাদেই—

শকুন্তলাকে স্কুলে দেখতে পেল না অমিত। শুনল, তাকে নাকি স্কুল ছেড়ে দেবার জন্য এক মাসের নোটিস্ দেওয়া হয়ে গেছে। ব্যাপারটা যেন কী রকম অ্যাব্‌নর্‌ম্যাল্ ঠেকল অমিতের কাছে! একটা শিক্ষানিকেতনের ভিতর এমনতর অপ্রীতিকর কাজ নীরবে ঘটে যায়, তা কেউ বিশেষ লক্ষ করে না, জানে না, জানতে চায়ও না—এরই বা কারণ কি? আর শকুন্তলা নিজেই ত এখবর তাকে জানাতে পারত, জানায় নি কেন! অমিত সচেতন হল; শিবানীর সঙ্গে এখন দেখা করল না। ব্যক্তিগত প্রয়োজন উল্লেখান্তে স্কুলের প্রারম্ভেই ছুটি নিয়ে সোজা চলে গেল সে দমদম। সমস্ত ব্যাপারটা শকুন্তলার মুখ থেকেই তাকে জানতে হবে।....

'দীননাথদার কাছে গিয়েছিলে? তাঁকে কাগজপত্র সব দেখিয়েছ?' প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে করে অমিত সর্বশেষে জানতে চাইল: 'তিনি কিছু বলেন নি?'

'কী আর বলবেন! বললেন আমাকে, এখন যাও হাতে পায়ে ধরগে শিবানীদির।' শকুন্তলা আর পারল না নিজেকে সামলাতে। দুঃখে অপমানে অবিরাম ধারায় চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে তার;—অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে যেন চেঁচিয়ে উঠল: 'না না না, সে আমি পারব না। কিছুতেই পারব না মাষ্টারমশাই।'

'আচ্ছা, এর মধ্যে পায়ে হাতে ধরাধরির কথাই বা ওঠে কি জন্যে?' একটা বিস্ময়কর বিরক্তি নিয়ে অমিত বলে: 'দেখি, নোটিস্‌খানা আমাকে দেখাও ত।' নোটিস্ দেখে ক্ষণেক স্তব্ধতার পর অমিত ঠাণ্ডাগলায় শকুন্তলাকে বললে: 'ঠিক আছে, তুমি শিক্ষাসংসদের কাছে অ্যাপিল্ কর।'

শকুন্তলা নিঃসাড়, হতভম্বের মত জিজ্ঞেস করে: 'আপনি বলছেন কি? আমার অ্যাপিল্ এ সব জায়গায় টিকবে? আমাকে কোনো অ্যাপয়ণ্ট্‌মেণ্ট্ লেটার্ দেওয়া হয়নি, আমার পোস্ট্ নাকি পার্মানেণ্টও নয় দীননাথবাবু বললেন। তাছাড়া, নোটিশ-পত্রের তলায় দেখতে পাচ্ছেন প্রেসিডেণ্ট্ এইচ্-কে-গাঙ্গুলীর সই—তিনি না আইনবিদ্ ব্যারিষ্টার একজন?'

'এত সব অন্যায় ব্যভিচারের একত্র সুন্দর সমাবেশ বলেই ত তোমাকে অ্যাপিল করার জন্য জোর দিচ্ছি শকুন্তলা।' বলতে গিয়ে হেসে উঠল অমিত।

'বারেঃ, আপনি হাসছেন! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বোঝবার দরকার নেই।' অমিত গম্ভীর ভাবে অভয় দিল: 'তুমি আগে চল ত আমার সঙ্গে। সংসদ-অফিসেই আপিল করার ফর্‌ম্ পাবে, কিচ্ছু তোমাকে ভাবতে হবে না। সেখানেই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। তারপর দেখা যাবে শিবানী মুখার্জি কি জবাব দেন!'

'ভারী আশ্চর্য ত!' শকুন্তলা অলসকণ্ঠে মন্তব্য কাটল।

'আশ্চর্য নয় কিছু। অ্যাপয়েন্ট্‌মেণ্ট্‌ লেটার্‌ আগে না দিয়ে কারুকে কাজে নিযুক্ত করা, এমনতর দুর্নীতি যে আমাদের মধ্যে আজকাল হামেশাই চলছে—এ আর কে না জানে। অথচ এর প্রতিবাদ করবে না কেউ, কাজেই কর্তৃপক্ষেরাও এর সুযোগ নিয়ে এম্‌প্লোয়িদের কেন ভোগাবেন না, বল?' অবশেষে একটু থেমে অমিত রীতিমত কঠিন হয়ে উঠল: 'তার উপর তোমার পোস্ট্‌ যে পার্মানেণ্ট্‌ নয়, তার প্রমাণ কোথায়? তুমি এই স্কুলে প্রায় পাঁচ বছরের উপর কাজ করছ—এর মধ্যে কি তোমাকে কখনও জানানো হয়েছে যে, তুমি টেম্পরয়্যারিলি অ্যাপয়েন্টেড্‌ সুতরাং যে কোন মুহূর্তে ওঁদের খেয়ালখুশি মত তোমাকে তাঁরা তোমার কাজ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন?'

'কৈ, না তা!' শকুন্তলার জবাব এবার সতেজ।

'কাজেই দেখ, গোপনে-গোপনে কত ছোটখাটো বিশৃঙ্খলার প্রশ্রয় দিয়ে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্‌গুলির মধ্যে যদৃচ্ছচারিতা চালিয়ে যাবার পথ কি আমরা নিজেরাই তৈরি করার সাহায্য করছি না? আইনকানুন যথানিয়মে মেনে চললে বিশৃঙ্খলা কি আসতে পারে কখনও?'

শকুন্তলা বোবার মত তাকিয়ে আছে অমিতের মুখের দিকে।

অমিত আবার জোর গলায় বলে: 'আর এগুলো ভাল করে জেনে শুনে সাপোর্ট করছেন মিঃ এইচ্‌-কে-গাঙ্গুলীর মত একজন বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত আইনবিদ্‌ তাও কি বিশ্বাসযোগ্য? অন্যদিকে, স্কুলের প্রবীনবয়স্কটিচার দীননাথবাবু তোমাকে বলছেন, বোঝাচ্ছেন শিবানীদির হাতে পায়ে গিয়ে ধরতে! হায়রে! কী সব আজবকাণ্ড দেখ ত! কেন, কেন এই অদ্ভুত মনোভাব আমাদের? তুমি কি এখানে চুরি বা অন্যায় কাজ করেছ কিছু?'

শকুন্তলা খোঁজে পায় না কি যে বলবে!

'এর মধ্যে নিশ্চয় কোন সূক্ষ্ম চালাকী আছে, ষড়যন্ত্র আছে'—মন্তব্য করতে করতে অমিত আরো বলে: 'সেদিন তোমরা সবাই যখন দল পাকিয়ে শিবানীদিকে অপমান করতে চেয়েছিলে সেকাজে আমার সমর্থন পাওনি। তা'বলে আমি এবারকার এই অন্যায় সহ্য করতে তোমাকে কিছুতেই দেব না, শকুন্তলা। যাও, তুমি তৈরী হয়ে নাও গে। আমি এক্ষুনি ফোন্‌ করে জেনে নিচ্ছি এখন গেলে অফিস আমরা খোলা পাব কিনা।' বলেই অমিত দ্রুত বেরিয়ে পড়ল।

...অমিতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় শকুন্তলার চিত্তাকাশ ভরে উঠছে। মনে পড়ছে তার, এই ত কদিন আগেই অমিত তাকে বোঝাতে চাইছিল: 'আমি বারবার বলি, মেয়েদের ভালকাজ মহৎকাজ করবার ক্ষমতা অসামান্য। তাহলেও

তুমি ভুলে যেও না শকুন্তলা, খুব ছোটখাটো রকমের ভাল মহৎ কাজ করতে গেলেও আমাদের সমাজের মেয়েদের সামনে, বিচিত্র ধরনের অপোজিশন্ এ ভাবে নয়ত ও-ভাবে দিনরাত কিন্তু লেগে থাকেই থাকে। আর ঐ কাজ যদি বিশেষ-করে ঘরের বাইরের হয়, তাহলে ত অতিঅব্যশ্যই। অমিতকে আর বেশি বলতে না দিয়ে তর্ক তুলেছিল শকুন্তলা : 'সেটা হলই বা! আমরা কেন পারব না তা ওভার্‌কাম্ করতে?' 'যদি পার খুব ভাল কথা'—অমিত স্নেহময় হাস্যে বলেছিল শেষে : 'কিন্তু ব্যাট্‌ল্ ফীল্ড্-এ নামলে দেহমনের ওপর রক্তের ছিটাফোটা এসে লাগবেই, তারজন্যেও প্রস্তুত থাকতে হয়।'

শকুন্তলা সদর্পে জানিয়েছিল : 'আমি সকলক্ষেত্রেই প্রস্তুত।'

তাহলে এবার! নাঃ অ্যাপিল করবেই শকুন্তলা, লড়বে অন্যায়ের বিরুদ্ধে—তাতে ভয় কিসের। নিজের মনকে দৃঢ় করে নিল শকুন্তলা।

…হেড্ মিস্ট্রেসের হাতে যথাসময়ে শিক্ষাসংসদের আদেশ পত্র গিয়ে উপস্থিত : অ্যাপিল-কেসের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শকুন্তলা ত্রিবেদীকে আলিপুর গার্লস্ ওউন একাডেমিতে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে বহাল রাখতেই হবে।

শিবানীর ত চক্ষুস্থির!

প্রেসিডেন্ট্ গাঙ্গুলীর কাছে পরামর্শ চাইতে গেল শিবানী। তাকে প্রেসিডেন্ট্ বললেন : 'আপনি ছুটি নিয়ে বাইরে চলে যান।'

…এক সপ্তাহও বোধ হয় কাটেনি এর পর।

কোথায় এক টি-পার্টিতে জাষ্টিস্ ডি-কে সান্যালের পরিচয় পেয়ে অনেক বৎসর পর তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন ছোকরা ব্যারিষ্টার হৃষীকেশ গাঙ্গুলী। তাঁর সঙ্গে কথায়-কথায় জাস্টিস্ সান্যাল সহসা হেসে উঠলেন : 'হাইকোর্টে বাপের এত বড পসারটা যখন পেয়েছ তার উপর আবার একটা মেয়ে স্কুলের প্রেসিডেন্ট হতে গেলে কেন হে হৃষীকেশ? ওর মধ্যে টাকা পয়সা কিছু খাটাচ্ছো নাকি?' প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে শ্লেষাত্মক।

হৃষীকেশের মনে পড়ে : বয়স আর কত, ছয় সাত এই রকম হবে। তার বাপকে ছোটভাইয়ের মতই স্নেহ করতেন এই ডি-কে-সান্যাল। তেমনি হৃষীকেশও আদর আব্দার কম পেত না ওঁর কাছে। তারপর যেদিন চাকরিতে বড় রকমের লিফট্ পেয়ে মিঃ সান্যাল চলে গেলেন কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে, হৃষীকেশও তখন সঙ্গে যাবার বায়না ধরেছিল। কিন্তু তাকে যেতে দেবে কে? এতটুকু ছেলে হৃষীকেশ, বেচারা উপোস আর কান্নায় কাটিয়েছিল সমস্তটা দিন।

…ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন, দ্য আলিপুর গার্লস্ একাডেমির প্রেসিডেন্ট

ব্যারিষ্টার মিঃ গাঙ্গুলী বৃদ্ধ জাস্টিস্ সান্যালের মুখের দিকে। এই টি-পার্টিতে এসে দশজন লোকের সামনে এ কীসব কথা বলছেন তি ন! তবু ত জাষ্টিস্ সান্যাল থামেন না: 'তোমরা ছেলে ছোকরার দল, বিলেত ঘুরে এসে কোথায় একটা মানুষের মত মানুষ হবে, দশের দেশের সত্যি উপকার করবে এটাই ত আমরা আশাকরি। কিন্তু তা না-করে অন্যায়ের মাত্রাটাকেই যে রং-চং চাপিয়ে বাড়িয়ে তুলছ হে তোমরা, এটা কি ভাল হচ্ছে বাবা?' সান্যাল সাহেব মুচকে হাসলেন, ঐ হাসিতে তাঁর স্নেহ ঝরে পড়ছে। 'জান তো',—আবার মুখ খুলেন তিনি: 'আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই বড় গরীব, আর এই কারণেই বড় দুর্বল—সামনাসামনি এসে ধনিকদের অন্যায় দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে পারে না বলেই ত আর কেউ অন্ধও নয়, বোকাও নয়।'

সান্যালের কথাগুলো শুনে অপরিসীম লজ্জায় গাঙ্গুলীর মাথাটা যেন নুইয়ে পড়ে মাটির সঙ্গে: 'আমি ভিতরের খবর জানিনে সব। তা আমি এবার নিজে দেখব, জেঠামশাই।' নিতান্ত অপরাধীর মত কথাটা বলেই এক ফাঁকে আবার বুড়োর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে তাঁর সমুখ থেকে সরে পড়লেন ব্যারিস্টার গাঙ্গুলী। ...বাড়ি ফিরে স্ত্রী মাধবীর কাছে ব্যাপারটা খুলে বলতেই মাধবী জানতে চাইল: 'ইনিই ত চিরপ্রভার বাবা, না?'

'এ্যা! কি বললে?' —চমকালেন গাঙ্গুলীসাহেব: 'তোমার বন্ধু মিসেস্ চিরপ্রভা চৌধুরী কি জাস্টিস্ ডি-কে সান্যালের মেয়ে? এতদিন তাহলে কিছু বলনি কেন!' চোখে শর্ষেফুল ফুটল তাঁর। নিশ্চয় কলকাতার বাইরে যাবার পর ওঁর জন্ম, বয়সে হৃষীকেশের অনেক ছোট ত বটেই। বড় ভাবনায় পড়লেন হৃষীকেশ:

'এই মিসেস্ চিরপ্রভাচৌধুরীই ত সেদিনএসেছিলেন গার্লস্ ওন্ একাডেমিতে। শকুন্তলার আপিল-কেসের এন্‌কোয়্যারির জন্য শিক্ষাসংসদ ওঁকে পাঠিয়েছিল। ...শিবানী যে প্রেসিডেন্ট গাঙ্গুলীর কোন স্পষ্ট অনুমতি না নিয়েই সেখানে এক বড় রকমের কেলেংকারি করে বসেছে,—ব্ল্যাঙ্ক পেপারে প্রেসিডেন্টের সই করিয়ে তার উপরেই শিবানী টাইপ করে শকুন্তলাকে চাকরি খতমের নোটিশ্ জারি করে দিয়েছে। এখন এ-সব তদন্তের সময় যখন দু-পক্ষেরই সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্যে শিক্ষাসংসদ থেকে অফিসিয়্যালি নোটিশ্ দেওয়া হল, তখন প্রেসিডেন্ট সাহেব অন্য এক অজুহাত দেখিয়ে গা ঢাকা দিলেন। আর শিবানী? তাঁকে পরামর্শ দিয়ে ত আগেই বাইরে চালান করেছেন তিনি। ...সর্বনাশ! তাহলে এ সমস্তই ইতিমধ্যে জাস্টিস্ সান্যালের কানে পৌঁছে গেছে—এবার উপায়?

'কি ভাবছ, শুনি ?' মাধবী বিচিত্রভঙ্গিমায় হেসে মিঃগাঙ্গুলীকে চিমটি কাটল : "ধ্যান করছ শিবানীর মুরতি—না ? আমাকে লুকোলে কি হবে ? আমি জানি তোমাদের তুজনেরই ক্রিয়াকলাপ—এর মধ্যে নাকি সুললিতাকেও রেখেছ। চিরপ্রভাই আমায় বলেছে সব।'

'কে জানত, মিস্ ত্রিবেদী যে ঝট্পট্ অ্যাপিল্ করে বসবেন ?' গাঙ্গুলী বেশ বেকায়দায় পড়ে নিজের সাফাই গাইবার চেষ্টা করেন : 'মিসেস্ মুখার্জি আমায় বলেছিলেন, স্কুলটিচার্স কোনকালেই খরচপত্রের ভয়ে উপরওয়ালার কাছে অ্যাপিল করতে সাহস পান না। তাছাড়া এ-সব ঝামেলার কাজ, এরমধ্যে লেগে থাকার ধৈর্য, সময়ই বা ওঁদের কোথায় ! কাজেই ন্যায় অন্যায় যে কোন রকমের অর্ডার উপর থেকে পেলে তাঁরা সহজে তা মাথা পেতে মেনে নেন।'

'এখন টের পাচ্ছ ত ?' দাঁতে দাঁত ঘসে মাধবী ঝংকার দেয় : 'যাও না শিবানীর কাছে, লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে শিক্ষাসংসদের অফিসে পাঠাও গে। তোমার ত তুনিয়ার যত সব পাকা চোর জোচ্চোর জালিয়াৎ ছোটলোক মামলা-বাজদের নিয়েই কারবার, এখন ওকেও ঐরকমের একটা কিছু তৈরী করে দিতে পার কিনা দেখ।' তারপর গলার স্বর একটু পালটে : 'তলায় তলায় আবার কতদূর কি করে রেখেছ—কেই বা তা জানে !'

মিঃ গাঙ্গুলী একেবারে চুপ। ভাবেন, সত্যই স্কুলটাকে ভালভাবে গড়তে হবে। তা নৈলে, নিন্দা যে করবে সবাই। দায়িত্ব সম্বন্ধে চৈতন্য হল তাঁর। একান্তে স্ত্রীকে সুধান : 'এ-সব ঝগড়াঝাটির কথা বাদ দিয়ে প্লীজ বল না কী করা যায় এখন ?'

মাধবী শান্ত হয়ে বলে : 'ছাখ, যদি যথার্থই লোকনিন্দার ভয় থাকে, তাহলে ঐ শিবানী মুখার্জিকে তাড়াও স্কুল থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।" এমন স্পষ্টোক্তি শুনে গাঙ্গুলী যেন চুপ্সে গেলেন। তা দেখে হেসে ওঠে মাধবী : 'বুঝতে পেরেছি, শিবানীর কুৎসা শুনতে মন চাইছে না। তবে থাক্ কিছু বলবনা আর।'

'না, না বল শুনি' —গাঙ্গুলী নিরপেক্ষ হবার আগ্রহ দেখান।

'শকুন্তলার কেস্টা তুমি নিজেই টেক্ আপ্ কর না কেন ?'

'তার মানে ?'

'মানে খুবই স্পষ্ট।' মাধবী চোখে নির্মল নির্ভীক হাসি ফোটাল :' শিবানীর জালিয়াতির কাহিনীটা ত তোমাকেই প্রমাণ করতে হবে। এ আর শিক্ষাসংসদের কাছে চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করো না। তদন্তের ফলাফল শুনেছি শিগগিরই জানিয়ে দেওয়া হবে। তারপর আমি বলি, সমস্ত বিষয়টা তোমার নিজের হাতে

নিয়ে এর সত্যিকার রিপোর্ট তুমি লোকসমক্ষে প্রকাশ করে দাও।' একটু ভেবে আরো বলে: 'আচ্ছা, স্কুলে একটা মিটিং কল করলে হয় না—এর ভবিষ্যৎ অ্যাজেণ্ডা সম্পর্কে? অবশ্য পাব্লিক্ মিটিং। তাহলে সকলের মতামতটা ঠিক পাওয়া যায়, তুমিও ঐ সূত্রে ওঁদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবে।'

মাধবীর এই প্রস্তাবটা যেন প্রেসিডেণ্ট গাঙ্গুলীর মনঃপূত হল।

'তবে এ-সব করার আগে শকুন্তলার বিষয়ে খুঁটিনাটি তোমার জেনে নেওয়া দরকার। হ্যাঁ ভালকথা'—মাধবীর হঠাৎ মনে পড়ে যায়: 'ইতিমধ্যে একদিন তোমার কাছে অমিতবাবু এসেছিলেন আমি দেখেছি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বড় রূঢ় ব্যবহার করেছ তুমি! তিনি তোমার স্কুলের টিচার, কাজেই তোমার সাবর্ডিনেট্—এটাই তুমি ভেবেছিলে, না? কিন্তু তাঁর কাল্চার্, তাঁর ভদ্রতার সম্যক পরিচয় নিলে টের পেতে, কেমন বিনাপ্রতিবাদে শুধু নীরবহাসিতে তোমার সমস্ত ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করেছিলেন তিনি।' বলতে বলতে মাধবী মুচকে হাসল: 'আমাদের দেশের টিচারদের তোমরা বড় অবজ্ঞা কর। কিন্তু টিচাররাই ত তোমাদের শিক্ষা দিয়ে তোমাদের জীবন গড়ে দেন—সেটা ভুলে যাও কি করে? ওঁদের চেয়ে নিজেকে বড় ভাব কোন যুক্তিতে?'

গাঙ্গুলী আর বলবেন কি! রীতিমত বেকুব। গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকেন, তাহলে কি একদিন ডেকে পাঠাব অমিতবাবুকে! এমনকরে ভাববারও আরেক কারণ ছিল তাঁর।...আজকেই ত পার্টিতে বসে জাস্টিস্ সান্যাল জিজ্ঞেস করছিলেন: 'তুমি বোধিসত্ত্ববাবুর নাম শুনেছ, হৃষীকেশ?'

বোধিসত্ত্ব লাহিড়ী লোকালয়ের বাইরে আছেন দীর্ঘকাল, যথার্থ একজন শিক্ষাব্রতী তিনি। নাম যশের কোন তোয়াক্কা রাখেন না, তবু বর্তমান শিক্ষা-জগতে কে না শুনেছে ওঁর নাম! তাছাড়া হাইকোর্টের একজন ডাকসেটে ব্যারিষ্টার ছিলেন তিনি প্রথম জীবনে, পসার কি আর তাঁর কম ছিল! কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালেন সহসা, এই লাইনে আর না। সরকারও তাঁকে চেয়েছিল অভিষিক্ত করতে শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টারের পদ দিয়ে। বললেন, একাজ নিলে ত শিক্ষকতা হবে না, আই প্রেফার্ টু বি এ টীচার—স্কুলেই কাজ করব। ব্যস্ এর চেয়ে বড় সম্মান কিছু চাইনে আমি।...বোধিসত্ত্বকে আটকায় কে? চলে গেলেন কলকাতা ছেড়ে—বিহারে। সেই অখ্যাত জায়গায় একটা স্কুলের হেডমাষ্টার; কিন্তু বছর কয়েক পর তাঁর একমাত্র ছেলেকে পাঠালেন কলকাতায় পড়তে।...বাপেরই ত ছেলে! বি, এ, পাশ করল ডিস্‌টিঙ্ক্‌শনে অনায়াসে, কিন্তু টাকা রোজগারে মন দিল না। তবু, মেজাজটা বাপের মতনই—নিঃস্বার্থভাবে খাটতে

জানে, আর ভালবাসে এই শিক্ষা দেবার কাজকে। যা-জানে তা-ই মনপ্রাণ দিয়ে শেখাতে চায়, এতেই তার আনন্দ! আর কোন কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনকি নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও উদাসীন।

'কী তুমি তাকে চেন না, হৃষীকেশ?' বলতে বলতে বিস্মিত হন জাস্টিস্ সান্যাল, প্রশ্ন করেন ফের: 'কেন, তার সাথে আলাপ নেই বুঝি?'

গাঙ্গুলী হতভম্বের মত জবাব খুঁজছেন এ প্রশ্নের।

'আর দেখ, কী না-জানে ছেলেটা!' সান্যালের মুখে প্রশংসা আর থামে না, তিনি শুধু বলেই যান: 'যেমন পড়াশুনায় তেমনি স্পোর্টসেও বেজায় উদ্যোগী। কলেজের পাঠ সেরে চলে গিয়েছিল গোয়ালিয়রে. গান শিখতে ১৯৩৩ সালে। সেখানেই ত তার দেহের সুচারু গঠন ও ছন্দময় পদক্ষেপ, খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী শিব্রাম মেননের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিব্রাম তাকে নাচ শেখাবেন বলে নিয়ে গেলেন দক্ষিণভারতে নিজের দেশে। জন্মাবধি উত্তরভারতীয় সঙ্গীত-চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল সে—এবার নূতন নৃত্যগুরুর কৃপায় দক্ষিণভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেও পেল অন্য প্রেরণা—সঙ্গীতে এবং নৃত্যে। দুটো বিদ্যাই আয়ত্ত করল ভাল রূপে। তারপর, সুযোগসুবিধা পেয়ে দেশে-দেশে এত ঘুরেছে, খ্যাতিও কি আর এইবয়সের ভিতরেই তার জুটেছে কম? তবু আশ্চর্য, এমনতর স্বাধিকারপ্রমত্ত আত্মভ্রষ্টতার দিনে নিজেকে প্রায় নিঃসঙ্গতার নিভৃতিতে সংহরণ করে রেখেছে সে—শুধু শুধু একটা স্কুলটিচার হয়ে বসে আছে চুপটি করে! ···তোমরা অহংকারে এতই মত্ত যে টের পাও না ক্ষমতাটা ওর! সমস্ত শক্তি চেপে রেখেছে নিজের ভিতর। বলে কিনা, 'টু রূল্ দ্যা সেল্‌ফ্ ইজ্ মোর্ ডিফিকাল্ট্ দ্যান্ টু রূল্ দ্যা হোল্ ওয়ার্লড্'।—তার সঙ্গে কথা কয়েছ কখনও হৃষীকেশ? কও নি ত? ক'য়ে দ্যাখো, দ্যাট্ অমিত্ ক্যান্ টীচ্ ইউ এ লট্।'

···'শোনো, একটা কথা বলি।' মাধবী স্বপ্নাচ্ছন্ন গাঙ্গুলীকে যেন ধাক্কা দিল হঠাৎ, তারপর গলার স্বর নরম করল: 'তুমি যদি ঐ অমিতবাবুর সাথে কোনরকমে যোগাযোগ করতে পার তাহলে খুব ভাল হয় কিন্তু। আমার বিশ্বাস, শকুন্তলার ব্যাপারে ওঁর কাছেই একটা সঙ্গত পরামর্শ পাবে। আর মিটিং সম্বন্ধেও দরকার মনে করলে উনিই তোমাকে ভাল সাহায্য করবেন। কিন্তু তাঁর সামনে আইন কিংবা কোন রকমের পলিটিক্স্ খেলাবে না, নিজের ভাগ্যলব্ধ ঠুন্‌কো কর্তৃত্ব আর প্রতিপত্তি বজায় রাখারজন্যেও ব্যস্ত হয়ো না—তোমার কাছে এইটে আমার বিশেষ অনুরোধ।' থামল মাধবী।

গাঙ্গুলীসাহেব নীরবে হাসলেন। জাস্টিস্ সান্যালের প্রমুখাৎ আজ অমিতের

যা পরিচয় পেয়েছেন তা আর মাধবীর কাছে প্রকাশ করতে চাইলেন না। জীবনে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা হল, আমাদের দেশে স্বামীকে সৎবুদ্ধি সৎপরামর্শ ত স্ত্রীরাই দিয়ে থাকেন—এই ভাবনায় তিনি অন্তরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন।

…দুই তিন দিন পরই।

যেমন রোজ বসে তেমনি ভোর বেলা অমিত তার কণ্ঠ-রেওয়াজে বসেছিল।

সেদিন রবিবার। জংবাহাদুর একখানা কার্ড এনে ধরল তার সামনে। একি! এই ভোরবেলায় স্কুলপ্রেসিডেণ্ট মিঃ গাঙ্গুলী যে তার দর্শনপ্রার্থী।…দেরী করল না, এগিয়ে গেল অমিত তক্ষুনি। অভ্যর্থনা করে আনল তার বসবার ঘরে।

গাঙ্গুলী কিন্তু স্ত্রীর নির্দেশ ভোলেন নি। কথাবার্ত্তা বললেন অত্যন্ত সহজ ভাবে;—অমিতের গানও শুনলেন অনেকক্ষণ।…তারপর চা-পর্ব এবং হাসিগল্পের সাথে কাজের কথাও চলল অনেককিছু।

…শিবানী গেছে কাশ্মীর, যজ্ঞেশ্বরবাবুর সঙ্গে নাকি বেড়াতে গেছে। এই খবরের নিশ্চয়তা পুলিশ ছাড়া অন্য কারো জানবার বিষয় নয়।

…যাবার আগেরদিন রাত্রে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল শিবানী, স্কুলের কাজে ত ছুটি পেয়েছে। যাবে এবার কাশ্মীর,—তারপর আরও কত কী সব স্বপ্নবিলাস।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং……

বালিশে মাথা রেখেই রিসিভারটা শিবানী কানের কাছে ধরেছিল।

'অমিতলাহিড়ীর সঙ্গে এখন তোমার গোলমাল করতে যাওয়া নট্ অ্যাট্ অল অ্যাড্ভাইসিব্যল্' —বলছিলেন এর্টনী কালিপদ বটব্যাল। 'কিন্তু' —শিবানী সঙ্গেসঙ্গে প্রতিবাদ জানায়: 'উনি যে রাজসাক্ষী। কোর্টে গিয়ে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে যা-তা বলে আসবেন শেষকালে।' 'যা-তা বলবেন না উনি। যজ্ঞেশ্বরবাবুকে চেনে সবাই, কোর্টও চিনে ভালকরে'—যেন দাঁতে দাঁত খিচিয়ে বলছেন বটব্যাল: 'তিনি দেশপ্রেমিক কিংবা জনপ্রেমিক এমন কেউ একটা নন, বরং যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক মানুষের রক্ত শোষক। ভাল যদি চাও, তুমিও তাঁর সঙ্গ ছাড়।'

'কী? কী বলছেন আপনি!' —রাগে কাঁপতে কাঁপতে খট্‌করে টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে দিয়েছিল শিবানী। নিরুপায় একটা আক্রোশের আগুনে বুকের ভিতরটা তার তখন জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে।…তারপর আপন মনেই বিড়বিড় করে বলেছিল: হুঁ। টাকা খাচ্ছেন যজ্ঞেশ্বরবাবুর, —আবার কিনা তাঁরই বদনাম!

অন্যদিকে বটব্যালও বলছিলেন চন্দ্রাবলীকে শুনিয়ে শুনিয়ে: 'যাক্ মরুকগে। আমার কর্ত্তব্য আমি করলুম।' গায়ে একটা আড়মোড়া দিয়ে সত্যই যেন নিশ্চিন্ত

হলেন তিনি, তাকালেন চন্দ্রাবলীর দিকে : 'এখন শুনলে না আমার কথা এ-বিন্দুবালার কন্যা। তুমিই ত দেখছ গিন্নী, আমি আর কী করতে পারি!' কণ্ঠস্বর তাঁর খুবই ক্লান্ত এবং আবছা মনে হল।

...শিবানী তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল বটব্যালকে।...দেবে না কেন? বটব্যালের সঙ্গে এমন কী-ই বা সম্বন্ধ তার! তিনি ত শুধুমাত্র স্কুলের একজন লীগ্যাল্ আড্ভাইসর্—এই যা। তা আজকাল শিবানী স্কুলের থোড়াই পাত্তা রাখে। যজ্ঞেশ্বরই তার শরণ্য বরেণ্য অগতির গতি।

...বটব্যালের দুঃখ হয়েছিল। তা চেপে রাখতে না-পেরে কখন জানি কোর্টে বন্ধুমহলেও প্রকাশ করে ফেলেছিলেন এ ঘটনাটুকু। আর বস্তুতপক্ষে শিবানীর গতিবিধি ত একা তিনিই জানতেন ভাল করে। সে সংবাদ আবার টুকরো-টুকরো হয়ে ব্যারিষ্টার গাঙ্গুলীর কানে এসেছিল। গাঙ্গুলীর মনোতন্ত্রী যে তখন অন্যস্বরে বাঁধা, তিনি এ-সব কথায় কান দেননি,—দিতেও চাননি।

কিন্তু এবার হৃষীকেশ মহাপঙ্কে নিমজ্জিত। এতদিন উড়ো-উড়ো যা শুনেছেন এখন মাধবীর উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন, এগুলি ভুল নয়। তদুপরি সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে খবর এসেছে, শিবানীর সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরবাবুও যে উধাও। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে, কিছুই ধামাচাপা থাকবে না। এই অবস্থায় নিজের স্ত্রী মাধবী ছাড়া আর তাঁকে পাঁকমুক্ত করবে কে!

আজ এই ভোরবেলায় মিঃ গাঙ্গুলী অমিতের এখানে এসেছেন। একটা সুন্দর সুস্থ পরিবেশের মধ্যে এসে মনটা তাঁর সত্যই নির্মল হাল্‌কা হয়ে উঠল। উপরোক্ত খবরই নিজে যতটুকু জেনেছেন, অমিতকে আদ্যোপান্ত শোনালেন মিঃ গাঙ্গুলী। ...চা খেতে খেতে বলছিলেন, ছুটির নাম করে একসপ্তাহ কাটল, তারপর একমাস তবু ফিরছেন না যে শিবানী। কটুক্তি ছড়াতেই বা কতক্ষণ? ওইসঙ্গে পরামর্শ চাইলেন : 'হেড্‌মিস্ট্রেস্ যদি এমনতর অনিয়মতার মধ্যে চলেন তাহলে ত স্কুল সাফার্ করবেই এবং সেজন্য দায়ী হব আমরা। আমি মিসেস্‌মুখার্জিকে একটা ফরম্যাল্ নোটিশ্ আজকালকের মধ্যেই পাঠিয়ে দিই, কী বলেন আপনি?'

অমিত স্তব্ধ—ঈষৎ বিহ্বল-ও।

॥ ১৪ ॥

শকুন্তলার আপীল্‌কেসের তদন্ত করতে এসে আলিপুর গার্লস্-ওন্-একাডেমির ভিতরকার অনেক তথ্যই জেনে গিয়েছিলেন সেদিন চিরপ্রভা চৌধুরী। রিপোর্ট-খানা সংসদঅফিসে দাখিল করার আগে ওঁর বাবাকে পড়ে শোনালেন একবার।

'ঠিক আছে' —বললেন জাষ্টিস্ সান্যাল, তারপর সহসা : 'থাট্ ইট্ ইজ্ ডেফিনিট্‌লি এ ক্রাইম্! স্বাধীনদেশে একটা সুন্দর প্রতিভাকে বছরের পর বছর লুকিয়ে রাখা হয়েছে নানাকৌশলে! হাউ ইজ্ ছ্যাট্—টাকা দিয়ে সারাক্ষণ একটা স্কুলের মধ্যে আটকে রাখা, এ যে রীতিমত একটা পানিশ্‌মেন্ট্। যে লোক তা স্বেচ্ছায় মেনে নেয়—হি ইজ্ অল্‌সো এ ক্রিমিন্যাল্!' এখানে থেমে একটু ভাবলেন তিনি, যে, টিচার জাতের অদৃষ্টে ত পার্থিব উন্নতির পথ কোনকালেই সুগম হতে পারে না—এটা খণ্ডাবেন কী করে? এই ভাবনাই তাঁকে অস্থির করে তুলল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সারা ঘরময় পায়চারি সুরু করলেন জাষ্টিস্-সান্যাল : 'না, না, চিরপ্রভা, এছেলেটাকে তার বাপের মত আত্মঘাতী হতে দেব না কিছুতেই। আমি রুখব। আমিতলাহিড়ীকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে; আরো অনেক বড় কাজ তার করা দরকার। আমি নিজে এর তদ্‌বির করছি।'

'কিন্তু',—ক্ষীণ প্রতিবাদ তুললেন চিরপ্রভা : 'অমিতবাবু যদি বলেন ছোট ছোট কাজগুলো তাহলে করবে কে? ছোটকে বাদ দিয়ে ত বড়-র সন্ধান মেলে না,—তখন?' এই প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলেন জাস্টিস্ সান্যাল : 'তুই এখনও ভুলিস নি ওকে দেখছি।' তারপর শেষ কথা বললেন :, যাক্, সে আমি দেখব 'খন। ঐ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।'

অন্যদিকে··· ···

সকলে বিস্ময় ভরা আনন্দে চেয়ে দেখছে, আলিপুর গার্লস্ ওন্ একাডেমি কি সত্যিই নূতন একটা রূপ নিয়ে আরো দীপ্যমান হয়ে উঠল! স্ত্রী মাধবীলতার নির্দেশমত প্রেসিডেন্ট গাঙ্গুলী যে যথার্থ উঠে পড়ে লেগেছেন স্কুলের কাজে। দরদীমন নিয়ে সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে তাঁর। তিনি এবার নিঃসংশয়, যে, শুধু বড় বড় গালভরা ডিগ্রী কিংবা ডিপ্লোমাদির বাহ্যিক চক্‌মকি দেখে শিক্ষকদের মনোনয়ন অর্থাৎ যোগ্যতার বিচার কোন কালেই নির্ভুল হতে পারে না। কবি, শিল্পী—এঁদের যেমন গড়ে পিটে তৈরি করা যায় না, করতে গেলে যান্ত্রিক একটা কিছু হয়ে ওঠে, তেমনি শিক্ষকদেরও মন্ত্র পড়িয়ে পড়িয়ে কেবল গলায় ডিগ্রীমাল্য ঝুলিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টাটা বিড়ম্বনা বৈকি! শিক্ষক হবার যোগ্যতা শুধু তাঁরাই দাবী করতে পারেন—যাঁরা অন্তরে-বাহিরে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অ-সাধারণ হতেই হবে যে করে হোক; নয়তো শ্রদ্ধার যোগ্য হবেন কোন্ পুঁজি নিয়ে ওঁরা? বড় কঠিন, বড় দুর্গম এ-পথ। এ-কাজের সঙ্গে ডিগ্রীর সম্বন্ধটা গৌণ নয় কি? ডিগ্রী

না পেয়েও একজন ভাল আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন, আবার প্রচুর ডিগ্রী পেয়েও শিক্ষকতার কাজে ব্যর্থ হয়েছেন তেমন দৃষ্টান্ত ত বিরল নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন: আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগীলোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার হয়েছে। যতদিন ত্যাগীরা বিদ্যাদান করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল। এর পরেও তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছেন আমাদের এই বলে, ভারত চিরকাল মাথায় জুতো বইবে, যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শেখাবার ভার না পড়ে। ···ইত্যাকার উক্তি প্রেসিডেণ্টকে ভাবিয়ে তোলে খুব। মোটের উপর, নিছক পার্থিব উন্নতির আর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ বিলাসের কামনা যাঁরা করেন, বস্তুত শিক্ষকতার কাজে তাঁদের সার্থকতা নৈব নৈব চ—একথা ক্রমশ তিনি বুঝতে পারছেন নূতনের সংস্পর্শে এসে। আজকাল তাই কথায়-কথায় ভারতের প্রাচীন বিদ্যাশ্রমের মুনি ঋষিদের কার্যাবলীর নজির টানেন পশ্চিমে উচ্চশিক্ষিত নব্যযুবক মিঃ এইচ-কে-গাঙ্গুলী, বার-অ্যাট্-ল। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও একাধিক সুযোগ্য উক্তি স্মরণ করে তিনি আরো বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন, সিদ্ধান্ত নেন: সেই পদ্ধতি সেই আদর্শ নিয়েই স্কুলকে ঢেলে নূতন যুগোপযোগী করে গড়বেন তিনি। কেন পারবেন না? চেষ্টায় আর একাগ্রতায় কী না হয়? তাছাড়া তাঁর সহযোগিতা করবেন সকল শিক্ষক-শিক্ষিকরাই এবং আমাদের দেশও ত এখন আর পরাধীন নয়; ঈশ্বরও তাঁকে যখন এই উপলক্ষে কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছেন সামনে, তখন, নিজের আর্থিকসঙ্গতিই বা এই সৎকাজে লাগাবেন না কেন—এসব অনেককিছু চিন্তা করলেন মিঃ গাঙ্গুলী। এবং এরই ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতমকর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ হল তাঁর।

একদিন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিমন্ত্রণ করলেন তিনি তাঁর বাড়িতে। দীর্ঘ আলোচনা হল নানা বিষয় নিয়ে। সেখানে মিঃ গাঙ্গুলী প্রস্তাব তুলেছেন, জাতীয় সংস্কৃতির পরিবাহক হিসাবে অমিতলাহিড়ীকে বর্হিভারতে পাঠাবার পরিকল্পনা আছে তাঁর। অমিতের সম্মতি পেলে এই মর্মে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান। এই প্রস্তাব শুনে শিক্ষকশিক্ষিকারা সবাই খুশি। কিন্তু অমিত বুঝিয়েছে, একটানা অনেক বছর স্কুলে কাজ করে করে যে একটা হ্যাবিট্ গড়ে উঠেছে তার, সেটাকে দমন করার জন্য একটা কাউণ্টার হ্যাবিট্ তাকে সৃষ্টি করতে হবে এবং সেটা কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ। মোট কথা কোন ফাইন্যাল্ জবাব দেয়নি সে।

আসলে অমিত মনে মনে শিবানীর প্রত্যাশা করছে। তার বিবেকের ভিতর প্রতিক্ষণেই অনুরণিত হচ্ছে: কারুর কাছে উপকার পেলে তাঁকে কখনো ভুলতে

নেই। উপকারের ঋণ যে শোধ হয় না কোনকালে—তা যতই সামান্য হোক না কেন। ঋণ শোধ করতে পার বা না-পার, যিনি উপকার করেছেন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে চিরদিন।... এই ভাবনার ভারেই অমিত বেশ একটু বিমনা। ইদানীং প্রায় মাস তিন হতে চলল, শিবানীর কোন সংবাদ নেই বলে তাঁর বিরুদ্ধে মুখেমুখে যে অশোভন মন্তব্য ছড়িয়ে পড়েছে এটা অমিত সহ্য করতে পারছে না। অথচ গুজব রোখবে কে? ...এই ত আজ টিফিন্ আওয়ারে অশোকা মজুমদারকে মধ্যমণি করে স্কুলের কমন্রুমে বসে যখন সকলের বিশ্রান্তালাপ চলছিল তখন টিচার রবি মল্লিক, শশাংক সেন এঁরা ত সবাসরিই বললেন: 'সব কি আর স্রেফ্ গুজব, অমিতবাবু? এতে সত্যও আছে অনেকটা। দুর্গন্ধের উপর কত আর আতর ছড়াবেন আপনি?' সঙ্গে সঙ্গে একে জোরালো করে তোলেন অবনী ঘোষাল: 'সত্যি অমিতবাবু আপনি আর শিবানীদির নোংরা ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না যেন আমাদের বিশেষ অনুরোধ।' শিক্ষিকাসম্প্রদায় এই সুযোগে সুমধুর কণ্ঠে বনিতা স্মরণ করিয়ে দেন প্রেসিডেণ্ট গাঙ্গুলীর প্রস্তাবটা, বলেন: 'শিবানীদির মায়া ছিন্ন করুন, অমিতবাবু। এবার ফরিনে যাবার জন্যে তৈরি হোন ত শিগগির।'

'আপনাকে দেখে প্রথমেই বলেছিলুম, মনে পড়ে?'—বৃদ্ধ দীননাথবাবুর দন্ত-বিহীন মুখ সগর্বে হাস্যোজ্জ্বল হয়, বলেন: 'স্কুলমাস্টারি করা এ-সব কী আর আপনার কাজ মশাই। নাঃ এখন আপনি কোন ছুঁতো দেখিয়ে কিছুতেই আপত্তি করতে পারবেন না।' দীননাথ উঠে দাঁড়িয়ে অমিতকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন: 'আপনার যোগ্যকাজে আপনি যাবেন সেটাই যে আমরা সকলে চাই, অমিতবাবু।' দীননাথের এই উক্তির সঙ্গে উপস্থিত সকলে ঐ একই দাবী উত্থাপন করলেন এখানে সোল্লাসে।

'কিন্তু আমার বড় আশা ছিল দীননাথদা',—অমিত সখেদে বলে: 'আপনাদের সবাইকে নিয়ে একসাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব সবার সামনে। তাই কত লাঞ্ছনা কত গঞ্জনা সয়ে এ স্কুল আঁকড়ে ধরেছিলুম, আপনি ত জানেন সব। এখন যদি আমি দূরে চলে যাই—তাহলে?'

'জানি ভাই, সেজন্যই ত আজ এই পুরস্কার আপনার।' চশমার কাচের পেছনে দীননাথের দুই চোখ ঝলমলিয়ে ওঠে: 'আমাদের জন্য আপনি যথেষ্ট করেছেন অমিতবাবু। একটা কত বড় গোপন অন্যায়ের প্রতিরোধ করলেন, টিচাররা কজন তা ভাবতে পারেন, বলুন দেখি?' উচ্ছ্বাস চাপা থাকে না দীননাথের: 'সত্যিকথা বলব? আমরা টীচার্স সবাই হয়েছি তমোগুণের উপাসক;

মুখে শুধু সুন্দর সুন্দর বুলি আওড়াই যে, আমরা বড় শান্তিপ্রিয়। কিন্তু অন্তরে সারাক্ষণ অশান্তির আগুন জ্বলে—সবল হতে না পারার অশান্তি।'

এই নিরাভরণ মন্তব্য শুনে উপস্থিত টিচারদের মাথা ঈষৎ নত হল।

দীননাথ মুখটিপে হাসলেন: 'আমি বুড়োমানুষ। কথাগুলো আমার তেতো লাগছে হয়ত। তবু বলব, আমরা বড়ই দুর্বল। আসলকথা, এই প্রোফেশনের ভিতর অর্থাগমের পথ সুগম স্বচ্ছল নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এত সীমিত যে সামান্য সংসার নির্বাহের কাজটাও অনেকের জীবনে দুঃসহ হয়ে ওঠে, এরদ্বারা চরিত্রে রজঃগুণ স্ফুরণের মুক্ত অবকাশ জোটে না, অথচ সংসারে থেকে সংগ্রাম করতে হলে রজোগুণের বাধ্যসেবক না-হয়ে উপায়ই বা কি? আবার অন্যদিকে সুষ্ঠুসাত্ত্বিক জীবনযাপনেরও কোন শিক্ষা নেই, কোন ধারণা নেই অনেকের। কাজেই এমনতর অবস্থায় বিপাকে পড়ে নিজেদের অজান্তেই আমরা আমাদের স্বভাবকে অনেকসময় লোকচক্ষে বড় নির্জীব ক্লীব করে তুলি। অবচেতন চিত্তে কি আর নিজেরাই স্বীকার করিনে যে, আমরা টিচার্স—সমাজে অনাদৃত অপাংক্তেয়? তাইজন্য ভাগ্যচক্রে কোন চাকরি পেয়ে গেলে কৃতার্থ হয়ে যাই এবং তাকে, নিজের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়েও বাঁচিয়ে রাখার ফিকির খুঁজি সব সময়। অর্থাৎ, কে যে কোন্ কাজের উদ্দেশে নিয়োজিত তা ভুলে গিয়ে তোষামোদ করি উপরওয়ালাদের, তার ফলে ·কর্তব্যবোধ পদমর্যাদাবোধ যে কখন মন থেকে লোপ পেয়ে বসে তা টেরও পাইনে। বোধহয় তখন তথাকথিত অশিক্ষিতদের চেয়েও বেশি স্বার্থান্ধ হয়ে পড়ি আমরা এবং এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করেন উপরওয়ালারা।'

এরপর শিক্ষকশিক্ষিকা অনেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা জানাতে উৎসাহিত হতে থাকলেন, অবশ্য এর বহুলাংশ শিবানীকেই কেন্দ্র করে।

অমিত এ-সব আলাপে তেমন যোগ দিতে পারছিল না, তার মন তখন চলে গেছে অনেক পেছনে:

কবে জানি এক দুপুরবেলা লখনৌ হোটেলের ছোট্ট রুমটিতে বসে অলসমনে খবরের কাগজ পড়ছিল অমিত, তখনই ত একটি মেয়ে এসেছিল তার কাছে সাহায্যপ্রার্থিনী হয়ে। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী, উর্দু সব ভাষাতেই পারে সে কথা বলতে নির্ভুল আর অনর্গল। বলেও যাচ্ছিল, নিজের বেদনাদীর্ণ ভাগ্যের করুণ ইতিহাস। অমিত খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে একান্ত বিশ্বাসে শুনছিল সব। মেয়েটি যথার্থই সুমনোহারিণী ছন্দময়ী, তার সর্বাঙ্গ নবলাবণ্যে প্রস্ফুটিত; এরই পিছনে কামনার স্নিগ্ধবহ্নি সুসংযত ভঙ্গিমায় বিকীর্ণ হচ্ছিল। এখানে ত অমিত চোখ বুঁজে থাকতে পারে না, বিশেষতঃ কক্ষের জনশূন্য পরিস্থিতি যখন তাকে

আরো হাতছানি দিচ্ছিল কোন রহস্যময় নিবিড়ইঙ্গিতে। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ছিল অমিতের : ···সেই যে পুরাকালে পৃথিবীতে মহাভিষ নামে কোন এক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা যাগযজ্ঞাদি প্রচুর সৎকাজ করেছিলেন বলে স্বর্গে যাবার পাসপোর্ট পান। স্বর্গে যেয়ে দেবগণের সাথে একদিন ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন তিনি। তখন নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। 'সহসা বায়ুর প্রবাহে গঙ্গার সূক্ষ্মবসন অপসৃত হল।' দেবগণ অধোমুখ হয়ে রইলেন, কারণ এটা যে দেবধর্ম—তাঁদেরই একচেটে স্বভাব। কিন্তু মহাভিষের দেবধর্মের তেমন কোন বালাই ছিল না হয়ত; কেননা দীর্ঘকাল মানবজীবন ভোগ করার পর মানবধর্মে সম্মানিত-স্নাতক হিসাবেই ত তিনি হালে স্বর্গে এসে পৌছেছেন। তাই পূর্বস্বভাবের তাড়নায় মহাভিষ ক্ষুধার্থ নয়নে গঙ্গাকে দেখতে লাগলেন অসংকোচ। তা লক্ষ্য করে ব্রহ্মা শাপ দিলেন : তোমার ত হে দেখছি মানুষের স্বভাবটা যায়নি এখনও! তোমাকে বাপু এই স্বর্গ ছেড়ে কিছুকালের জন্য ফের গিয়ে জন্মাতে হবে মর্ত্যলোকে অর্থাৎ—সেখানে গিয়ে মনের শখটা আবার মিটিয়ে এসো,—এই বললেন ব্রহ্মা। মহাভিষ অগত্যা স্বর্গ ছেড়ে ভারতভূমিতে এসে মহাতেজস্বী প্রতীপ রাজার পুত্র হয়ে জন্মালেন। এই পুত্রেরই নাম হল 'শান্তনু',—যে শান্তনু পরবর্তীকালে গঙ্গাকেও লাভ করলেন স্ত্রীরূপে। তৃপ্ত হল তাঁর মানবজন্ম, সুখী হলেন তিনি। তবু আবার এই সুখ থেকেই অন্যদিকে ভোগযাতনাও কি আর তাঁর অদৃষ্টে এসে কম জুটেছিল? সে পুণ্যকাহিনী কার বা অজানা! ···এমনধারা কত ক্ষুদ্র ব্যাপার থেকেই না আমাদের বিরাট মহাভারতের কাহিনীগুলির অবতারণ—তা অন্য সবার মতন অমিতও জানত। বরং তার জানা, অনুভূতি ছিল সুগভীর—বলত সে মাঝে মাঝে কথাপ্রসঙ্গে, কোন গল্প বা উপকথা কোন কাহিনীকারেরই মনে আচম্বিতে এসে জন্মায় না তার মধ্যে যদি বাস্তব ক্রিয়া কারণ লুকিয়ে থাকে কিছু না কিছু! ···অমিতের ভয় হল, তার মনেও কি কোন শখের ক্ষুধা জেগে নাকি? সেও কি তাহলে এই আধুনিকযুগে নিজের অজ্ঞাতে মহাভিষের অনুরূপ কোন অভিশাপ কুড়চ্ছে—তা কে বলতে পারে? নিজের ভিতরে একটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকলেও সে বুঝতে পারল, যে, এই আগতা সাহায্যপ্রার্থিনীকে তাড়াতাড়ি বিদায় করলেই স্বস্তি ফিরে আসবে তার। তাই মেয়েটিকে বেশ একটা বড় অঙ্কের চেক্ কেটে দিয়ে সাহায্য করতে যখন অমিত প্রস্তুত হচ্ছিল, ঠিক তক্ষুনি তার ঘরে এসে ঢুকলেন ডাঃ ভিয়াস্, অমিতেরই লখনৌবাসী পুরনো বন্ধু এবং তাঁর পিছনে এক ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলাটির আবির্ভাব অমিতের মনের ভিতরের তাৎক্ষণিক আবেষ্টনীর এক অপূর্ব বৈপরীত্য রচনা করলে। অমিত

অত্যন্ত সুস্থির প্রীত হয়ে তন্নিষ্ঠনয়নে দেখতে লাগল তাঁকে—কী অনির্বচনীয় গাম্ভীর্যে আর মাধুর্যে পরিপূর্ণ এই মূর্তি, ভঙ্গিটিও তাঁর তেমনি প্রশান্ত সসম্মান প্রীতি আকর্ষক। তিনিও কোন প্রকারের ইনট্রডাকশন্ কিংবা ফর্ম্যালিটির অপেক্ষা না রেখে নিজে থেকেই বলতে থাকলেন: ইফ্ ইউ ডোণ্ট্ মাইণ্ড্ মিষ্টার লাহিড়ী, আপ্নাকে জিজ্ঞেস করি এই মেয়েটিকে কি আপনি চেনেন?

কিন্তু কোথায় সেই মেয়ে? সে ত এরই মধ্যে সবাইকে বোকা বানিয়ে কোন্ ফাঁকে ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে!! হোটেলের লোকজনদের ভিতর জোর ডাকাডাকি ছোটাছুটি চলল খানিকক্ষণ—ব্যর্থ হল সব।···এবার ডাঃ ভিয়াসের মুখ থেকে অমিত জানল: এই মেয়ে দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, এককথায় সূক্ষ্ম ছলাকলায় বিশারদ। তার কাছে লখনৌশহরেই প্রতারিত গণ্যমান্য বিশিষ্টদের নাম ডাঃ ভিয়াস্ উল্লেখ করলেন একে একে—তাঁদের কারুকে কারুকে চেনে অমিতও। মেয়েটি যে কোথাকার, কেউ পারে না বলতে। হঠাৎ উল্কার মত মাঝেসাঝে শহরে এসে হাজির হয়, সবার চোখে ধূলো দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন পোষাকে। আজ এসেছিল কী সুন্দর নিখুঁত বাঙ্গালী মেয়ের সাজ নিয়ে। এমনতর এক জাঁদরেল বহুরূপিনীর হাত থেকে অমিতকে এ-যাত্রায় যিনি উপযাচিকা হয়ে রক্ষা করলেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে-দিতে ডাঃ ভিয়াস্ সহাসে বলছিলেন: 'ওয়েল্ অমিতবাবু, ইউ অট্ টু বী গ্রেট্ফুল্ টু দিস্ অনার্যাবল্ লেডি মিসেস শিবানী মুখার্জি হু হ্যাজ সেভ্ড্ দ্যা সিচিউয়েশন্।' —হ্যাঁ অমিত জানিয়েছিল তার কৃতজ্ঞতা সঙ্গে সঙ্গেই এবং শিবানীও হিতৈষিনী হিসাবে বলেছিল অনেক কথা। কারণ বস্তুতপক্ষে শিবানীই ত লক্ষ্য রাখছিল অমিতের ঘরের দিকে এবং তৎপর হয়ে সেখানে ডাঃ ভিয়াস্কে খুঁজে ডেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, আর ভিয়াস্ যে অমিতের বিশেষ বন্ধু সেটা নিশ্চিতরূপে সে জেনেছিল আগেই। অথচ লজ্জার বিষয়, অমিত জানত না লক্ষ্যও করেনি কখনও, যে, তারই ঐ একই হোটেলের উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে থাকত শিবানী। ···ঐ ত শিবানীর সঙ্গে অমিতের প্রথম আলাপ প্রথম পরিচয় কী এক উদ্ভট পরিস্থিতিতে ডাঃ ভিয়াসের মাধ্যমে। সন্দেহ নেই, সেদিনের অমিতের বয়স ও অভিজ্ঞতা আজকের দিনের অমিতের চেয়ে কম ত ছিল নিশ্চয়ই; যদিও অনেকে জানতেন ভারতের বহু শহর সে ইতিপূর্বে দেখেছে, মিশেছে বিভিন্ন জনের সঙ্গে প্রচুর, তবু লখনৌ-এর এই এক অদ্ভুত মিস্টীরিয়াস্-পজিশনে তাকে সাবধান করে দিয়ে যে শিবানীই তার বিশেষ উপকার করেছিল—এটাও ত তেমনি ঠিক। তা নইলে, কোন গহনগহ্বরে যে তার পা পড়েছিল, কোন দুর্গতির দিকে তার ভাগ্য মোড় নিত—এসব বেশরমের কথা ভাবতে বসলে

অমিতের মনটা কী-রকমের যেন হয়ে যায়। এই ঘটনা ১৯৪১ কি ৪২ সালের। তৎকালীন বৃটিশ ইণ্ডিয়ার বাইরে চলছে লড়াই, সেইহেতু বোমা এসে কখন-সখন ভিতরে পড়ছে, কি পড়বে ঐ ভয়ে বড়-বড় শহরবাসীরা শহর খালি করে পালাচ্ছিলেন। শিবানীও তখন তাই লখনৌ চলে গিয়েছিল কলকাতা ছেড়ে। আর আজকাল ত ইণ্ডিয়া স্বাধীন,—এর ভিতর শিবানী নিত্যনূতন মোহের ঘোরে অন্য জগতে বিচরণ করছে নবলব্ধ মুক্তছন্দে, পুরনোকথা সব সহজে ভুলে যেতে পারছে বলেই হয়ত; —কিন্তু অমিত তা ভুলবে কেন?

আজ যখন আলিপুর গার্লস্ ওন্ একাডেমীর শিক্ষকশিক্ষিকারা শিবানীর অপযশ প্রচারে পঞ্চমুখ তখন তাঁদের মধ্যে বসে অমিত সকৃতজ্ঞভাবে স্মরণ করছিল শিবানীর সঙ্গে তার সেই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তটা। কিন্তু এঁদের কাছে কি তা বলা যায়, শুনলে এনিয়ে তাঁদের মধ্যে অযথা হাসিঠাট্টা হবে। তাছাড়া শিবানীর সাম্প্রতিক ব্যবহারে যে এঁরা ব্যক্তিগতভাবে যথার্থ-ই উৎপীড়িত, বিপর্যস্ত—অমিত ত তা জানে। কাজেই নীরবে একান্তচিত্তে শুধু সে কামনা করছিল, এই দুঃসময়ে শিবানীর সুমতি হোক। সেই অনুভব নিয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে সে হঠাৎ বলে ফেলল: 'আপনারা কিন্তু একেবারে ভুলে যাচ্ছেন, আজ যে এ-সব কাজের আয়োজন, সেটা সুরু করার জন্যে আমাকেই বা এখানে এই স্কুলে টেনে এনেছিলেন কে—ভাবুন দিকিনি।'

'বাদ দিয়ে রাখুন ও-সব সেন্টিমেণ্ট।' স্বেচ্ছায় মধ্যস্থ না হয়ে আর থাকতে পারলেন না অশোকা, বললেন বেশ ঝাঁঝালো স্বরেই: 'শিবানী মুখার্জি আপনাকে এখানে এনেছিলেন, একথাই ত আমাদের বোঝাতে চান আপনি—না? হুঁম্! আপনাকে এখানে টেনে আনার ব্যাপারে স্কুলের স্বার্থের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থই যে ছিল অনেক বেশি, তাও কি খুলে বলার দরকার আছে অমিতবাবু? আপনি হয়ত গায়ে মাখেন না, কিংবা এ নিয়ে আলোচনাও করতে চাইবেন না; কিন্তু আমরা ত জানি, স্কুলের এই ক্রমবর্ধমান রূপসৃষ্টির পিছনে আপনার অবদানই যে বারো আনা। আপনি না এলে গানের বিভাগ, নাচের বিভাগের নাম করে পৃথকভাবে এত ছাত্রীর কাছ থেকে বেতন সংগ্রহের সুযোগ শিবানীদি পেতেন না কিছুতেই। হাঁ, স্বয়ং শিবানীদিই বলব—এসবের কলেক্টর্। কারণ এই একস্ট্র্যা কলেক্শন্ অভ্ ফীস্, এখন দেখতে পাচ্ছি, স্কুলের অ্যাকাউণ্টে এণ্ট্রি করা হয় না, হতও না কখনো। তাহলে এ-সব গেল কোথায়?' এখানে অশোকা স্বভাবত রুষ্ট হলেন, জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনাকে এ-সবের কোন হিসাব দেখানো হয়েছে আজ অবধি কিংবা আপনি তা দেখতে চেয়েছেন

কোন কালে ?' একটু থেমে ঠাণ্ডাগলায় আবার বলেন : 'এই সকল কথাবার্তা আপনার কাছে শোভনতা বিরুদ্ধ হতে পারে—আপনি শিল্পী। কিন্তু এটাও যে জগতের এক বাস্তবরূপ অমিতবাবু, তাকে কি আর মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় ? আরেকটা কথা আজ সকলের সামনেই বলছি,—অনেককাল আগে নাচ-গান শিক্ষা সম্বন্ধীয় একখানা চটি বই শিবানী মুখার্জি ছাপিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করেছিলেন, শুনেছিলাম লেখাটা নাকি আপনার। কিন্তু বইয়ের ভিতরে একথার কোন উল্লেখ নেই ! এখন শিবানীদিকে বাঁচাতে গিয়ে তর্কের খাতিরেও যদি আপনি বলেন যে এটা আপনার রিজেক্টেড্ লেখা, এর কোনপ্রকারের স্বত্ব আপনি দাবী করেন না—তাহলে কি ঐ রিজেক্টেড্ লেখাটা অম্নি-অম্নি শিবানী মুখার্জির লেখা হয়ে গেল ? উহুঁ, তা কোনকালে কোন যুক্তিতেই হতে পারে না। ঐ লেখা অমিত লাহিড়ীরই থাকবে—তাঁর বর্তমানে কি অবর্তমানে সব সময়েই। তবে শিবানীদি এইটুকুমাত্র বলতে পারেন, লেখাটা তিনি তাঁর দায়িত্বে ছাপিয়েছেন কোন-না-কোন কারণে মূল লেখকের নাম অনুল্লেখেই। ছাপানো বইর মধ্যে এই সত্যঘটনার উল্লেখ রাখা উচিত ছিল। কিন্তু শিবানী মুখার্জি সেটা করেন নি,—তিনি অন্য পথে চলেছেন অন্য মোটিভ্ নিয়ে। বলুন, তাঁর ইত্যাকার কাজকেও কি চোখ বুঁজে প্রশংসা করতে হবে আমাদের ? তার উপর ঐ ছোট্ট বইটির চাহিদা যে কত বেশি, তা বাজার যাচাই করলে যে কেউ জানতে পারে। অথচ আপনি এ-সবের কোন খবর রাখেন ? নিশ্চয় রাখেন না। কাজেই দেখুন ত অমিতবাবু, আপনাকে ভাঙ্গিয়ে যশ, অর্থ, মান—কী যে না পেয়েছেন তিনি !!'

এ-সমস্তই ধরা পড়ল এবারকার তদন্তে।···মিসেস্ চিরপ্রভাচৌধুরী সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। বাধ্য হয়ে সামনে উপস্থিত থেকে ঐকাজে তাঁকে সাহায্য করতে হয়েছিল স্কুলের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ হেড্ মিস্ট্রেস্ স্বল্পভাষিনী অশোকা মজুমদারকেই। এই সূত্রে বহু অজানা তথ্য জেনেছেন অশোকা। এখন তাঁর কাছ থেকে জানলেন অন্যরা।

···শকুন্তলার আপীল কেসের রায় বেরিয়েছে : তাঁকে পুনর্বহাল করে এই স্কুলে স্থায়ীভাবে রাখার আদেশ এসেছে উপর থেকে। ঐ সঙ্গে শিবানী মুখার্জিকে একমাসের মিয়াদ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে মিস্ত্রিবেদীর প্রতি দুর্ব্যবহারের ন্যায্য কৈফিয়ৎও তলব করেছেন ওঁরা। অন্যথায়, শিক্ষাবিভাগ থেকে শিবানীকে চিরতরে অপসারিত হতে হবে।

এই আদেশ-লিপির টু কপি পেয়েই অমিতকে এনে দেখাল শকুন্তলা, বললে : 'শুনতে পাচ্ছি, শিবানীদি নাকি লেটার্ অব্ রেজিগ্‌নেশন্ পাঠিয়েছেন !'

'এমনটি যে ঘটবে তার আভাস ত আগেই পেয়েছিলাম'—অমিত আহতকণ্ঠে তার অভিমত জানায় : 'যেমন কাজ করেছেন তেমন ফল কি পাবেন না ? কতবার কত অনুনয়বিনয় করেছি তাঁকে, আপনি যে-পথ ধরেছেন সে-পথ ত আপনার নয় শিবানীদি। আমার কথাকে তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। স্বীকার করি বটে, ভার্স্যাটাইল্ ট্যালেণ্ট্-এর অধিকারী তিনি, তাঁর কাজের মধ্যে একাধিক গুণের অপূর্ব সমাবেশ দেখে আমিই যে ঝুঁকেছিলাম বেশি—হয়ত ভাল অনেক কিছু করা যেত তাঁর সাহচর্যে, কিন্তু'—বলেই অমিত এখানে হঠাৎ থেমে গেল, ভাবতে থাকল : না কি তার কাছে সমস্তটাই এক অন্তহীন হ্যালিউসিনেশন্ !

ক্ষণেক নীরবতার পর অমিত আবার কথা তুলে : 'জানো শকুন্তলা, যে রকমের কাজ তুমি করবে—ঠিক সেই রকমের ফল তোমাকে পেতেই হবে। মোট-কথা কর্মফল অ্যাভয়ড্ করা যায় না, কেউ পারে না করতে। তবে ভুল কাজের জন্য যদি অনুতাপ আসে তাহলে চেষ্টা থাকলে ঐ কাজের ফল মিনিমাইজ্ করা যায়। আর সেজন্যেই আমাদের প্রত্যেকের প্রতি মহাপুরুষদের নির্দেশ আছে, সৎচিন্তা সৎসঙ্গ করবার। আরেকটা কথা প্রসঙ্গত তোমায় জানিয়ে রাখি,'—বলতে গিয়ে অমিতের মনে পড়ে :

দিবাকরবাবু তাঁর মেয়ে অদিতিকে নিয়ে যেদিন বেনারস যাচ্ছিলেন সেদিন রাত্রেই ত স্কুল থেকে রিক্সা করে শিবানী নিজের বাড়িতে নিয়ে এল অমিতকে। অমিত অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। প্রথমদিকে কিছু তেমন হয়নি, কিন্তু শেষরাত্রে সে মাথার যন্ত্রণায় বড় বেশি ছটফট করতে থাকে। তখন শিবানী এসে যে সারাক্ষণ শুধু তার পাশে বসেছিল তা নয়—ঐ রাত্রির অসময়ে নিজেই হাতে করে স্নানের ঘর থেকে বালতি, জল, তোয়ালে এ-সব বিছানার পাশে টেনে নিয়ে এসে অমিতের মাথা সযত্নে ধুয়ে দিতে দিতে তাকে ধীরে ধীরে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ করে তোলে। অমিতও ঐ নির্ভেজাল শুশ্রূষায় আরাম পেয়ে আবার চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গল যখন, তখন রীতিমত রোদ ছড়িয়ে পড়েছে আগের দিনের বৃষ্টি ভেজা সমস্ত শহরের গায়ে।

চায়ের টেবিলে বসে শিবানী জিজ্ঞেস করে : 'কেমন ফীল্ করছেন এখন, মাষ্টারমশাই, ভালো ত ?'

'সত্যি শিবানীদি'—বলে অমিত সলাজে তার কৃতজ্ঞতা জানায় : 'কাল রাত্রে আপনি যা করেছেন এ-ঋণ কিন্তু অপরিশোধ্য।' 'বাজে বকবেন না ত'—শিবানী চোখ দুটো বড় করে ধমকে দেয় অমিতকে, বলে : 'ছেলেমানুষ আপনি, এসব বুঝবেন কি করে ? এ-কাজেই যে মেয়েদের কত সুখ ! হ্যাঁ শুনুন, ভোরবেলা

জংবাহাদুর এসেছিল আপনার খোঁজে। আচ্ছা তৈরী করেছেন ত চাকরটাকে—সে মনিবকে না নিয়ে যাবে না! আমি তাকে বলে ফেরৎ পাঠিয়েছি—আপনি দুপুরে এখানে খেয়ে বিশ্রাম করে তারপর বাড়ি যাবেন, স্কুলে আর যেতে হবে না আজকে।' এই বিশ্রামটাই অমিত চাইছিল, তাই কোন আপত্তি করল না এ-নিয়ে।···তারপর চা খেতে খেতে উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক গল্পগুজব চলল অনেকক্ষণ।···সেই সময়েই অমিত বলছিল: 'আমি প্রায়ই দেখি, সুখী হবার আর্টটা যেন মেয়েরাই জানে বেশি। বোধকরি এটা তাদের জন্মসূত্রে লব্ধ একটা বিশেষ গুণ, কী বলেন শিবানীদি—অন্তত আমাদের দেশের মেয়েদের। তারা নিজের চাইতে অন্যকে সুখী করবার ভাবনা নিয়ে সময় কাটায় অনেকটা, আর তাইতে ক্রমশঃ সুখীও হয়ে ওঠে; পারেও কিন্তু ঐ মূলধন নিয়ে খুব ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ বৃহৎ ঘর সংসার বেঁধে তুলতে।'

'কিন্তু এমনতর আদর্শ কি দিন-কে-দিন আমাদের মধ্যে পাল্টে যাচ্ছে না অমিতবাবু, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে?' শিবানীর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অমিত কোন উৎসাহ দেখায় নি। তাই শিবানী ফের প্রশ্ন তুলেছিল: 'আচ্ছা সে-দেশের চালচলনের আদর্শটা কি ভাল না খারাপ মনে হয় আপনার কাছে?' অমিত হেসে উঠেছিল: 'সে-দেশের কতটুকুই বা জানি কিংবা দেখেছি বলুন ত? তবে তাদের চালচলন যে তাদেরই সমাজের উপযোগী এটা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি মানি; কিন্তু একে নকল করার আগে জানতে হবে, আমাদের গঠিত সমাজের রূপটাও কি ঠিক তা-ই! আমাদের দেশের মেয়েরা জানে, সংসারে একা সুখী হওয়া যায় না এবং এ-শিক্ষা নিয়েই বাল্যাবধি এদের মন গড়ে ওঠে—এটাই ত চোখের সামনে দেখে আসছি বরাবর।'

'কিন্তু, তা তো যথোচিত সমর্থন পাচ্ছে না এ যুগে। এতেও যে জায়গায় জায়গায় বেশ ফাটল ধরেছে—ঠিক নয় কি?' শিবানীর এই মন্তব্যে অমিত ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিল: 'তাই যদি হয়, এটা আমাদের পরমদুর্ভাগ্য শিবানীদি; —এছাড়া এবিষয়ে আমার বলার কিছু নেই।'

'কেন—কেন, জানতে পারি কি?' কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল শিবানী।

'দেখুন শিবানীদি' —অমিত ধীরে ধীরে জবাব দেয়: 'আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোট, তাই এ-সব নিয়ে খোলাখুলি আলোচনায় কিছুটা অনভ্যস্ত বৈকি! তবু আপনার অনুমতি আর অভয় পেয়েই এখানে বলছি, আমার মনের ধারণা, পাশ্চাত্যদেশের মেয়েরা যেন শুধু নিজেদেরই সুখী করার জন্য দিনরাত ব্যস্ত—এই ব্যস্ততার মধ্যে তাদের কোন লজ্জা, সংকোচ, আবরণ নেই—এটা তাঁদের গা-সহা।

শুনেছি, ঐ কারণে অর্থাৎ নিজেদের সুখ-ভোগে বাধা পড়বে সেই আশংকায় নাকি তাঁরা সহজে 'মা' হতে চান না। কাজেই মাতৃত্বের আসন থেকে দিনে-দিনে নিজেদের অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যান তাঁরা—এটা তাঁদের জীবনের অন্যতম সাধনা। এতে তাঁদের যে কী সুখ—সেটা শুধু তাঁরাই জানেন। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে ঐ-রকম একান্তভাবে নিজের জন্য ব্যস্ততার সামান্যতম প্রকাশটাই যে একটা বড়রকমের কলংক, নির্লজ্জতার প্রতীক ; —এমনকি কোন-কোনক্ষেত্রে অশুভ-লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এঁরা যে-ভাবেই হোক এই শিক্ষাই পেয়ে থাকেন, যে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখবিলাস জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যদের সুখী করতেই হবে। সেটা হয়ত পরিমাণে কখনসখন কম হয় কিংবা বেশিও হয় — তবু গড়পড়তাভাবে বিভিন্ন আবেষ্টনের আওতায় তা তাঁরা সাধ্যমত করে নেন, —একাজে অননুরাগিনী মেলে খুব কম। আর সেজন্যেই এঁরা যখন 'মা' হোন, তখন স্বর্গের যাবতীয় সুষমা নিয়ে পরিপূর্ণরূপেতেই স্নেহময়ী হয়ে ওঠেন, —শ্রদ্ধেয়া ত অতি অবশ্যই।' অমিত এক নাগাড়ে এত কথা বলে যখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, শিবানী সেই মুহূর্তে তার স্বভাবসিদ্ধ তর্ক প্রবণতায় উদ্দীপিত হয়, এই বলে বোঝাতে চায়, অবশ্য একাধিক যুক্তিসহ, যে, অমিত যা বলছে এ-সব নাকি সেকেলে বস্তাপচা সাজানো নীতি কথা—একাল তার মূল্য দেয় না।

অমিত বিষণ্ণভাবে হাসল, বলল : 'দেখুন, মাথার মধ্যে বিদ্যার বোঝা ভারী হলে যে-কোন বিষয় নিয়েই দিনের পর দিন কোমর বেঁধে উল্টা-পাল্টা তর্ক করা যায়, আর শরীরে তেমন তাকৎ থাকলে ত কথাই নেই! কিন্তু এখানে প্লীজ তর্ক করবেন না শিবানীদি, কারণ এই মুহূর্তে যে আমার তাকতের অভাব প্রচুর সেটা ত টেরই পাচ্ছেন, জানেনও কাল রাত্তিরে ভাত পড়েনি উদরে।' শিবানী খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, তাতে অমিত তার কথার খেই হারায়নি বরং গম্ভীরভাবেই বলছিল : 'তবে আমার বর্তমান বক্তব্যসম্পর্কে আপনার অভিমতের জবাবে এইটুকু মাত্র বলতে পারি, বস্তাপচা নীতিকথারই সৌরভ আমাদের প্রত্যেকের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে জড়িয়ে আছে—একে কেন্দ্র করেই যে আমাদের ভিতরকার শোণিতধারা বহু বহু পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত—তা কি বাইরে থেকে কখনও ঘষে মুছে ফেলা যায়? অসম্ভব। এবং যায় না বলেই মানবতাবোধ-সম্পন্ন জগতে এসম্পদ আমাদের একান্ত আপনার।' বলার সঙ্গে সঙ্গে অমিত বিনম্রভাবে এক টাটকা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল শিবানীর সামনে : 'এই যে ঘণ্টা কয়েক আগে আমার জন্যে আপনি নিজের সুখসুবিধা বিসর্জন দিয়ে প্রায় সারাটা রাত জেগে বসে কাটালেন—এতে আপনার মনে যে তৃপ্তিবোধ, গৌরববোধ

—সেটা কি আপনার, সুপ্তঅন্তরের মাতৃত্বের প্রতিবিম্ব নয়—বলুন?'

শিবানী চুপ করে গিয়েছিল।…অমিত কিন্তু এর পরেও সানুনয়ে বলেছিল: 'মনে রাখবেন, আমি বারবার বলছি, পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে যে কী উচ্চ ও মহৎ আদর্শ আছে তা আমার ঠিক জানা নেই। কিন্তু তাই বলে আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যেও যে আছে সমাজ এবং দেশোপযোগী এক বিশেষ স্বকীয় আদর্শ—সেটা ভুলে যাওয়া কি খুবই দরকার?' এই প্রশ্ন দিয়ে শিবানীকে সে ভাবিয়ে তুলেছিল অনেকটা, সর্বশেষে সুন্দর ও মোলায়েম করে বলেছিল: 'আমরা যে সময়ে-অসময়ে স্বদেশে কি বিদেশে—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখের পুণ্যনাম উচ্চারণে বিশেষ সুখ ও গৌরব অনুভব করি,—তাঁদের মায়েরা আপন সন্তানদের বিদ্যাবুদ্ধি দেবার জন্য কে কবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এসেছিলেন—তা কি আমায় বলতে পারেন আপনি?'

শিবানী কিছুই পারেনি বলতে। তবে মিষ্টি হাসিতে মন্তব্য জানিয়েছিল, অমিত নাকি অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী… …

আজ শকুন্তলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শিবানীর এই মন্তব্যটাই মনে পড়ল অমিতের। হ্যাঁ শিবানী পুরনো পথ ছেড়ে নূতন পথ চেয়েছিল সেটাই ত পেয়েছে, তবে তাঁর আর ক্ষোভ কিসে?…এবার শকুন্তলাকেও তাই বলল অমিত: 'বিধাতার কাছে সজ্ঞানে হোক্ কিংবা অজ্ঞানে হোক্ যা চাইবে তা তুমি পাবেই পাবে—এইটুকুই তোমায় জানাতে চাইছিলাম শকুন্তলা, এখানে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই তাঁর। তবে কিনা ঐ বিধাতার কাজের বিচার করতে গিয়ে আমরাই হিসেবের বেলায় ভুল করে বসি, অর্থাৎ বিচারের আঁক-কষার কাজটা চালাকির দ্বারা সেরে নিতে চাই। কিন্তু ঐ কাজেরও ত যথোচিত ট্রেনিং-এর দরকার,—আর দেহ-মনে স্থৈর্য না এলে সেটাই বা আয়ত্তে আসে কি করে!' বিস্ময়াবহ মন নিয়ে অমিত থামল খানিকক্ষণ। তারপর কী ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিষণ্ণকণ্ঠে ফের বলে: 'এই সমস্ত ভাবতে গিয়েই কেন জানি শিবানীদির কথাটাই আমার ফিরে ফিরে মনে আসে। কতবার দেখেছি, যে-কোন কাজেতেই তাঁর পরিচালনাশক্তি কী ওয়াণ্ডারফুল্, আর নার্ভ কত স্ট্রং। তবু যে কোন্ সুখের প্রত্যাশায় তিনি ইদানীং অবাঞ্ছিত সংসর্গ বেছে নিয়েছিলেন, কিছুই বুঝতে পারিনে! তাঁর জন্যে তেমনি দুঃখও হয় বড়,—কেন বল দিকিন?'

শকুন্তলা তদ্‌গতভাবে শুনে যাচ্ছিল সব। কিন্তু এবার অমিতের চোখে নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে সে আশ্চর্য হয়, বলে মৃদুকণ্ঠে: 'এ প্রশ্নের জবাব চাইছেন

বুঝি আমার কাছে ? হায়রে ! শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদগীতা শোনাব আমি,'— অমিতকে প্রণাম করে মার্জনা চায় : 'এমন ধৃষ্টতা আমার নেই।'

এরপর কেটে গেছে মাসাধিক কাল।

অমিত তার মা বাবার সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় ফিরে এসে জিনিসপত্র গোছাবার কালে শকুন্তলাকে বলছিল : 'ভাবছিলাম, ইণ্ডিয়ার বাইরে যাবনা, যাচ্ছি শুধু, প্রেসিডেণ্ট গাঙ্গুলীর অনুরোধে। এ কাজে তাঁর উৎসাহ উদ্যোগ দেখে আমার এত ভাল লাগছে যে কী বলব ! অবশ্য এর যোগাড়যন্ত্রের পিছনে জাস্টিস্ সান্যালের ইনিশিয়্যাটিভ্‌টাও তোমার-আমার মনে রাখা দরকার।"

'বাস্তবিক'—শকুন্তলাও এই সূত্রে তাঁর মন্তব্য প্রকাশে উচ্ছ্বসিত হয়, বলে : 'এমনি ধরনের শিক্ষিত লোক যে কত আছেন আমাদের মধ্যে—ওঁরা নিজেদের চেনেন না, চিনবার বোঝবার কোন সুযোগই হয়ত পান না সারা জীবনে, মিথ্যা সব ভ্যানিটি নিয়ে থাকেন শুধু। অন্যরাও ওঁদের তাই ভুল বোঝে ! আরো ট্র্যাজেডি যে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও যখন শিক্ষাদাতাদের সঙ্গে মিশতে চান না ওঁরা। অথচ, একবারটি মিশে যেতে পারলে দেখুন দিকি, সকলেরই কী আনন্দ ! এতে দেশের দশেরও কত মঙ্গল।'

অমিত ভাবে, বহির্ভারতে গেলে তার এখানকার কাজ কি বন্ধ থাকবে !

'বাঃ কেন ? আপনার অসমাপ্ত কাজের ভার ত নিয়েছি আমি'—বলে শকুন্তলা : 'আমায় আপনি আশীর্বাদ করুন।'

··শকুন্তলার কথায় বিশ্বাস রাখতে অমিতের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। তাছাড়া অমিতের সান্নিধ্য পেয়ে এই সামান্য বছর কয়েকের ভিতর শকুন্তলারও কি আর অধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটেনি ?

···'শিল্পীরা গানেতে, ছবিতে, সাহিত্যে, নৃত্যে শিল্প রচনা করেন কেন ? আর একাজে তাঁদের সার্থকতাই বা কি ?' এমনতর প্রশ্নের জবাবে শকুন্তলা বলেছিল একদিন : 'এই পৃথিবীকে স্বর্গ তৈরি করার উদ্দেশেই শিল্পীর আবির্ভাব। কারণ পৃথিবীটা যে ভগবান সৃষ্টি করেছেন এটা বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যদিয়েই আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে চলেছি। কিন্তু স্বর্গ কোথায় ? এইজিজ্ঞাসা জাগছে একমাত্র মানুষের মনে এবং তখনই ভগবান তাঁর সুস্পষ্ট প্রসন্নইঙ্গিতে ঐ মানুষকেই বলেছেন : আর সব ত আমি একাই করে দিলুম, কিন্তু আমার স্বর্গ-সৃষ্টি কেবল তোমার জন্যই অসমাপ্ত থেকে গেল। কাজেই তুমি এসো,—শিল্পী হয়ে এসে গানেতে, ছবিতে, কবিতায়, সাহিত্যে যেভাবে পার আমার এই স্বর্গ রচনা সম্পূর্ণ কর।

তোমাতে আমাতে মিলেই ত স্বর্গ হবে—একা হবে না। যখন এই দুইয়ের মিলন ঘটবে তখনই শিল্পীর শিল্প রচনা সার্থক।'—এর পরেও যখন আবার অবিশ্বাস নিয়ে অনেকে সুধান: 'কিন্তু ভগবানই বা কোথায়?' এরও সুন্দর জবাব দেয় শকুন্তলা: 'ভগবানকে যে পাইনে, দেখিনে, বুঝিনে—সেটাও ঠিক নয়। আমরা সংসারে সমস্ত বিষয়-বাসনার মধ্যে দিনরাত তাঁকেই ত কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছি। যদি তিনি আমাদের পাবার, দেখার এবং বুঝবার বাইরে হতেন তাহলে ঐ খোঁজার ত কোন দরকারই পড়ত না; —আমরা শুধু কীভাবে খাবো, পরবো আর সঞ্চয় করব এই চিন্তায়ই বিভোর থাকতে পারতুম। কিন্তু সেটা কি পারি? পারিনে। ভগবানের অস্তিত্ব ক্ষণেক্ষণে কোন-না-কোন রকমে আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে যায় বলেই ত, তাঁর জন্যে আমাদের মধ্যে এমনতর অবোধ্য সীমাহীন ব্যাকুলতা!' …শকুন্তলার মুখে এ সব শুনে অনেকে মুগ্ধআনন্দিত হতেন, বলতেন, এ-যে অমিতের কথারই প্রতিধ্বনি। তাহলেও কথাগুলিকে ব্যবহার করত ত শকুন্তলাই।

'সম্পদ, যে অর্জন করে সঞ্চয় করে, শুধু ত একলা তার নয়—যে ভোগ করে তারও'—এই বলে শকুন্তলা প্রায়ই তর্ক তুলত তার মায়ের সঙ্গে, অবশ্যি কবি-গুরুর ভাষা ধার করে নিয়েই বলত: আমাদের 'দেশের মেয়েরা যতই কেন না গানবাজনা করুক, কবিতা লিখুক, নাচ শিখুক—বিয়ে হলেই তারা ঐসব ছেড়ে-ছুড়ে আত্মসমর্পন করে একমাত্র ঘরকন্নার কাছে।' —'তাহলে তুই?' হেসে জেরা করতেন চিত্রলেখা। শকুন্তলা জবাব দিত পিঠপিঠ: 'ঘরকে ত আমি কখনো অস্বীকার করিনে। তবে তুমি যে অমিতবাবুর হাতে আমায় দিয়েছ তিনি কিন্তু তা মানেন না। তিনি এদেশের উচ্চ সাধকসাধিকাদের নানা উক্তির নজির টেনে বোঝাতে চান: চৈতন্য আছে মেয়েদেরও। তারাও বুঝে, ঈশ্বরের কাছে ঋণী থাকতে নেই—সে ঋণ সুদেআসলে ফিরিয়ে দিয়ে, যদি জীবনে ঠিক ঠিক সঙ্গী পায় তাহলে সেই সঙ্গগুণে তারা মানুষ হয়ে উঠতে পারে,—শুধু মেয়ে নয়।' চিত্রলেখা তা' শুনে বিস্ফারিত নয়নে সাবধান করে দিতেন: 'এ-সব কথা নিয়ে কিন্তু সূক্ষ্ম সংবেদনশীল তর্কবিলাসীদের তর্ক করার অবকাশ আছে বেশ কিছু—তাও মনে রাখিস।' শকুন্তলাও মুখটিপে হাসত, বলত: 'বুঝতে পেরেছি। পুরুষদের মুখে স্তব শুনে-শুনে মেয়েরা এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে এর মধ্যে একটু ঘাটতি হলে তা তাঁদের কানে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। খাঁটি কথাটাকেই অনেকে আবার, অনেক সময় নিন্দাবাদ মনে করেন। কিন্তু আমাদের জীবনে মা, নিন্দারও প্রয়োজন আছে। নিন্দা গায়ে মাখতে জানলে সেই নিন্দাই সংসারে সারবান হয়ে ওঠে, যেমন গোবরের সঙ্গে মাটি মিশালে হয়। কারণ মাটিহীন

গোবর ত ঐ নিন্দারই মতো অসার, অকাম্য।' ···চিত্রলেখার সংশয় মাত্র ছিল না, মেয়ে তাঁর জন্মাবধিই সাধারণের ঊর্ধ্বে। তাকে আরো টেনে নিয়েছে এই অমিত লাহিড়ীর সঙ্গ। তিনি অমিতকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি অমিতও এর সমুচিত মূল্য দিয়েছিল তাঁর মেয়ে শকুন্তলাকে ভালবেসে। শকুন্তলার চিত্তভূমিতে দুরূহ তত্ত্বকথার বীজ ছড়িয়ে-ছড়িয়ে তাঁর জীবনটাকে স্বর্গীয়সুষমায় সাজিয়ে তোলার চেষ্টায় কখনও কোন ঔদাসীন্য দেখায়নি সে।

আজ শকুন্তলা তাকে বিদায় জানাতে এসে যখন বিনতির সঙ্গে বললে : 'আর পিছনে তাকাবেন না আপনি। এই সমস্ত জালজঞ্জালের মাঝখানে আপনাকে আমি দেব না জড়াতে—কিছুতেই দেব না, আপনি বললেও।' অমিত তখন সুখে বিস্ময়ে অভিভূত। শকুন্তলার শান্ত চোখদুটির ওপর চোখ পড়ে তার। সেখানে বুঝি বা কোন এক শুদ্ধজ্ঞানের শুদ্ধসিন্ধু লুকিয়ে আছে—অমিতের মনের সব শূন্যতা ভরে ওঠে তাই দেখে-দেখে। অমিত ভাবে, শিক্ষায় সাধনায় নারীর যৌনসংস্কারও তাহলে যেতে পারে বদলে!···আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়।···কত গৌরব তার, শকুন্তলার মনোজগৎ যে অনেকটা তারই হাতেগড়া!

অমিতের জীবনে এ-ও এক পরমসম্পদ—এক অভিনব আত্মপরিচয়।

॥ ১৫ ॥

শিবানীর ইতিহাসটা এখানে শেষ হলেই ভাল হত। কিন্তু তা হল না!

'যজ্ঞধামে' মহোৎসব সুরু হয়ে হঠাৎ থেমে গেল যেন। তার ছয়তলার··· বারান্দায় এ আবার কিসের ছায়ামূর্তি! সময়টা রাত্রির শেষ।

সব চলে যাবার পর কালরাত্রে নিরিবিলি শোবার ঘরে এসে চিঠিখানা নিয়ে বসেছিল শিবানী। মেয়ে অদিতির বিয়ে হবে, এই খবরটাই বিশেষ করে পেয়েছিল ওর মধ্যে, আর ঐ একই সঙ্গে আজ অনেকবৎসর পর মিহিরের ফোটোখানার দিকেও নজর পড়ল তার।···ডুবে গেল অতল সন্ধানে।

নববধূ শিবানী তার অসুস্থ মাতা বিন্দুবালাকে নিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিল। সেখানে ডাঃ সুরঞ্জন দাসগুপ্তের নিজস্ব স্যানিটেরিয়াম্। সুরঞ্জনই ত শিবানীকে বিয়ের সময় অর্গেন উপহার দিয়েছিল একটা। নিজে সে বিয়ে করেনি, করবেও না; একমাত্র শিবানীর জন্য। দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসত কিনা! কিন্তু বিন্দুবালা মাঝখানে চক্রান্ত খেলালেন। দিবাকরের কাছে একটা বড় রকমের নিরাপত্তার আভাস দেখিয়েমেয়েকে বিয়েদিলেন জমিদারমুখার্জিবাড়িতে। শিবানীর জ্ঞানবুদ্ধি সে সময় অপরিণত বৈকি! সে নিজে ভুল না করলেও তাকে ভুল

করালেন তার মা। আর এর মাশুল দিতে গিয়ে কিশোরী শিবানী নিজের উপরেই প্রতারণা সুরু করলে।···বিন্দুবালা স্যানিটেরিয়ামে ; নার্সদের অধীনে তাঁর সেবাযত্নের ক্রটি ছিল না একটুকুও। বাড়িতে কেবল সুরঞ্জন আর শিবানী। শিবানী আর সুরঞ্জন। আর নেই কেউ। কত সন্ধ্যা, কত মধুযামিনী যে কাটে ওদের মাঝে তার কোন হিসাব রাখে না ওরা।···যুগে যুগে প্রকৃতির কাছে পুরুষ ত হার মেনেছেই। অসহায় সুরঞ্জনের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

শিবানীর মনে পড়ে, এ যেন মাত্র সেদিনকার ঘটনা। এমনি করেই ত কাছে পাওয়া মুহূর্তগুলিকে ওদের দুজনের মধ্যে একেবারে বিলীন করে দিয়ে সে যে সত্য-সত্যই এক বিজয়িনী সেজে বসেছিল। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে কত ছলকৌশলেই না শ্বশুরবাড়ির সবাইকে ভুলিয়েছিল সে। কিন্তু, নিজেকে সেদিন যেমন পারেনি ভোলাতে,—আজও তেমনি পারল না। ফোটোর দিকে চেয়েই বুঝতে পারলে, মিহিরের বড় হবার সাথে সাথে তার অস্থিতে মজ্জাতে, অবয়বে আকৃতিতে সুরঞ্জনের অস্তিত্বের স্বাক্ষরই যে প্রকট হয়ে উঠছে দিন-কে-দিন।

সুরঞ্জন অবশ্যি মারা গেছেন অনেককাল, মিহির তখন খুব ছোট, একেবারে কোলের। আজ সেই মিহির বড় হয়েছে, আছে জার্মেনীতে। এই যে চিঠির সঙ্গে তার নূতন ফোটো। -ফিরে এসে কী দেখবে সে এবার।

মনটা দুমড়ে গেল শিবানীর। —কি করেছে সে এতদিন? ভুল সংশোধনের পথ ত খোলাই ছিল তার। মানুষ কি আর ভুল করে না? মহাবীর কর্ণ পাণ্ডব-বংশজ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর জননী কুন্তীদেবী ছিলেন পাণ্ডুপত্নী। ভুল করে ছিলেন তিনিও, তবু স্বামীর নামের মহিমায় সবকলুষ তাঁর ধৌত হয়েছিল আর সেই পরিচয়েই তিনি স্বীয় স্বামীর মর্যাদা গুণে চিরপুণ্যবতী, শ্রদ্ধেয়া, প্রাতঃস্মরণীয়া। —এই পৌরাণিক কাহিনীর উপমাটি শিবানীকে নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট করত এবং তার লেখাপড়া জানা উদ্ধত মনও এর মধ্যে একঅনাবিল সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল সেদিন। আর তাই না, সুন্দর হবে, সুষ্ঠু হয়ে উঠবে তার বৈধ পারিবারিক জীবন সেই ভরসা সেই তৃষ্ণা নিয়েই স্বামী দিবাকরের কাছে তখন-তখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সহজ করে দিয়েছিল সে।

আলিপুরে আসার বছর কয় বাদে জন্ম হল অদিতির। মিহির তখন হাঁটতে পারে। তারপর কোথা থেকে যেন কি ঘটে গেল শিবানী কিছু বুঝতে পারল না।

—একদিন দুপুরে দিবাকর একা বেরিয়েছিলেন। ট্রামে হঠাৎ দেখলেন আলিপুর গার্লস্ ওন্‌একাডেমির প্রাক্তনহেডমিস্ট্রেস্ সুনন্দা গুহকে। কথায় কথায় জানতে চাইলেন: 'আপনি আমাদের বাড়ি আসেন না কেন?' সুনন্দা

লজ্জিত হয়ে বলেন : 'কী হবে আর আজ সেই পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে ?' কিন্তু দিবাকর ছাড়লেন না, অসীম সাহিষ্ণুতার সঙ্গে শুনলেন সব।

…শিবানীকে ভালবেসে ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিলেন সুনন্দা। কিন্তু ঐ শিবানী যখন স্কুলের হিসাবপত্রে গোলমাল বাধিয়ে সব দোষ চাপিয়ে দিল সুনন্দার কাঁধে, তখন তাঁর খেয়াল হল, রঘুনাথবাবু প্রথমদিনেই অনুমতি দেবার কালে কেন তাঁকে বলেছিলেন : আই শূড্ রিকোয়েস্ট ইউ টু টেক্ শিবানী অ্যাট্ ইওর্ ওন্ রিস্ক। কাজেই এবার উপায়ান্তর না দেখে সুনন্দা ছুটলেন ডাঃ প্রিয়ব্রত ঘোষের বাড়ি। ডাঃ ঘোষের স্ত্রী সৌদামিনী বললেন : 'শিবানী আপনার স্কুলের টাকা মিস্অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ করেছে আপনি বলছেন। হ্যাঁ অনেক টাকাই ত করেছে দেখছি। কিন্তু আমাদের কোন হাত নেই ওর উপর। শুধু ভাবি, ডাঃ ঘোষ যদি এসব শুনেন, বড় দুঃখ পাবেন তিনি। সে দুঃখ আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। তাই জোড়হাতে বলছি, এসবের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমার গায়ের অলংকার আপনাকে আমি দিতে পারি, আপনি তাই নিয়ে যান।' সুনন্দা ত হতভম্ব। তাঁর ত্রুটি এখানে কোথায় ভেবে পাচ্ছিলেন না। বললেন : 'আমায় ভুল বুঝবেন না মিসেস্ ঘোষ। এভাবে কোন ক্ষতিপূরণ নিতে ত আমি আসিনি। শুধু জানাতে এসেছি, শিবানী স্কুলে কাজ নেবার সময় তার জেঠামশাই ডাঃ প্রিয়ব্রত ঘোষকেই গার্জিস্ মেনেছিল।'—সৌদামিনীকে সন্তুষ্ট করে সুনন্দা ফিরে এলেন। মনটা খারাপ, রঘুনাথবাবুও পরলোকে—কী করবেন, অগত্যা জরুরী চিঠি পাঠালেন দিবাকরের নামে—একটা পরামর্শের আবেদন জানিয়ে।

'কৈ!' দিবাকর এইমুহূর্তে অনেক বৎসর পর তা শুনে আহতকণ্ঠে বলে উঠলেন : 'সেই চিঠি ত পাইনি আমি!' সুনন্দা বলেন : 'বুঝেছি, তা নিশ্চয় আটকে রেখেছিল স্কুলের ঐ ভাড়াটে ক্লার্ক রমাকান্ত হাজরা।'

এক্ষণে অনুমান করলেন অনেক কিছু দিবাকর, থামতে দিলেন না সুনন্দাকে : 'তারপর কি হল বলুন ?' সুনন্দা গেলেন যজ্ঞেশ্বরের কাছে। …যজ্ঞেশ্বর সেদিনকার পূর্ণবয়স্কা সুবেশা তরুণী সুনন্দাকে নিভৃতে যে প্রস্তাব দিলেন সেটা কহতব্য নয়; রিভোল্ট্ করলেন সুনন্দা।—সুনন্দার শেষ ভরসা স্কুলের কেরাণী রমাকান্ত। 'হ্যাঁ বড়দিদি, আমি ত সবই জানি'—নিজের দুহাত কচ্লাতে-কচ্লাতে রমাকান্ত বললে : 'আপনাকে দিয়ে ফল্স্ কাগজে নাম সহি করিয়ে-করিয়েই ত মিসেস্ মুখার্জি এই বিপদে ফেলেছেন। তাঁকে বেশি বিশ্বাস করতেন কি না! যাকৃগে, আপনি কিছু ভাববেন না বড়দি, আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

পরদিন স্কুলে গিয়েই সুনন্দা গুহ একটা চিঠি পেলেন। তাঁর নামে চার্জ অব্

ইন্‌সাবর্ডিনেশন্‌ এনেছেন স্বয়ং স্কুলপ্রেসিডেণ্ট্‌ যজ্ঞেশ্বরপ্রামাণিক। 'এর পর আর কি করা যায়'—সুনন্দা বলতে থাকেন: 'এসব মিথ্যা নিন্দার প্রতিবাদ করা মানে, কোর্টে যাওয়া। অথচ, কোর্ট নাকি শুনেছি যজ্ঞেশ্বরবাবুর প্রতিদিনকার বিশ্রামনিকেতন! সুতরাং শেষপর্যন্ত সব অপবাদ নিজের মাথায় নিয়েই স্কুলটা ছেড়ে চলে এলুম। শিবানীর পৃষ্ঠপোষক যে যজ্ঞেশ্বরবাবু, তা ত আপনিও জানেন!'

··এবার লজ্জায় অপমানে দিবাকর নিরুত্তর।···আলিপুরে এসে একসঙ্গে দীর্ঘকাল কাটালেন, শিবানী এর মধ্যে এতবড় এক কেলেঙ্কারি করে বসল—তিনি স্বামী হয়ে এর কিছুই জানলেন না! অথচ যজ্ঞেশ্বরবাবুই বা কি রকমের লোক গোপনে শিবানীকে কেবল উস্‌কাচ্ছেনই! এতে দিবাকরের মন স্বভাবতই বিরূপ উত্তপ্ত হবার কথা। তিনি তাই সেদিন বাড়ী ফিরে এসে বিনা ভূমিকায় শিবানীকে বলেছিলেন: 'চল এক্ষুনি। আমি টাকা দেব—স্কুল তৈরি করবে আমাদের ও-পাড়ায়।' সুনন্দার মুখে যা শুনেছিলেন সে-কথা আর তুললেন না, কারণ নোংরা-ব্যাপার ঘাটিয়েই বা লাভ কি? শুধু বলেছিলেন: 'এই আলিপুরে থাকা আমার নিজের সম্ভব হবে না।' শিবানীও সাফ্‌ জবাব দিয়েছিল, সে এত বড় দায়িত্ব ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না, তার ত একটা মান ইজ্জতং আছে।···শিবানীর মানইজ্জং রক্ষার ক্ষেত্রে দিবাকর কোনদিনই বাধা দেন নি, এবারও দিলেন না। তবে কঠিন রুক্ষ হয়ে উঠেছিলেন খুব—সে অন্য ন্যায্য কারণে। শিবানী কিন্তু মেনে নিতে পারল না দিবাকরের সে বীর্য—সে পৌরুষ। ভিতরটাও তলিয়ে দেখল না, বরং একটা বিপরীত আবর্তনের মধ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় সদর্পে নিক্ষেপ করল সে। অর্থাৎ নিজেকে নিয়েই সরে পড়ল,—স্ত্রী হল! নিজের খেয়ালখুশি মত কখন যে কী করে কারুর কাছে সেজন্য কোন জবাবদিহি দিতে হয় না তাকে। মাথার উপরে তার কেউ নেই—ব্যস্‌!! এমনতর স্বাধীনতার আলেয়ায় সে বহুকাল আগে থেকেই আকৃষ্ট মুগ্ধ হয়েছে। কাজেই এখন আর কাকে দায়ী করবে শিবানী? তাছাড়া প্রত্যাবর্তনের পথও তার বর্তমান পরিস্থিতিতে মোটেই সুগম নয়—ভাবতেই হতাশের মত ছোট্ট এক নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে গুটিয়ে নিল একপাশে।·· চিঠির ভাঁজখানা ধীরে ধীরে আবার খুলল শিবানী।

···শ্যামাপদ, বিষ্ণুপদ, কৃষ্ণপদ এই ছোটভাই তিন জনকে রেখে এটর্নি কালিপদ মারা গেছেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী চন্দ্রাবলী আর ছোট ভাই-ভাজরা ছাড়া ত কেউই ছিল না ওঁর পাশে। বড় দুঃখ পেয়ে গেছেন।—ঐ ত একমাত্র কন্যা সুললিতা! সেও কিছুদিন আগে কোথায় যে কী-ভাবে অদৃশ্য হল তাঁর নূতন গাড়িখানা নিয়ে তা কেউ পারল না বলতে। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনটারও

কোন পাত্তা নেই। বুড়ো হলেও কাজকর্মে সমর্থ ছিলেন বটব্যাল, কিন্তু এবার ভেঙ্গে পড়লেন। লজ্জায় মাথাটা হেঁট হয়ে গিয়েছিল ওঁর। বৃন্দাবনের সঙ্গে যাবার রুচি হল কী করে সুললিতার—এই চিন্তাটাই অনুক্ষণ পীড়িত করত তাঁকে। সব সইবারও ত একটা লিমিট্ আছে দেহযন্ত্রের মন-যন্ত্রের। আর পারলেন না। শেষের দিকে অচলভাবে শয্যাশায়ী ছিলেন কিছুকাল। ঐ সংকটজনক অবস্থায় কেন জানি একবার শিবানীকে দেখতে চেয়েছিলেন। —শিবানী তখন কাশ্মীর, যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে বেড়াচ্ছে।

শেষকালে—

'তোর সাথে দাদা দেখা করতে চান শরীরের অবস্থা খুব সীরিয়াস্ এক্ষুণি চলে আয়।' টেলিফোনে খবর দিয়ে দিবাকরকে ডেকে আনলেন কৃষ্ণপদ।

'এখানে এসে বসো'—বলে নিজের শয্যাপার্শ্বে-ই এটর্নী কালিপদ ইশারায় টেনে নেন দিবাকরকে। ঘরে তখন আর কেউ নেই।

'যজ্ঞেশ্বরবাবুকে ত তুমি চেন।' বলতে থাকেন কালিপদ: 'আমার মক্কেল, বড়দরের মক্কেল তিনি। অঢেল টাকা, খরচ করতে কার্পণ্য দেখাননি কোনদিন। ক্ষমতা প্রতিপত্তিরও ত অভাব ছিল না। কিন্তু কী হল? ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন কোথায়? ঐ তো শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুপস্থিতিতেই মামলা উঠল আদালতে। শুনানি হয়ে গেল এক তরফা।'—পাশেই ক্যাল্‌কাটা উয়ীক্‌লি ল রিপোর্ট্‌স্-এর পৃষ্ঠাখানা খোলা ছিল, দেখালেন দিবাকরকে: শুধু ব্যাঙ্ক প্রতারণার দায়ে নয়, আরো অসংখ্য জাল-জালিয়াতি বে-আইনী জিনিষপত্র রাখার অপরাধে উঁচুদরের অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন যজ্ঞেশ্বর। তারপর শুধু আপনমনেই বিড়বিড় করেন: 'কেন হবেন না? কত বলেছি, এ-পথ ছাড়ুন। কা কস্য পরিবেদনা! এবার হল ত, অপমানের চূড়ান্ত। অ্যারেস্ট্ হয়েছেন, জামিনে পর্যন্ত মুক্তি নেই ওঁর—বেশ হয়েছে। এরপরে আপীলেও যে কোন কাজ হবে সে ভরসা দেখিনে—বাঘের উপরে টাগ পড়েছে কিনা! তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে ঐ রাধাবল্লভ। ঐ আরেক স্কাউণ্ড্রেল!' কালিপদ যেন চেঁচিয়ে ওঠেন।

দিবাকর নির্বাক নিস্পন্দ। ঠিক বুঝতে পারছেন না, তাইজন্য আরো ঘন হয়ে বসলেন। উদ্দেশ্য, ইতিবৃত্তটা বৃদ্ধের মুখ থেকে ভালকরে শুনে রাখা—এ ত স্বাভাবিক কৌতূহল।

—কালিপদর বয়স ত্রিশ; সেকালের অবিবাহিত যুবক। হাইকোর্টে নূতন প্র্যাক্টিস্ করছেন। তাঁর চেম্বারে একটা মামলা নিয়ে এসেছিলেন ওমপ্রকাশ জোয়ার্দার। নিজেকে তিনি বাঙালী বলেন, তাঁর মা খাঁটি

পেশোয়ারী। জন্মকর্ম বাংলার বাইরে। কালিপদের সমবয়সী হলেও গড়নে অনেক বাড়ন্ত। চমৎকার দীপ্তিউজ্জ্বল চেহারা, আর দেহ যেন ইস্পাতে গড়া, বুদ্ধি অ-সাধারণ। তাঁকে জিতিয়ে দিলেন কালিপদ। ঐ তো প্রথম আলাপ। তা থেকেই ক্রমশঃ হৃদ্যতা জমল উভয়ের মধ্যে। লাহোরে বিজনেস্ আছে জোয়ার্দারের—বাড়িও। এমন বন্ধুকে পেয়ে কালিপদ বর্তেগিয়েছিলেন। চৌরঙ্গীর বড-বড় সাহেবদের হোটেলে জোর খানাপিনা চলল কিছুদিন। তখন ভারতবর্ষে সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজত্ব চলছে। ওম্‌প্রকাশ অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মালিক; নিজে এন্‌জিনীয়ার, কন্‌ট্র্যাক্‌টরীও করেন। কেবল ভারতবর্ষে নয়—মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মা ,আবার এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায়—সর্বত্রই তাঁর বিজনেস্।

এরই বছর কয়েক পর। —তখন যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক ব্রাইট্‌স্টার ব্যাঙ্কের এজেন্ট, সিঙ্গাপুরে। একেবারে ছেলেমানুষ বৈকি—বাইশ বছরের ছোকরা।

ওমপ্রকাশ জোয়ার্দারই সিঙ্গাপুরে ঘুরতে ঘুরতে আবিষ্কার করলেন যজ্ঞেশ্বরকে। পরামর্শ দিলেন, লালবাতি জ্বালিয়ে দেশে ফিরেযাও। যজ্ঞেশ্বরও এক মাসের মধ্যেই জাহাজ ধরলেন। কলকাতায় ব্রাইট্‌স্টারব্যাঙ্কের বড়সাহেব নবকুমার বসু সরলমনে বিশ্বাস করলেন সব, কোন খোঁজখবর এরনিলেন না আর। যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক অতঃপর ব্যক্তিগত ওজুহাত দেখিয়ে নবকুমারের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে কেটে পড়লেন একদিন। জোয়ার্দার তাঁরগুরু, গুরুর অনুগ্রহে ক্রমশ ফেঁপে উঠলেন তিনি। আলিপুরে যখন বাড়ি করলেন নূতন ধরনের তখন ঐ জোয়ার্দারই করে দিয়েছেন ওঁর সব। যজ্ঞেশ্বর দাঁড়ালেন,বড হলেন,—ধন মান কী না হল তাঁর। এই সমস্ত কিছুর মূলেই যে ওম্‌প্রকাশ জোয়ার্দার তা কিন্তু কারোকে তিনি জানতে দিলেন না। সর্বশেষ, খিদিরপুর 'যজ্ঞধাম' তৈরি হল, কলকাতা নগরীর এক অপূর্ব বিস্ময়—তাও ওম্‌প্রকাশের পরিকল্পনায়। কিন্তু এর চাবিকাঠি জোয়ার্দারের ছেলে রাধাবল্লব লুকিয়ে রাখল নিজের হাতে।

এই রাধাবল্লভের কথাই বলছিলেন বটব্যাল।

বাস্তবিক ছেলেটা বড্ড ঘুঘু, কী কৌশলে জানি শিবানীকে হাত করে শাগরেদ সাজিয়েছে তার। এতে যজ্ঞেশ্বরের উপর প্রভুত্বও তার কায়েমী বৈকি। যজ্ঞেশ্বরবাবু টাকার জোরে ভেসে থাকতে পারতেন হয়ত আরো অনেকটা দিন। কিন্তু শিবানীকে জড়িয়েই পাঁকে আটকালেন তিনি। —পালিয়ে যাচ্ছিলেন ছদ্মবেশে। —কাশ্মীর ছেড়ে পশ্চিমসীমান্ত পেরিয়ে যাবার পথেই পুলিশের হাতে বাধা পেলেন, সঙ্গে শিবানী।—চারদিকে পুলিশের লোক ছেয়ে গেছে। শিবানী দেখল, হোমরা চোমরা সবাই আর তার মাঝখানে রাধাবল্লভ

জোয়ার্দার, সনাক্তকারক। বিস্মিত হল না একটুও, বরং চকিতে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হল, ওর সঙ্গে শিবানীর।

শিবানী ডিফেন্স্ নিতে গিয়ে জবানবন্দীতে কলকল করে বলে গেল, যজ্ঞেশ্বরবাবু নাকি শিবানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফুশলিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিলেন ওকে। ঐ সঙ্গে আরো অনেককিছু বলল বানিয়ে বানিয়ে। অবিশ্বাস করবে কে ?

গ্রেপ্তার হলেন যজ্ঞেশ্বর।

নূতন আরেকটা চার্জ এল তাঁর অ্যাগেনস্টে—ইলোপ্‌মেণ্ট্।

শিবানী কাঠগড়া থেকে নেমে সড়সড় করে বেরিয়ে গেল, বাইরে গিয়ে নির্দ্বিধায় উঠল রাধাবল্লভের গাড়িতে। দূর থেকে ফ্যালফ্যাল করে যজ্ঞেশ্বর শুধু চেয়ে রইলেন—সম্পূর্ণ নিরুপায়। সব চেয়ে বড় অবলম্বনই যে তাঁর, হারিয়ে গেল অসীমপাথারে।—যজ্ঞেশ্বর কিছুই দেখতে পেলেন না আর।

শিবানীকে নিয়ে রাধাবল্লভের গাড়ি ছুটল এবার কলকাতার পথে।

'সব টের পেয়ে গেছে শিবানী, বুদ্ধি আছে ওর!' বিকেলবেলা চা খেতে বসে মাধবী বলছিল তাঁর স্বামীকে: 'রেজিগ্‌নেশন্ লেটার খানা আগেভাগেই পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার নামে,—কেমন দেখ দিকিন!'

'তাই ত দেখছি, আমাদের ইস্কুলে আর কাজ করবেন না উনি।'

'এখন এ-সব কাজে মনই বা বসবে কেন ওঁর?' মিঃ গাঙ্গুলীর কাছে মাধবী রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে থাকে: 'টাকা পয়সা কি আর কম কামিয়েছে এদ্দিন! আশেপাশে স্তাবক মোসাহেবের দল যথেষ্ট, তার উপর অন্যায় কাজে সঙ্গতিপন্ন সমর্থকদেরও কোনকালে অভাব নেই তার। এখন দেখে নিও, রাজনীতিতে এসে যদি যোগ দেয়-শিবানীর মন্ত্রীত্বগিরি আর আটকায় কে! কিন্তু আশ্চর্য! মেয়েটা এমন সুন্দর জটিল ইন্‌টিলেক্‌চিউয়্যাল্ ব্রেন্ই বা ইন্‌হেরিট্ করল কোত্থেকে! তার বাবা পুণ্যব্রতবাবু ত শুনেছিলাম বেজায় সাহসী আর সৎলোকছিলেন, ঠিক তাঁর দাদার মতনই নাকি কোনরকমের ঘোরপ্যাচ ছিল না ওঁর ভিতর।'

'তা হলই বা!' মিঃ গাঙ্গুলী বলেন: তোমার এই থিয়োরি কিন্তু বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা মানতে চান না, জান ত?'

'আরে ফেলে রাখ বিজ্ঞানের কথা'—মাধবীলতা মুখ বাঁকালো: 'ভিতরে কোথাও না কোথাও যদি বীজ লুকিয়ে না-থাকে—সেখানে ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে কার বাবার সাধ্যি? আর মনে রেখো, বীজের স্বধর্মকে ফাঁকি দিয়ে কোন দেশে কোনকালে ফুল ফুটে না, ফলও ধরে না। যেমন বীজ—তার ফলও তেমন।'

'তাহলে ত শুধু পিতৃকুল নয়, ওঁর মাতৃকুলেরও যে সন্ধান নিতে হয়।' বলতে গিয়ে মিঃ গাঙ্গুলী একটু ভাবেন: 'কিন্তু আমি ত হদিশই পেলাম না, কী করে যে শিবানী মুখার্জি ফস্‌কে গেলেন! অথচ তাঁরই যোগসাজশে যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক মশায়ের এত সব কীর্তি—দে বৌথ্‌ ওয়্যার্‌ ঈকোয়্যালি কাল্‌প্রিট্‌!'

'প্রমাণ?' একগাল হেসে ফেলল মাধবী: 'আইনের চোখে শিবানী যে একটা ভদ্রঘরের স্ত্রী সেটা ভুলে গেছ নাকি?' তারপর গম্ভীর মুখে বলে: 'সৃষ্টির আদি থেকেই ত নারীর হাতে পুরুষ খেলার পুতুল হয়ে আছে। যে ওস্তাদ খেলোয়াড়নী সে শুধু জীবনভোর খেলতেই চায় এদের নিয়ে; অন্যদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, নীড় বাঁধায়ও তার আগ্রহ কম। কারণ, স্বাস্থ্যকর শান্তিময় নীড় বাঁধতে গেলেই যে আবার খেলার কাজে মন্দা পড়ার সম্ভাবনা—ঐ জ্ঞানটিও তার জন্মলব্ধ, তথা ধর্মের অঙ্গবিশেষ। এমনতর খেলোয়াড়ণীকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে আনতে পারে পৃথিবীতে তেমন নির্লোভ তেজস্বী পুরুষই বা আছেন কয়জন? সর্বোপরি, সুন্দর মুখের জয় কোথায় বা নেই—শুনি? তুমিও কি তাতে ভুলোনি একদিন? আরোও হয়ত কত ভুলবে! দিন ত পড়ে রয়েছে সামনে!'

'না, তা হয় না সব সময়।' ব্যারিস্টার চুপ করলেন।

'শিবানী যা ভেবেছে তা হয় না, হয় না'—অন্যপ্রান্তে মৃত্যুপথযাত্রী কালিপদও বলে উঠলেন: 'যজ্ঞধাম ত আর যজ্ঞেশ্বরবাবুর সম্পত্তি নয়, তাঁর সব কিছুই যে গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেছে অনেক আগে। তাহলে, কোন আইনে শিবানীকে তিনি এর ওয়ারিস্‌ সাজান? শুনেছি, দলিলপত্রও নাকি করিয়েছেন, কিন্তু ও-সব ত স্রেফ জাল! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, শিবানী ঘোর বিপদে পড়বে। উঃ, সে আমার কথা শুনল না,—কী করি! তবু এবার'—দিবাকরের হাত ধরে অনুনয় করেন: 'তুমি ওঁকে না বাঁচালে আর যে রক্ষা নেই শিবানীর কিছুতেই।' বড় বেশি বিক্ষোভ আর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন কালিপদ। ডান হাতখানা কাঁপছে তাঁর, চোখের কোণ বেয়ে নামছে অবাধ্য জলস্রোত।

সম্প্রতি শিবানীর সঙ্গে দিবাকরের কোন বনিবনাই ছিল না। আইনতঃ ওঁদের মধ্যে দাম্পত্যবিচ্ছেদ স্পষ্টাস্পষ্টি না ঘটলেও দিবাকর যে বেশ কোয়ায়েট্‌লি শিবানীর সকল সংশ্রব ছেড়েছিলেন এসংবাদ অনেকদিন আগেই এটর্নী কালিপদকে জানাতে স্পষ্টবক্তা কৃষ্ণপদ ভোলেন নি। কাজেই এখন সসংকোচে শুধু অস্ফুটকণ্ঠে বিড়বিড় করছিলেন কালিপদ: তোমাকেই বা বলি কি করে!

শিবানী বয়ে যাক্—দিবাকরের তাতে কোন আফ্‌সোস্ নেই আজ। কিন্তু বৃদ্ধ কালিপদর মনের মধ্যেই বা এত দুঃখ এত আক্ষেপে, এত চাঞ্চল্য কিসের? তা দেখে এক মহা বিহ্বলতার মাঝখানে দিবাকর সহানুভূতিতে জিজ্ঞেস করলেন: 'আর কি কিছু বলবেন আপনি?'

...গরীব বামুনের যুবতী মেয়ে—যেন রূপের বন্যা।

ভালবাসতেন ওকে কালিপদ বটব্যাল। তাঁর প্রথম যৌবনের রোমান্স্ ঘনীভূত হয়েছিল বিংশশতাব্দীর প্রথম দশকে। শুধু বিয়ের কথা নয়, আনুষঙ্গিক আরো অনেক কিছু এগিয়ে সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে ওঁদের মধ্যে। জানতেন সবাই, দেখতেনও, ঐ যুবতীমেয়েটি কালিপদর গাড়িকে উজ্জ্বল করে তাঁর সাথে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ! কিন্তু সে যে হঠাৎ এক রাত্রে নিখোঁজ। ঐ ওম্‌প্রকাশ জোয়ার্দারের সঙ্গেই বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রমত্ত যৌবন তখন জোয়ার্দারের, চেহারা -ছবিও জাঁকালো—ধনদৌলতের ত কথাই নেই। তাঁকে ভেবেছিল রূপ দিয়ে ভোলাবে। ভুলিয়েও ছিল হয়ত। কিন্তু অচিরেই তার অঙ্গে ভাবী মাতৃত্বের লক্ষণ ধরে ফেলেছিলেন জোয়ার্দার। আর যায় কোথায়—বেঁকে দাঁড়ালেন রীতিমত। নগ্নকর্কশ কণ্ঠে বললেন: হুম্ এতেন ওম্‌প্রকাশকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে! কিন্তু জেনে রেখো, তোমার মত মেয়ের জায়গা নেই আমার কাছে। তারপর যে কী অট্টহাসি! গম্ভীর হয়ে ঘৃণিতস্বরে বলেছিলেন আবার: তোমায় আমি স্পর্শও করব না।

এখন উপায়? চোখের জল ত আর মেয়েটির বাঁধ মানে না। দয়া হল জোয়ার্দারের, প্রচুর টাকাপয়সা দিয়ে কালিপদর কাছে ফেরৎ পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু পাঠানো সম্ভব হল না তৎক্ষণাৎ। এই অবস্থায় মাস সাত আট কেটে গেলে পর— যথা সময়ে লাহোরেই এক কন্যাসন্তান জন্মাল ওঁর। —ওম্‌প্রকাশ ঘটনাটির বিশদ বিবরণ জানিয়ে কালিপদকে লিখেছিলেন: কলকাতা বেলেঘাটায় এক হোম্-এ থাকার ব্যবস্থা করে পাঠাচ্ছি। খরচপত্র আমি দেব, তুমি প্লীজ একটু দেখাশুনা করবে। —খবর পেয়ে কালিপদ গিয়েছিলেন দেখা করতে।' —সদ্যজাত মেয়ের রূপটি যে তার মা'কেও ছাপিয়ে উঠেছে! সামনে নিষ্কলুষ ম্যাডনার উজ্জ্বল আলেখ্য দেখতে পেলেন কালিপদ— প্রকৃতির এই মহান্ গরিমময় দৃশ্য তাঁকে মুগ্ধবিচলিত করল। কিন্তু হায়, তিনি যে তখন নিরুপায়,— এর মধ্যে তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে যোগমায়ার সঙ্গে।

—আজ মুমূর্ষু শয্যায় এ সমস্তই তন্নতন্ন করে দিবাকরের কাছে বলতে গিয়ে কালিপদ স্বীকার করলেন, ওম্‌প্রকাশ কারো সঙ্গে প্রতারণা করেননি। মেয়েটিই

ভুলেছিল তাঁকে দেখে। তবে ওম্‌প্রকাশের ছেলেটা হাড়েহাড়ে শয়তান, বহুবধি দুষ্প্রবৃত্তি খেলে তার মাথায়। সে হারেম তৈরী করেছে শহরে শহরে, সেখানে নানা দেশের নানা জাতের সব সুন্দরী নারীদের ভিড়;—এটা রাধাবল্লভের এক অদ্ভুত মনোবিলাস! কালিপদ নিজে জ'নেন, দেখেছেন এসব। কাজেই শিবানী যে কেমনতর একটা লোকের খপ্‌পরে পড়েছে সে ত জানে না কিছু, এই দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি। ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বললেন: 'সারাটা জীবন ভুল বুঝে এসেছে শিবানী, এই আমার দুঃখ। কিছুতেই চিনল না সে আমাকে, আমিও দেখতে পেলাম না ওকে।'

বৃদ্ধের সম্পূর্ণ বক্তব্যই সুস্থির মনে দিবাকর শুনেছিলেন এবং শেষকালে অনেকগুলো কাগজপত্র বগলদাবা করে বাড়ি ফিরেছিলেন সেদিন। ফিরবার পথে বারবার মনে পড়ছিল তাঁর, এটর্নী বটব্যালের শেষ কথা কয়টি: 'আমার পরম বন্ধু ছিল পুণ্যব্রত। তাঁকে আমি 'নীলকণ্ঠ' বলতাম, সে নিজের মান বিসর্জন দিয়ে আমার মান বাঁচিয়ে অনেক অনেক উপকার করেছে। কত বড় অন্তঃকরণ তাঁর! একথাটা যেন শিবানী জানতে পারে। —আর সব কিছু আছে এই কাগজপত্রের মধ্যেই, দেখেনিয়ো তুমি। বন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা যথাযথ রাখতে পারলুম কিনা জানি না! যশ ঐশ্বর্য ত পেয়েছিলুম কতই, সঙ্গে সঙ্গে অশান্তিও জোর পাল্লা দিত তেমনি! কিন্তু আজ তোমার হাতে সব সমঝে দিয়ে শান্তি পেলুম, নিশ্চিন্ত হলুম আমি।'

এরই দিন কয়েক পরে কালিপদ মারা যান।

--পশু রাত্রে শিবানী ফিরে এসেছে কলকাতায়। যজ্ঞধাম তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, জনগণের সমাগমে। কিন্তু এরই ভিতরে উপরোক্ত সংবাদ নিয়ে দিবাকরের চিঠিসহ একটি পার্শেল যখন এসে পৌঁছাল তখনই বোধ করি একটু নিরানন্দের মাঝখানে বিদেয় নিয়েছিলেন সবাই। শিবানীও এরপর একান্তে এ সমস্ত নিয়ে গিয়ে বসেছিল তার শোবার ঘরে।

কালিপদর মুখে শোনা বিবৃতির কোন কিছু দিবাকর চিঠিতে বাদ দেননি।

চিঠিখানা পড়ার পর উৎকণ্ঠিত ভাবে শিবানী এবার সঙ্গীয় পার্শেলটাও খুলল। —ভিতরে অনেক পুরনো নথি সব ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বহুযত্নে রক্ষিত একখানা পুরুকাগজের এন্‌ভেলোপ্‌ ঠেকল তার চোখে। তার মধ্যে মস্ত লম্বা এক চিঠি— এটর্নী কালিপদ বটব্যালকে লিখছেন পুণ্যব্রত ঘোষ:

—সেদিন তোমার সঙ্গে বেলেঘাটা-হোমে গিয়ে সদ্যজাত শিশুটিকে ত দেখলাম, তার মায়ের সাথেও পরিচয় হল। তুমি বলছ, মন তোমার দোটানায়

পড়েছে। এদের কিছুতেই কাছে নিতে পারছ না, পারবেও না। অথচ এরা নির্দোষ—দূরেই বা এঁদের ফেলে রাখবে কি করে—এই ত? কিন্তু তোমার বিবেক কি বলে বন্ধু? বিবেকই হল একমাত্র সত্যসাক্ষী—তার সঙ্গে নিষ্পত্তিতেই চরমশান্তি; তা নইলে জগতে সব বিস্বাদ, সবই মিথ্যা। এটাও যদি মনকে না বোঝাতে পার তাহলে শোন, চুপিচুপি বলছি: মানুষ জন্মসূত্রে একা। এই হক্ কথাটা ভুলে যায় বলেই দলবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ, সমাজবদ্ধ হতে গিয়ে সে বারবার তারই দল, তারই গোষ্ঠী, তারই সমাজকে ভাঙ্গে,—আবার গড়ে। এমনতর ভাঙ্গাগড়ার কাজকে ভালবেসে মানুষ এরই মধ্যে সুখ ভোগ করার পথ খুঁজে বেড়ায়। পথেরও কি আর অন্ত আছে? কাজেই এই সুখ ভোগের ভালবাসায় যখন ক্লান্তি আসে তখনই সে মরে। তাহলে বল দেখি, এই অদ্ভুত মনোবিলাস নিয়েই কি মানুষ যুগে যুগে নিজেকে ঠকিয়ে আসছে না? আমি কিন্তু ভাই, বেঁচে থেকে ঐ রকম সুখ ভোগের প্রয়াসী হতে চাইনে—অর্থাৎ, কোন দল গোষ্ঠী বা সমাজের যে আমি নই, তা ত তুমি জানো। —এবার আমার আসল বক্তব্যটা বলব? তোমার চিন্তার ভাগী হয়ে প্রকাশ্যেই বলি তাহলে, সেদিন যে ছোট্ট শিশুটিকে দেখে এলাম তাকে তুমি কোন আশ্রমে না দিয়ে পাঠিয়ে দাও না কেন আমার কাছে। তোমার দেওয়া পঙ্কজা নামটা ভাল না, শিবানী বলেই ওকে ডাকবে সবাই। আর, আমিই না হয় বিন্দুবালাকে বিয়ে করব,—কেমন নিশ্চিন্ত ত?

শিবানী আর দেখতে পাচ্ছে না, ঝিম্‌ঝিম্ করছে তার মাথাটা! তাহলে কি বিন্দুবালার কথায় নিজেকে, পুণ্যব্রত ঘোষের মেয়ে আর ডাক্তার প্রিয়ব্রত ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রী বলে, সে চিরটা কাল ঐ মিথ্যা পরিচয়ই দিয়ে এসেছে শুধু? বিশৃঙ্খল এলোমেলো হয়ে ওঠে তার সমস্ত চিন্তাশক্তি। অনেক কষ্ট করে পড়ল চিঠির শেষ কয়টা লাইন:

—একটা কথা বন্ধু, মেয়ে বড় হলে তার পরিচয় কিন্তু তোমাকেই একদিন দিতে হবে। ভুল করেছিলে, তাই বলে আত্মজাকে বঞ্চনা কর না যেন,—অভিশপ্তা কর না তাকে।

উঃ! পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা কি হঠাৎ সরে গেল নাকি! সব কিছু যেন চারদিকে ঘুরছে শিবানীর। ইচ্ছে হচ্ছিল এক্ষুনিই সে ছুটে যায় কালিপদর কাছে, তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুধোয়, কেন কেন তিনি এসব কিছু আগে বলেন নি তাকে? শিবানীর নিজের কী বা অপরাধ ছিল এতে? তাকে প্রাইভেট

টিউটরেস্ রেখেছিলেন বিউটির জন্যে, আর সেই ছুঁতোয় অযাচিতভাবে সারাক্ষণ শুধু টাকাই দিয়ে গেছেন, অবশ্যি আগলেও রাখতেন তাকে চোখে-চোখে আর কত স্নেহে যত্নেই না। সেই যত্নের, সেই স্নেহের মর্যাদা শিবানী কোনদিনই পারেনি উপলব্ধি করতে, বরং ভুল বোঝে তাঁকে আপমান করতে গিয়েছে যতবার, ততবারই তিনি উল্টে ক্ষমা করেছেন শিবানীকে প্রশান্তচিত্তে দু-হাত বাড়িয়ো···এক এক করে এখন ঐসব মনে পড়ছিল শিবানীর আর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন তার থেমেআসছিল দুর্বিষহ বেদনায়। কাঁদতে চাইছিল সে গলা ছেড়ে—পারছিল না তা মোটেই।

কিন্তু হায়রে কোথায় বা আজ কালিপদ? তাকে ত সে কিছুতেই খুঁজে পাবে না এই সংসারে আর। বিন্দুবালাও যে অনেককাল আগেই ফাঁকি দিয়েছেন ওকে।

রক্তস্রোতের গতি তাহলে ধারাবাহিক!—সে নিজেকেই কি আর সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন, অপ্রকাশ রাখেনি আজো? মিহিরের কাছে বলেছে কিছু? না পারবে বলতে কোনোদিন? —সেও ত ঐ একই জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়াবে শিবানীর সামনে।—তবে আর, শিবানী আছে কোথায়?—এতদিন মাতৃত্বকে অবহেলা করে শুধুই কি চোরাবালির ওপর ইমারত গড়ে নি সে? নাঃ, আর পারছে না। অদিতিও আসবে। আর, না এলেও মায়ের আশীর্বাদটুকু ত বিয়ের দিনে প্রত্যাশা করবে মনেমনে,—তখন? মুহূর্তের মধ্যে শিবানীর চৈতন্য হল: সে যে সন্তানের জননী – এমন সুন্দর শাশ্বতসঙ্গীতের অসীম করুণমূর্চ্ছনা ক্রমশ তাকে আহত করে তুললে।—সব যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল শিবানীর চোখের সামনে। আলো নেই, বোধহয় নেই অন্ধকারও। মাথা উঁচু করার পথ আর খুঁজে পাচ্ছিল না কোনদিকে।

হ্যাঁ, কতকটা রক্তের দোষ বৈকি!

হলই বা ব্রাহ্মণ-তনয়া, বটব্যাল-দুহিতা সে—তবু, তবু কি আর নির্জলা ব্যভিচার ছিলনা সেখানে? নয়ত, তার মধ্যেই বা এত অনাচার ব্যভিচারের সমাবেশ কেন?—ভাবতে ভাবতে বড় বেশি বিমনা হয়ে পড়েছিল শিবানী। অসহ্য শূন্যতার মাঝে হাতড়াতে-হাতড়াতে কীভাবে যে কখন নেশাগ্রস্থের মত বিছানাটা ছেড়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে দক্ষিণের খোলা আকাশের তলায় বেলকনিতে দাঁড়িয়েছিল, সে-সব কিছুই জানে না। সমস্ত অনুভূতি তার আসাড় নিস্পন্দ! যেন পাথরের মতই ঠাণ্ডা জমাট বেঁধে গিয়েছে সে। —সবশেষে দিবাকর আবার লিখেছিলেন: অদিতির বিয়েতে তোমার আসা

উচিত কি অনুচিত—সেটা তুমি নিজেই ভেবে দেখ এবার।

—মাথার উপরে নির্মুক্ত আকাশখানা প্রতিদিনকার মতনই নূতন হাসিতে ফর্সা হয়ে উঠেছে—কোন অনিয়ম নেই সেখানে। এই ত যজ্ঞধামের সর্বোচ্চ শিখরে প্রথম আলোর গোপন অভিসার। অন্ধকারের ছায়াটুকু মুছে যেতে স্পষ্ট দেখা গেল, পলিতকেশ ওমপ্রকাশ জোয়ার্দারই পায়চারি করছিলেন এতক্ষণ। বটব্যালের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এসেছিলেন কলকাতায়, ভেবেছিলেন, তিনিই শিবানীকে বলবেন সব।—বারান্দায় অপেক্ষা করে-করে ভিতরে ঢুকলেন, তারপর সহসা ভূত দেখার মত যেন চমকে উঠলেন তিনি।

শিবানী নেই।

তার বিছানারউপর সদ্যলেখা খোলা চিঠিখানা হাওয়ায় উড়ছে শুধু। দিবাকরকে জানিয়ে গেছে শিবানী: তুমিই অদিতিকে মানুষ করেছ। তবু, আমি তার গর্ভধারিনী—তার মা। তার বিয়ের দিনে আমার আশীর্বাদ রইল, সে যেন কখনও ভুলে না যায়, যে, সে নারী,—অগ্নিসিদ্ধা সর্বংসহা সে,—ধরিত্রীর অন্তহীন দায়িত্বভার তার স্কন্ধে। পুরুষদের সঙ্গে মিথ্যা প্রতিযোগিতায় নিজের ধর্মকে যেন খর্ব না করে কোনোদিন।